জ্যোতির্ময় শ্রীচৈতন্য

কালকূট

রীডার্স কর্নার
৫ শঙ্কর ঘোষ লেন। কলিকাতা ৬

প্রথম প্রকাশ—রাসপূর্ণিমা, ১৩৬৬

প্রচ্ছদ

শ্রীসমর দে

প্রকাশক ও মুদ্রক শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ মিত্র, এম-এ

বোধি প্রেস । ৫ শঙ্কর ঘোষ লেন । কলিকাতা ৬

উৎসর্গ

স্বর্গতঃ মাতৃদেবীর স্মৃতির উদ্দেশে

কালকূটের অন্যান্য বই

অমৃত কুম্ভের সন্ধানে
শাম্ব
পৃথা
চলো মন রূপনগরে
মুক্তবেণীর উজানে
মন-ভাসির টানে
হারায়ে সেই মানুষে
মিটে নাই তৃষ্ণা
নির্জন সৈকতে
আরব সাগরের জল লোনা
কোথায় পাব তারে
বাণীধ্বনি বেণুবনে
স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে
মন চল বনে
বনের সঙ্গে খেলা
প্রেম নামে বন
অমৃত-বিষের পাত্রে
অমাবস্যায় চাঁদের উদয়
তুষার-সিংহের পদতলে
বাঁশীর তিন সুরে
কোথায় সে-জন আছে

প্রেম-নিত্য



জ্যোতির্ময় শ্রীচৈতন্য—১

এক



মা-কে সম্বোধন করে কে বলেছিলেন, 'সংসার অনিত্য মা—।'
এইটুকু বললেই হয়তো সকলের স্মৃতিকে আমি সহজে জাগিয়ে
তুলতে পারবো না। তাই আর একটু বিস্তারিত করে বলি :
মা-কে সম্বোধন করে, তিনি বলেছিলেন,

'ভবিতব্য যা আছে তা খণ্ডিবে কেমনে
এই মত কাল গতি কেহ কার নহে,
অতএব সংসার অনিত্য বেদে কহে।'...

মনে করতে পারছেন কি? এবার আমার যাত্রা খুব বেশি দূরে না। ইতিহাসের কাল গণনায়, পাঁচশো বছর এমন কিছু নয়। তবু, পাঁচশো বছরের ইতিহাসের পথের ধূলিকণা থেকে আমাকে উপস্থিত হতে হবে সত্যের স্বরূপ সন্ধানে।

এই সত্যের স্বরূপ সন্ধানে যাত্রা নিয়েও, নানা মুনির নানা মত। মহাভারতকে আমরা কাব্য বলেছি বটে, কিন্তু ভারত-কাহিনী যে ভারতেরই প্রাচীন ইতিহাস, পুরাণ রহস্য ও তিমিরভেদী পণ্ডিতগণ তা প্রমাণ করেছেন। কেবল বিতর্ক থেকে গিয়েছে ঐতিহাসিক কাল নিয়ে।

রামায়ণকে আমরা ইতিহাসের থেকে, কাব্যমূল্যই বেশি দিয়ে থাকি। কিন্তু সেই কাব্যের কালাকাল নিয়ে, এই তো সেদিনও পণ্ডিতমহলে কতো তর্কবিতর্ক হয়ে গেল। প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক মহাপণ্ডিত, জাতির পরম শ্রদ্ধেয় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বাঙালীর পরম গৌরব মান্যবর ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গে কী বিষম তর্ক-বিতর্ক হয়ে গেল। বিতর্কিত বিষয়টি রামায়ণ কাব্যের সৃষ্টিকাল নিয়েই। তর্ক করা যাঁদের সাজে, তাঁরাই তর্ক করেছেন। এক্ষেত্রে আমার কোনো ভূমিকা নেই।

রামায়ণের পথে বা মহাভারতের পথে এবার আমার যাত্রা না। আমার যাত্রা 'গৌড়ে'র বাদশাহী আমলের, পাঁচশো বছরের পথে। যাঁর সন্ধানে, আমার যাত্রা, ইতিহাসের নির্দিষ্ট সময়ে ও দূরত্বে তাঁর দেখা পাওয়ার জন্যই আমার এই ব্যাকুল বেগ গতি।

আজ যাঁর দর্শনে আমার যাত্রা, শুরুতেই তাঁর মা-কে সম্বোধন করে কথিত কথা দিয়ে শুরু করেছি। তাঁর সেই কথার মধ্য দিয়েই তিনি প্রকাশমান। তাঁর

সব কথাগুলো আমি তুলে ধরছি না। ভবিতব্যের কথা বলেও তিনি, মাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, 'মা গো, পদ্মপাতায় জল যেমন স্থির থাকে না, তেমনি চঞ্চল জীবও একত্রে থাকে না'…এই, একত্র না থাকার অর্থ হচ্ছে বিয়োগ। ছেড়ে যাওয়া। মায়ার বাঁধন ত্যাগ করা। মায়াতে ভুলে থাকলেই, শোক দুঃখ বেদনা। মা, তুমি সেই শোক ত্যাগ কর।

এই কথা বলতে গিয়ে তিনি মায়ের কাছে একটি উপমাও দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'মা, লক্ষ্মী ইন্দ্রের অপ্সরা ছিল। নাচের তালে ভুল হওয়াতে, অভিশপ্ত হয়ে পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছিল। কাল পূর্ণ হয়েছে, তাই সে আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। তুমি শোক করো না মা।' তারপরে তিনি মাকে সম্বোধন করে নিয়তির কথাও বলেছিলেন :

'নির্বন্ধ না ঘুচে যেই লেখেন বিধাতা
এ বোল বলিয়া বিশ্বম্ভর পাইলা চিন্তা
আত্মসঙ্গোপন ক'রে কহে নানা কথা।' ‥

আমি ইতিহাসের সেই ক্ষণে ও স্থানে পৌঁছুবার আগেই, দূরাগত ধ্বনির মতো যেন শুনতে পাচ্ছি, বিশ্বম্ভর মাকে বিধাতার নির্বন্ধের কথা বলে, মনে মনে নানা কথা বলতে লাগলেন। আত্মসঙ্গোপনে, মানে একান্ত আপন মনে, যা আর কেউ জানতে পারে না, গভীর গোপন। কারণ মা যখন চোখের জলে ভাসছেন, তিনি মাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন। তাঁর নিজের চোখে জল ছিল না। কেবল, অতি দারুণ সংবাদটি যখন মায়ের মুখ থেকে শুনেছিলেন, তখন তাঁর যে বুক ফেটে যাচ্ছিল, তা তিনি প্রকাশ করেননি। কেবল মাথা হেঁট করে ক্ষণিক ভেবেছিলেন, তারপরেই সেই কথা, 'সংসার অনিত্য মা ·।' সেই যে 'আত্মসঙ্গোপন ক'রে ক'রে কহে নানা কথা' সেই মনে মনে গভীর গোপন কথাই, এক মানুষের মধ্যে আর এক মানুষের ঐতিহাসিক জন্ম হয়েছিল।

'বিশ্বম্ভর' এই নামটি যেন আমাকে এই নতুন পথের সন্ধান দিচ্ছে। আমাকে হিসাব কষতে হচ্ছে, খৃষ্টাব্দের হিসাবে, কোন সময়ে "সংসার অনিত্য মা!"… এই কথাটি তিনি আপন বুকের ব্যথা চেপে মাকে বলেছিলেন। আমি যাত্রাপথেই, আমার স্মৃতির পরীক্ষা নিতে শুরু করেছি। যেখানে আমার যাত্রা, বোধ হয় সেখানকার স্থান-মাহাত্ম্যের হাওয়া আমার গায়ে লেগে গেছে। স্থানটির পাণ্ডিত্যে মাহাত্ম্যের তো তুলনা নেই। বোধ হয় আমার স্কন্ধেই এখন স্মার্ত স্মৃতিরত্নাকর স্মৃতিধর পণ্ডিতেরা ভর করতে আরম্ভ করেছেন। আমি কারোর পরীক্ষা নিতে বসিনি। ইতিহাসের সেই অমোঘ, এক অভাবনীয় ভবিষ্যতের স্রষ্টা সালটি

আমাকে রোমাঞ্চিত করছে। অথচ, যথাস্থানে যথাসময়ে উপস্থিত হয়ে হয়তো দেখবো, অনেক ঐতিহাসিকের কাছেই, বিশেষ করে সেই সালটি তেমন অর্থবহ মনে হয়নি। কিন্তু আমি দেখছি, তিনি যে সালে সেই কথাটি উচ্চারণ করেছিলেন, 'সংসার অনিত্য মা' সেই সালটিতেই, সেই একটি কথার মধ্য দিয়েই, ঐতিহাসিক চরিত্রের প্রথম বিকাশ ঘটল।

তিনি সেই কথাটি প্রথম বলেছিলেন ১৫০৩ খৃষ্টাব্দে। বর্তমান খৃষ্টাব্দের হিসাবে, এই উনিশ শো ছিয়াশি থেকে চারশো তিরাশি বছর আগের কথা। পাতাটার ধূলি ঝেড়ে একবার খুলে দেখে নিই। দিল্লীর সঙ্গে বাংলাদেশের তখন কোন সম্পর্ক ছিল না। বঙ্গ-গৌড়ে তখন স্বাধীন সুলতানদের আমল চলছে। দিল্লির বাদশাকে কোনো তোয়াক্কা নেই। দিল্লি তখন গৌড়-বঙ্গের রাজধানী ছিল না। রাজধানী ছিল গৌড়। পনেরোশো তিন খৃষ্টাব্দে, কে গৌড়ের সুলতান ছিলেন? এর জন্য নিশ্চয়ই খুব মাথা ঘামাবার দরকার নেই! আলাউদ্দীন হোসেন শাহ তখন গৌড়ের সিংহাসনে। চোদ্দশো নিরানব্বুই খৃষ্টাব্দ থেকে, ছাব্বিশ বছর তিনি রাজত্ব করেছিলেন। এতদিন গৌড়ের মসনদে রাজত্ব করা খুব সহজ কথা নয়।

হোসেন শাহর আগে আলাউদ্দীন নামটি বিশেষ উচ্চারিত হত না, সে তো আমি হোসেন শার রাজত্বকালে নানান কাব্য পুঁথিতেই পেয়েছি। আর এ সুযোগে একটু আত্মসমালোচনা যেন অনিবার্য হয়ে উঠলো। তাতে লজ্জার কিছু দেখি না। ইতিহাসবোধ তো আমাদের কল্পনায় গড়ে উঠতে পারে না। যে কথাটা আজও সত্য, অতীতেও সেই কথাটি সত্য ছিল। বাঙালীরা বরাবরই একটু ভাবপ্রবণ জাতি। সেই হোসেন শা'কে নিয়ে, তাঁর আমলে এবং পরেও অনেক হিন্দু কবি, বহু প্রশস্তি গেয়ে গেছেন। অথচ, তার কি সত্যকারের কোন বাস্তব ভিত্তি ছিল?

অস্বীকার করি না, তিনি ছিলেন খুবই বিচক্ষণ, দূরদর্শী সুলতান। তাঁর জীবনের ইতিহাসে আপাততঃ আমার যাবার দরকার নেই। যাঁরা দু'বাহু তুলে কাব্য করেছিলেন তিনি হিন্দুদের প্রতি অত্যন্ত প্রীত ছিলেন, বাস্তবে খোঁজ করলে তার কোন নজীর মিলবে না বলেই আমার বিশ্বাস। তবে হ্যাঁ, অনেক অতিমাত্রায় সাম্প্রদায়িক সুলতানদের মতো তাঁর মাথা মোটা ছিল না। তিনি নিজে ছিলেন বাঙালী। যদিও সে-বিষয়েও অনেকে অনেক রকম প্রশ্ন তুলতে পারেন। কিন্তু ইতিহাসের সঠিক পথ ধরে গেলেই, সৈয়দ বংশজাত এক অতি সাধারণ বাঙালী মুসলমান ঘরের সন্তান হিসাবে তাঁর পরিচয় বেরিয়ে পড়বে।

তাঁর বিচক্ষণতা আর দূরদৃষ্টি সেখানেই, তিনি শিক্ষিত বুদ্ধিমান বিশ্বস্ত হিন্দু বাঙালী ব্রাহ্মণ-কায়স্থ আর বৈদ্যদের বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে বসিয়েছিলেন। ওটা তাঁর রাজনৈতিক বিচক্ষণতা।

স্থলতান হোসেন শাহর আমলে হিন্দু বাঙালীদের প্রতি কী রকম আচরণ করা হত সে-সব ঘটনা আমাকে নিজের চোখেই প্রত্যক্ষ করতে হবে। আমাকে নিজেকে কিছু বানিয়ে বলতে হবে না। কারণ এখন আমি গৌড়-বঙ্গের সেই স্বাধীন স্থলতানদের আমলেই চলেছি। আমি কালকূট। আমার পক্ষে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক নিয়ে সাম্প্রদায়িকতা করার কোন দরকার নেই। কারণ কালকূটের কোনো জাত নেই। সম্প্রদায় নেই। যে-পথেই তার যাত্রা হোক, পাদভৌম ধূলা পথে, অথবা ইতিহাসের পাতায়, বুকের জ্বালা নিবারণের জন্য, সে তার হলাহলকে অমৃতে পরিণত করতে চায়। এখনও আমি অমৃতেরই পথের সন্ধানে চলেছি।

দুই



খৃষ্টাব্দের হিসাবে ধরা যাক, এখন চৌদ্দশো নব্বইয়ের কাছা-কাছি। ইলিয়াস শাহী বংশের জালালুদ্দিন ফতে শা'র আমল শেষ। প্রারম্ভকালেই আমি দেখতে পাচ্ছি, তাঁকে তাঁর এক 'বান্দা' নায়েক নিজের হাতে খুন করে, নিজেই বাদশা সেজে বসেছিল। হাবশী যোদ্ধা সেনাপতি আর প্রধানরা তখন খুবই বেড়ে উঠেছিল। তাদেরই প্ররোচনায়, সেই নায়েক, যার উপরে স্থলতানের প্রাসাদ পাহারা দেবার দায়িত্ব ছিল, আর প্রাসাদের সমস্ত চাবি থাকত তার কাছে, বোকার মতো ফতে শা'কে হারেমে ঘুমন্ত অবস্থায় খুন করেছিল। অবশ্য সেও বেশিদিন রাজত্ব করতে পারেনি। দুই থেকে তিন মাসের মধ্যেই, হাবশী সেনাপতি আন্দিল ওকে হত্যা করে নিজে স্থলতান হয়েছিল। আন্দিল ছিল হাবশী। আর সেই 'বান্দা' নায়েক ছিল একজন খোজা বাঙালী। তাকে সবাই বঙ্গালী বুদ্বক বলত। স্থলতান হয়ে সে নাম নিয়েছিল স্থলতান শাহজাদা। আসলে বেচারী হাবশী ষড়যন্ত্রকারীদের হাতের পুতুল হিসাবে কাজ করেছিল। মাথা মোটা, মাতাল, রাজ্যের যত উঞ্ছ চরিত্র-হীন লোকের সঙ্গে ছিল তার মেলামেশা।

·এসব কথা ফেঁদে বসলে, আমার যাত্রাপথ অকারণ দীর্ঘ হবে। ধান ভানতে

বসে শিবের গীত গাইবার কারণও নেই। ইতিহাসের পথ ধরে অমৃত পুরুষ দর্শনে আমার যাত্রা। সেই দর্শনেই আমার অমৃতেরও সন্ধান। তবু হোসেন শাহর জীবন নিয়ে কিছু বলব না ভেবেও, তাঁর সম্পর্কে একটা ঐতিহাসিক ছোট কাহিনী না বলে পারছি না। কারণ, হিন্দুদের প্রতি তাঁর আচরণের কথাটা যখন উঠলই, আর বিশেষ করে বৈষ্ণব কবিদের প্রশস্তি, তার পাশাপাশি এই ছোট কাহিনীটি বললে আপনাদের সামনে হোসেন শাহর প্রকৃত চরিত্রটি ফুটে উঠতে পারে।

কাহিনীটির ঘটনাকাল ফতে শাহর আমলেও ঘটতে পারে। অথবা হাবশী রাজত্বের সময়ও ঘটতে পারে। তবে আমার ধারণা, ঘটনাটা ঘটেছিল ফতে শাহর আমলে। তাহলে আমাকে আরও পাঁচ সাত বছর পেছোতে হবে। ধরা যাক চৌদ্দশো আশি দশকের কোন একটা সময়। সেই সময়ে সুবুদ্ধি রায় নামে একজন বাঙালী ব্রাহ্মণ ছিলেন গৌড়ের শাসনকর্তা, সুলতানী পদাধিকার বলে যাঁকে বলা হত অধিকারী। হোসেন শাহ তখন চাকরি করতেন এই সুবুদ্ধি রায়ের অধীনে। 'গৌড় অধিকারী' সুবুদ্ধি রায়ের আসল পদটা অনেকটা বর্তমানের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের মতো। সুবুদ্ধি রায় হোসেন শাহকে (যাঁর পূর্ব নাম ছিল হুসন খাঁ সৈয়দ) একটি দীঘি কাটাবার দায়িত্ব দেন। সেই কাজে কী একটা ত্রুটি হয়ে গেছল, ইতিহাসে তার কোন বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে না। জানিনে, এমন কি ত্রুটি ঘটে গেল, যার জন্য সুবুদ্ধি রায় হোসেন শাহকে খালি গা করে প্রচণ্ড চাবুক মারলেন।

ইতিহাস কি ভ্রূকুটি চোখে তাকিয়ে এ ঘটনাটি দেখেছিল ? সুবুদ্ধি রায় কি সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন ? নাকি হোসেনের উপরে তাঁর বিশেষ কোন কারণে রাগ ছিল ? ইতিহাস এ ব্যাপারে নীরব। তবে একটা বিষয় লক্ষ্য করে দেখছি, ব্যুরোক্রাটদের চরিত্র প্রায় পাঁচশো বছর আগেও যা ছিল এখনও তাই আছে। আজকাল অবশ্য চাবুক মারার চলন উঠে গেছে। জাতে মারাও চলে না, পাতে মারা চলে। আর অপমান তো কথায় কথায়।

আমি ভাবছি, অনিত্য এই সংসারে সকলই মায়া। সুবুদ্ধি রায় কি তখন জানতেন চাঁদপুর বা রংপুরের সামান্য এক চাষার ঘরের ছেলে সামান্য চাকরি থেকে, একদা হাবশী সুলতানকে হত্যা করে নিজেই সুলতান হয়ে বসবেন ? ইতিহাসের মুচকি হাসিই বলি, বা ভ্রূকুটি, আর অনিত্য মায়ার রহস্যের হাসিই বলি, সেই সময়ে সুবুদ্ধি রায় বা হোসেন খাঁ সৈয়দ কেউ ভবিষ্যৎ দেখতে পাননি। হয়তো স্বয়ং হোসেন শাহও সুলতান হয়ে ঘটনাটা নিয়ে মাথা ঘামাতেন না।

কারণ তাঁর লক্ষ্য ছিল, হাবশীরা যে ক্ষতি করে গেছে, সেই ক্ষতি সামলে উঠে আগে নিজের রাজত্বকে ঠিকমতো প্রতিষ্ঠা করা। করছিলেনও তাই।

সমাজ ও জীবনের একটা অনিবার্য গতি হল, দান থাকলে তার প্রতিদান আছে। শোধ নিলে প্রতিশোধ আছে। হোসেন শাহর বিবি তখন আর সামান্য গৃহস্থ রমণী নন। সুলতানের বেগম। তিনি হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলেন, তাঁর স্বামীর কৃষ্ণকালো পিঠে লম্বা লম্বা দাগড়া দাগড়া গভীর দাগ। হোসেন শাহ ছিলেন একেবারে কুচকুচে কালো বাঙালী পুরুষ। অবশ্য একটু অবাক লাগে, অনেক বছর আগে চাবুক খাওয়ার দাগ কি হোসেন শাহর বিবির চোখে আগে পড়েনি? তিনি সুলতান হবার পরই চোখে পড়ল! পড়তেই বেগমসাহেবার ভুরু কুঁচকে উঠল। তিনি স্বামীকে পিঠের দাগের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। সুলতান সবই বললেন।

বেগমসাহেবা শুনে অবাক! তাঁর চোখ জ্বলে উঠল, চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল, বললেন, 'কাফেরটাকে এখনই খুন কর।'

হোসেন শাহ আপত্তি করে বললেন, 'লোকটা একেবারে নিগু'ণ নয়, আমি তাকে খুন করতে চাই না।'

বেগমসাহেবা বললেন, 'বেশ, প্রাণে যদি না মারো তো, ওর জাতিনাশ তোমাকে করতেই হবে। প্রতিশোধ চাই-ই চাই।'

হোসেন শাহ তাতেও আপত্তি করে বললেন, 'সুবুদ্ধি রায় কাজে গাফিলতি করে না। বেগমসাহেবা, ছেড়েই দাও।'

বেগমসাহেবা ছেড়ে দেবার পাত্রী নন। যে লোক একজনের সামান্য অবস্থার সুযোগ নিয়ে এ রকম চাবুক মারতে পারে, তাকে কিছুতেই ক্ষমা করা চলে না। তিনি স্বামীকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করলেন, লেগে রইলেন ব্যাপারটার পিছনে। রমণীর বুকের জ্বালা, বড় জ্বালা। তাও আবার তিনি এখন যে সে রমণী নন। চৌদ্দশো তিরানব্বই খ্রীষ্টাব্দ পেরিয়ে গেছে। স্বামী তাঁর সুলতান। আর যে লোকের চাবুকের দাগ তাঁর স্বামীর পিঠে চিরদিনের জন্য অক্ষয় হয়ে আছে, তাঁকে বিনা শাস্তিতে রেহাই? অসম্ভব!

অসম্ভব তো অসম্ভবই। হোসেন শাহ সুবুদ্ধি রায়কে ডেকে, তাঁর সেই চাবুক মারার কথা স্মরণ করালেন। তারপরে নিজের করোয়ারের অর্থাৎ বদনার জল সুবুদ্ধি রায়ের গায়ে মুখে দেওয়ালেন। হয়ে গেল সুবুদ্ধি রায়ের জাতিনাশ! বিংশ শতাব্দীর এই শেষ পাদে এত সহজে হয়তো জাতি যেত না। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীতে বদনার জলই হিন্দুর জাতিনাশের পক্ষে যথেষ্ট। সুবুদ্ধি

রায় তরে গেছলেন চৈতন্য-মহিমায়। শেষ জীবনটা তিনি বৃন্দাবনে কাটিয়েছিলেন।

হোসেন শাহ্ এমন একটি কাজ কি কেবল গিন্নিকে খুশি করার জন্যই করে-ছিলেন ? পরবর্তী আরও কিছু কিছু ঘটনায় তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাবে। তবে সুবুদ্ধি রায়ের ঘটনায়, কে কী বলবেন জানি নে। আমি তো সৈয়দ ব্যক্তিটিকে যথেষ্ট উদারই বলব। তিনি সুবুদ্ধি রায়ের প্রাণ নিতে চাননি, জাতিনাশ করতেও আপত্তি করেছিলেন। কারণ যাঁর অধীনে অনেক কাল চাকরি করেছেন, হয়তো চাবুক খাওয়া ছাড়াও, অন্য ভাবে উপকৃতও হয়ে-ছিলেন। আরও একটা কথা ভাববার আছে। মুসলমান সুলতানের একজন উচ্চপদস্থ হিন্দু কর্মচারী, একজন মুসলমানকে চাবুক মেরেছিলেন, তার জন্য কিন্তু মুসলমান সুলতান মোটেই হিন্দু কর্মচারীর উপর কোন রকম বিরূপ হননি। অথচ ফতে শার আমলেই যদি ঘটনাটা ঘটে থাকে, তবে আরও আশ্চর্য। কারণ তাঁর হিন্দু-বিদ্বেষ নেশা প্রকট ছিল।

হোসেন শাহর জীবনে যাব না বলেও, সেই একটা পাক দিয়ে আসতেই হল। আসলে আমি, বিশেষ করে কবিকুলের, তাঁকে মাথায় নিয়ে নাচানাচি করাটা একটু বেশী মাত্রায় ভাবপ্রবণতার কথাই বলতে চেয়েছিলাম। রূপ সনাতনের মতো ব্যক্তিরা তাঁর দরবারে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ছিলেন আরও অনেক হিন্দুই। যেমন মুকুন্দ ছিলেন তাঁর নিজস্ব চিকিৎসক। কিন্তু তা থেকেই প্রমাণ হয় না, তিনি ছিলেন হিন্দুপ্রেমী। তিনি একদিকে ছিলেন ধর্মপ্রাণ মুসলমান, অন্যদিকে দূরদর্শী বিচক্ষণ সুলতান। জানতেন, বিদ্বান বুদ্ধিমান হিন্দুদের সহযোগিতায় তাঁর রাজকার্যের উপকার আর উন্নতি হবে।

কিন্তু আমার যাত্রার পথে, হোসেন শাসকে নিয়ে এখনই এত প্রাক কথনের প্রয়োজন দেখি না। যথাসময়েই তাঁর আবির্ভাব ঘটবে। গৌড়ের রাজধানীও আমার গন্তব্য নয়। সময়টাকে চিনে নেবার জন্যই তাঁর কথা বলতে হল। পনেরো শো তিন খ্রীষ্টাব্দ, হোসেন শাহ তখন গৌড়-বঙ্গের সুলতান। সেই সময়ে বিশ্বম্ভর মাকে সম্বোধন করে, কান্না চেপে, অন্তর্দাহকে গ্রাস করে উচ্চারণ করে-ছিলেন, 'সংসার অনিত্য মা…।' এ কথা উচ্চারিত হয়েছিল বিশ্বম্ভরের মুখ দিয়ে।

পরবর্তী কালে বিশ্বম্ভর নামটা এতই কম উচ্চারিত হয়েছে, সহজে কারুরই মনে পড়ে না। আসলে এই বিশ্বম্ভরই নবদ্বীপের শচী-গর্ভজাত 'নিমাই' ! ভক্ত-বৃন্দ হয়তো শোনা মাত্রই বাহু তুলে নাম গান শুরু করে দেবেন। তবুও ইতি-হাসের পথ ধরেই প্রকৃত বিষয়টি জানতে হবে। এ ইতিহাস অতি প্রাচীন না

হলেও, অপ্রাচীনতার মধ্যেও ভেজাল মেশাবার একটা প্রবণতা অন্ধ ধর্মবিশ্বাসে ও অশিক্ষায় থেকে যায়। শচীদেবী ইতিপূর্বে পর পর আটটি সন্তান হারিয়েছেন। বিশ্বম্ভরের জন্মের সময় তাঁর দাদা বিশ্বরূপের বয়স দশ। বিশ্বম্ভরের জন্মের সময় বিশ্বরূপ জীবিত। তখনই জগন্নাথ মিশ্রের প্রতিবেশীদের মুখে শুনছি, ইতিপূর্বেই শচী আটটি সন্তান হারিয়েছেন। বিশ্বরূপকে নবম ধরলে, বিশ্বম্ভর কি শচীদেবীর দশম গর্ভজাত ? সম্ভবত।

এই দশম সন্তানটির জন্ম মাত্রই দেখছি, তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনীকার কবিরা লিখেছেন, এ শিশুর জন্মমাত্রই দেশের দুর্ভিক্ষ ঘুচল, কৃষক পেল বৃষ্টি, জগৎ যেন সুস্থ হল, স্বস্তি পেল, অতএব এঁর নাম রাখা হোক শ্রীবিশ্বম্ভর। অবশ্য এটা ঠিক কথাই, শচীর এই সন্তানটির জন্মের আগের বছর দেশে অনাবৃষ্টি আর দুর্ভিক্ষ হয়েছিল।

কিন্তু মন গুণে ধন। ঐ বিশ্বম্ভর নামে যেন আমার অন্তর তৃপ্তি পাচ্ছে না। নিমাই বা গোরাচাঁদ বা শ্রীগৌরাঙ্গ শুনলে যেমন একটি বিশেষ মূর্তি চোখের সামনে ভেসে উঠে, মনকে এক অপূর্ব রসে প্লাবিত করে। নামের একটা মহিমা আছে। নামের অভিনবত্ব নিয়ে আমাদের বিস্তর বাড়াবাড়ি আছে। যা অর্থহীন, হাস্যকর। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বিদ্বান বিজ্ঞরা শচীনন্দনকে যে-নামই দিন, বহু সন্তানহারা মায়ের প্রতিবেশিনীরা বললেন, 'শোন ঠাকরুণ, মহাশয় ব্যক্তিরা তোমার ছেলের যে নামই রাখুন, তুমি নাম রাখ নিমাই। সেটাই হবে উপযুক্ত নাম।'

ইতিহাসে কি নিমাই নাম ইতিপূর্বে আর কখনও শোনা গেছে ? বোধ হয় না। তবে ইতিহাসে না শুনলেন, বাঙালীদের মধ্যে যে নামটা প্রচলিত ছিল, তা শচীদেবীর সখীদের কথাতেই জানা যাচ্ছে। নামটা অর্থহীনও নয়। এক্ষেত্রেও মানুষ নিজের মনের মতো গল্প তৈরি করে নিয়েছে। নিম গাছতলায় জন্ম বলেই নিমাই নামের উৎপত্তি। ইতিহাসকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে। গল্প তৈরি করতে পারলে কেউ ছাড়েন না।

প্রকৃতপক্ষে বিশ্বম্ভর জন্মেছিলেন আঁতুড় ঘরেই। ইতিহাস কোথাও বলে না, সেই ঘরের আশেপাশে কোথাও নিমগাছ ছিল। অর্থ এর একটাই। নিম হল তিক্ত। উপকার অপকার যা-ই হোক, এক্ষেত্রে তিক্ত হিসাবেই ব্যবহৃত হয়েছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আই। নিম+আই=নিমাই। আই শব্দের অর্থ মা। এই হল বাঙালীদের সর্বকালের একটা প্রচলিত ব্যাপার। যেমন ছেলের নাম রাখা হয় 'মরণচাঁদ'। যে মায়ের ছেলে জন্মে, কিন্তু বাঁচে না, তার নামই 'মরণ'

রাখা হয়। অর্থটা সব সময়ে বিপরীত। 'মরণ' নামের মধ্যেই বেঁচে থাকার আকুল প্রত্যাশা। শচীদেবী এখন নিজেকে সেই রূপকেই ভাবছেন, আমি তিক্ত মা, আমার সন্তান কেন বাঁচবে? তিক্ত মাকে সন্তানরা ছেড়েই যেতে চায়। এই দশম সন্তানটিও যাবে, এই বিপরীত প্রত্যাশায়, প্রতিবেশিনীদের পরামর্শ, 'এই ছেলের নাম রাখ নিমাই।'

আমি যাত্রাপথের দূর থেকেই শুনতে পাচ্ছি, শচীদেবী কোন দিন বিশ্বম্ভর বা বিশু বলে ডাকেননি. তিনি চিরদিন নিমাই বলেই ডেকে এসেছেন। আর গৌর গোরা গৌরাঙ্গ? সে তো ছেলেটির রূপের জন্য। সে রূপ তো যথাস্থানে পৌঁছে প্রাণ ভরে দেখবো। তবে ছেলেটি টুকটুকে ফর্সা দেখতে বলেই, সকলের মুখে মুখে সে গৌর, গোরা। কিন্তু শচীদেবী যে প্রতিবেশিনীদের পরামর্শে নিমাই নাম রাখলেন, তার কি ভবিষ্যৎ? নিমাইয়ের কথাতেই সেই জবাব 'সংসার অনিত্য মা····· চঞ্চল জীব একত্রে থাকে না। পদ্মপত্রে কি জল স্থির থাকে?'

কী মর্মন্তুদ! সেই নিমাইও মা জীবিত থাকতেই দেহ রেখেছিলেন। এখন আমারই বলতে ইচ্ছে করছে, 'মা, তুই সত্যি নিমাই। প্রপঞ্চক মায়াময় সংসারের এই বিচার!' · ··

তিন



আমি কিন্তু একবারও শ্রীচৈতন্য নাম উচ্চারণ করিনি। যদিও নিমাইয়ের তিরোধানের কথাটা বলে ফেলেছি, তা নিতান্তই তাঁর জন্মলগ্নে নামের উৎপত্তির কারণটা ব্যাখ্যার প্রসঙ্গে। আসলে যে-ঘটনা থেকে নিমাই শ্রীচৈতন্য নামে নবজন্ম লাভ করেছিলেন, আমি এবারের মতো যাত্রা সেখানেই শেষ করব। নিমাইয়ের নবজন্মের ইঙ্গিত আগেই দিয়েছি তাঁর অনিত্যতার উপলব্ধিতে। তার আগের জীবনটা কেমন? জগন্নাথ মিশ্রের বিশ্বম্ভর নামক পুত্রটির জীবনে কেবল তাঁর ভক্তিরসের কথাই বেশি করে শুনেছি, আর নিজেরাও ভক্তিতে আপ্লুত হয়েছি। কিন্তু তাঁর শ্রীচৈতন্য নামের আগেও একটা জীবন ছিল। ইতিহাসের পথ ধরে আজ সেই জীবন দর্শনেই আমার যাত্রা।

এবার বলি, যাত্রা আমার নবদ্বীপ। সন্ধান একটি বালকের। একটি অতি পরিহাসপ্রিয় দুষ্টু বালক, কখনো অতিমাত্রায় রাগী, আসলে রমণীমোহন

প্রেমিক। কেবল দু-বাহু তুলে নাম গান গেয়ে, চোখের জলে ধুলায় গড়াগড়ি যায়। পৃথিবীর ইতিহাসে সব বিশিষ্ট মহান ব্যক্তিদেরই জীবনের একটা ভূমিকা-পর্ব থাকে। আজ আমি সেই ভূমিকা-পর্ব দর্শন করব।

কিন্তু কোথায়? যাব নবদ্বীপে। কোথায় নবদ্বীপ? মহাভারত রামায়ণে কোথাও এমন স্থানের নামোল্লেখ করা হয়নি। তাহলে বুঝতে হবে, পাণ্ডব-বর্জিত দেশ। কথাটা মিথ্যা নয়। সম্ভবত মহাভারতের কালের পরে, রাঢ় থেকে নিম্নবঙ্গের বিস্তর ভৌগোলিক পরিবর্তন ঘটেছিল। যেখানেই যাওয়া যাক, সর্বাগ্রে সেই স্থানটির যথার্থ নির্ণয় হওয়া দরকার।

গঙ্গা যতই সমুদ্রাভিমুখী হয়েছিল, ততই অনেক দ্বীপের সৃষ্টিও হয়েছিল। দ্বীপগুলির সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তাদের নামকরণও হয়েছিল। মানুষের এটা স্বভাব। যে কোন সৃষ্টিরই নাম চাই। নাম না হলে তার সম্যক পরিচয় হয় না। অনেকে অবশ্য নানারকম বলেছেন। নতুন সৃষ্ট দ্বীপ বলেই নবদ্বীপ নাম হয়েছে। কেউ বলেছেন, রাত্রে এক তান্ত্রিক সন্ন্যাসী নাকি নয়টি দীপ জ্বেলে যোগসাধনা করতেন, তার থেকেই নবদ্বীপ বা নদীয়া। ইতিহাসের পাঠে আছাড় খেয়ে, ও সব মতামত ধোপে টেকেনি। সেনরাজাদের আমলে নবদ্বীপ যখন রাজধানী ছিল, তখন থেকেই, গঙ্গার বুকে জেগে ওঠা, নবদ্বীপ রাজ্য অনেকগুলি দ্বীপে বিভক্ত ছিল। ইতিহাসের ধূলিকণা সরিয়ে দেখছি, এড়ু মিশ্রের কারিকা থেকে, অনেক প্রাচীন বৈষ্ণব কবিরাও সে-সব বলে গেছেন। কেউ বলেছেন, 'নদীয়া পৃথক পৃথক গ্রাম নয়। নবদ্বীপে নবদীপ বেষ্টিত যে হয়।' এ হল স্বয়ং নরহরি কবিরাজের 'নবদ্বীপ পরিক্রমা'-র কথা। আবার তিনিই আর এক জায়গায় লিখেছেন, 'নবদ্বীপে নবদ্বীপ নাম, পৃথক পৃথক কিন্তু হয় এক গ্রাম।'

ইতিহাসের সঙ্গে ভূগোলের সম্পর্ক নিবিড়। অতএব এবার একবার ভৌগোলিক সীমারেখা ও ভাঙাগড়ার দিকে ফিরে তাকাই। অগ্রদ্বীপের পরেই নবদ্বীপের শুরু। অগ্রদ্বীপের মাঝখানে কণ্টকদ্বীপ—মানে কাটোয়া। নবদ্বীপের শুরু, মাজদিয়া অঞ্চল নিয়ে মধ্যদ্বীপ—এক। কিছু দক্ষিণে এসে গঙ্গার পুব পারে সীমন্তদ্বীপ, যার মধ্যে রয়েছে কাসিয়াডাঙা, বেলপুকুরিয়া, সরভাঙ্গা ইত্যাদি—দুই। এর মধ্যেই একটা জায়গার নাম ধর্মদহ, কারণ ধর্ম নামে একজন রাজা এখানে নাকি রাজত্ব করেছিলেন তারপরে গঙ্গার পশ্চিম পারে রুদ্রদ্বীপ। এর সীমানায় আছে পূর্বস্থলী, শঙ্করপুর, রাহুপুর বা রুদ্রডাঙা—তিন। রুদ্রদ্বীপ ছেড়ে একটু দক্ষিণে এলেই জলের চক্রাকার প্রবাহের অন্তর্ভাগে অন্তর্দ্বীপ—চার। এর পশ্চিমপারে মোদ্রুম দ্বীপ। মায়াপুর, কেউ বলে মিঞাপুর, ভারুই-

ডাঙা এই দ্বীপের গ্রামসমূহ—পাঁচ। মায়াপুর বলুন আর মিঞাপুর—এ গ্রামেই নিমাই জন্মেছিলেন। আর অন্তর্দ্বীপেই প্রাচীন নবদ্বীপ রাজধানী ছিল।

আমার সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি নেই, আগেই বলেছি। এই মিঞাপুর নামটা পাঠান সুলতানের আমলে হয়তো কেউ দিয়েছিল। কারণ পাঠান যুগের আগে, সেনরাজারা ছিলেন, দ্বীপের গ্রামটিও তখন ছিল। ইদানীং অবশ্য সেনরাজাদের প্রাসাদের ভগ্নস্তূপ অন্তর্দ্বীপে বিশেষ দেখা যায় না, বল্লালদীঘিটি আছে। এর পশ্চিম পারে একডালা, মহৎপুর মোদ্রদ্রুম দ্বীপের মধ্যে। এই দ্বীপের দক্ষিণে জহ্নুদ্বীপ। নাম যার জাননগর—ছয়। এরও দক্ষিণে ঋতুদ্বীপ, যেখানে আছে রাউতপুর বিদ্যাসাগর ইত্যাদি গ্রাম—সাত। এখান থেকে গঙ্গার ওপারে গোদ্রুমদ্বীপ—আট। আবার এরও দক্ষিণে গেলে, সমুদ্রগড় ইত্যাদি অঞ্চল নিয়ে বোলদ্বীপ—নয়। নয়দ্বীপে নবদ্বীপ।

তারপরেও যদি দক্ষিণে নামতে আরম্ভ করি, দেখবো গঙ্গা এ রকম অনেক দ্বীপের সৃষ্টি করে গেছে। তার মধ্যে খড়্গদ্বীপ আর শৃগালদ্বীপ—কলকাতার কাছাকাছি অধিবাসীদের সবচেয়ে বেশি চেনা। খড়দহ শিয়ালদহ কে না চেনেন? তারপরেও যদি নামতে নামতে সুন্দরবনের দিকে গমন করি তাহলে যশোর খুলনা জড়িয়েও অনেক দ্বীপের খোঁজ পাবো।

কিন্তু বিশ্বের তিন ভাগ জলে অনেক দ্বীপ বর্তমান। তাদের খোঁজে আমার দরকার নেই। আজ আমার গন্তব্যস্থল নবদ্বীপ। তার সীমানাটা মোটামুটি দেখে নিলাম। নবদ্বীপ থেকে নদীয়া নামের উৎপত্তি কোন সন্দেহ নেই। নদীয়া নামে শহরের যে-পরিচয়, তাও দেখতেই পাচ্ছি, আজকের নবদ্বীপ নগর নয়। প্রাচীন রাজধানী অন্তর্দ্বীপ হলেও, দক্ষিণ থেকে পশ্চিমে মায়াপুর পর্যন্ত নগর ছড়িয়ে আছে। এখানে নগরের চেহারাটা আমার তেমন চোখে মনে—কোথাও তেমন ধরতে চাইছে না। কারণ, প্রাসাদ অট্টালিকা, সুলতানি জাঁকজমক, রাজপথে রাজকীয় যানবাহন, অশ্ব হাতী কিছুই চোখে পড়ছে না, তবে আর এ এমন কি নগর।

অবশ্য সেই চোখে যদি নগর দেখতে চাই তাহলে আমাকে গৌড়ে যেতে হয়। কিন্তু আমার 'নায়ক'-টির সন্ধান সেখানে পাওয়া যাবে না। নবদ্বীপেই তার জন্ম। একদা সেনরাজাদের রাজধানী অবশ্য এখন আর নেই, অতএব রাজধানীর মতো নগর আমি আশা করতে পারি না। যাঁকে বলা যায়, চৈতন্য-মঙ্গলের আদি কবি, শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর কিন্তু বলেছেন, 'নবদ্বীপ হেনগ্রাম ত্রিভুবনে নাঞি।'—তাঁর গ্রাম বলা মানেই যে আবার ধরে নিতে হবে, নবদ্বীপ

সত্যি গ্রাম, তাও নয়। হর্ম্যমালা প্রাসাদ তদ্রূপ নেই বটে, তবে 'মুলুকপতি' বা 'অধিকারী' বা 'কাজীর' গৃহসমূহ নিশ্চয়ই খুব ছোটখাটো ইমারত নয় দেখতেই পাচ্ছি। অবস্থাপন্ন অনেক গৃহস্থেরও চোখে পড়বার মতো কোঠা-বাড়ি রয়েছে। টোল, বিদ্যালয়, মন্দিরের তো কথাই নেই। এই চেহারাটাই আসল। তার চেয়েও নবদ্বীপের বড় পরিচয় হল, 'এক গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে।' ··সেটা আমিও দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু নবদ্বীপের মানুষের গৌরব যেটা, সেটা বলতে গেলে সারা দেশেরই, তবে কবিরা সব সময়েই একটু বাড়িয়ে বলেন, যেমন : 'লক্ষ কোটি অধ্যাপক নাহিক নির্ণয়।'

অধিবাসীর সংখ্যানুসারেই যদি লক্ষ লক্ষ বলা যায়, তাহলে অধ্যাপকদের ক্ষেত্রে একেবারে 'লক্ষ কোটি' শব্দটা বড় কানে লাগে। তবে কবি-চরিত্রের কথা বিশ্বলোকে জানে। চিত্র আঁকতে গিয়ে, কোথাও হয়তো কিঞ্চিৎ রং চড়িয়ে বসেন। আমার চোখে সেটা অবশ্য সে-রকম দোষের মনে হয় না। সাধারণ মানুষও সে-সব নিয়ে বিশেষ কিছু ভাবেন না। পণ্ডিতবর্গ তা নিয়ে নানা বিচারে বসে যান। তবে এ কথাটাও সত্যি, নিজের চোখেই দেখছি, এখানে হিন্দুর সংখ্যাই বেশী আর সরস্বতীর দৃষ্টিপাতও এখানে বিলক্ষণ অতি গভীর ও বিস্তৃত। বাঙালী ব্রাহ্মণ প্রতিভা আর মনীষার বিকাশ, নবদ্বীপের একটা বিরাট অধ্যায় জুড়ে। নব্যন্যায়, নব্যস্মৃতি, নব্যতন্ত্র সংকলন সমস্তই এই কালের ইতিহাস।

নবদ্বীপকে নগরের রূপ দিয়েছে তার পাণ্ডিত্যের ইতিহাস। অবশ্য আমি এখনও সেই দিনটিতে নিয়ে গিয়ে পৌঁছইনি, যে-দিনটিতে 'শ্রীমান' জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কারণ সেটি একটি পর্ব। তার আগেই স্থানের চিত্রটি একবার দেখে নিচ্ছি। এক গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করলে, ঘাটে ঘাটে কত লোক স্নান করতে পারে, তার বিচার আমার দ্বারা অসম্ভব। কিন্তু কারা স্নান করেন?

জবাবে নিশ্চয়ই নবদ্বীপের অধিবাসীদের কথাই বলতে হয়। তার সঙ্গে জুড়তে হবে, বহিরাগত পণ্ডিত আর পড়ুয়াদের। নানা দেশ থেকে নবদ্বীপে লোক আসে বিদ্যারসের সংগ্রহে। নিমাইয়ের জন্মের অনেক আগে থেকেই নবদ্বীপের এই হল চিত্র। যেখানে সামান্য বালকও অধ্যাপক ভট্টাচার্যের সঙ্গে তর্কে অবতীর্ণ হয়। আমি কি অধ্যাপক পণ্ডিতবর্গের জনে জনের গৃহে যাব? পথ পরিক্রমা যতটা সহজ, বোধ হয় ততটা পেরে উঠবো না। তার চেয়ে গুন-গুনিয়ে কিছু নাম শুনিয়ে দিই। কাজ হবে।

যেমন বাসুদেব সার্বভৌম, রঘুনাথ শিরোমণি, মথুরানাথ তর্কবাগীশ, স্মার্ত

রঘুনন্দন, রামভদ্র সার্বভৌম, ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ, রুদ্ররায় তর্কবাগীশ…। এঁরা মানব-জাতিরই গৌরব। বিশেষ করে, আমি যে ভাষায় কীর্তন করছি, সেই বাঙলা ভাষাভাষী বাঙালীদের মহাগৌরব তো বটেই। কারণ এই সব জগজ্জয়ী পণ্ডিতবর্গের অধ্যাপনা জ্ঞানচর্চা নবদ্বীপ থেকে খ্যাতি বহন করে নিয়ে গেছে উত্তর আর দক্ষিণ ভারতের বহু দূর পর্যন্ত। এই হল, নবদ্বীপের একদিকের চিত্র। অবশ্য বাসুদেব সার্বভৌমের মিথিলার কাহিনীটি শোনাতে খুবই ইচ্ছা করছে। তবে আপাতত সে-কাহিনীতে না গেলেও আমাদের ক্ষতি নেই। তবে নামটা মনে রাখবার মতো। পরেও তাঁকে আমি দেখতে পাবো।

অন্যদিকের চিত্রটি কেমন? জীবের ধর্ম-কর্ম নিয়েই সবাই আছে। কেউ কেউ মঙ্গলচণ্ডীর গীত করেই সারা রাত কাটাচ্ছে। কেউ দম্ভের সঙ্গে বিষহরির পূজা করছে। বিস্তর টাকা পয়সা খরচ করে প্রতিমা তৈরি করাচ্ছে। আর ছেলেমেয়েদের বিয়েতে ধন নষ্টের তো কোন কূল-কিনারাই নেই। এ সব ছাড়াও দেখা যাচ্ছে, কেউ বাশুলীদেবীর পূজা করছে, কেউ মদ মাংস সহকারে যক্ষের পূজা করছে। আর সব সময়েই তাদের ঘরের আঙিনায় লেগে আছে গান বাজনা নাচের ঝনঝনানি।

ইতিহাসের এ অধ্যায় যেমন জটিল, তেমনি কুটিল, ভয়াবহ। একদিকে যেমন পণ্ডিত অধ্যাপকদের জগজ্জয়ী মনীষার ও বিদ্যাচর্চার অভিযান চলছে, আর একদিকে তখন ধর্মের নামে তামসিক কাণ্ড-কারখানার আসরও বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। আর এ সব নিয়ে যে ধনাঢ্য অশিক্ষিত ব্যক্তিরাই মেতে আছে, সেটাও পরিষ্কার। ঐতিহাসিক হয়তো একেই যুগ ও জীবনের কনট্রাস্ট বলেন? চিত্রটা অবশ্য সেই রকমই বিপরীত।

কিন্তু আরও সূক্ষ্মভাবে যদি লক্ষ করি দেখতে পাবো সার্বভৌম, শিরোমণি, তর্কবাগীশ, স্মার্ত, সিদ্ধান্ত আর আশ্রমবাসীরা, এঁরা কেউই বৈষ্ণব নন। আর যারা চণ্ডীমণ্ডল, বিষহরি, বাশুলী, যক্ষের পূজা করছে, নাচে গানে, মদে-মাংসে টাকা নয়-ছয় করছে, তারা তো কেউ বিষ্ণুর নামের কাছেও নেই। যে কারণে পরে কবি দুঃখ করে বলেছেন, 'না শুনি কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল।' ··

তা বলে কি নবদ্বীপে বৈষ্ণব নেই? আছেন, তবে তাঁরা সংখ্যায় বড়ই অল্প। তাঁদের অবস্থা সত্যিই করুণ! অবশ্য, কোন রকম সাম্প্রদায়িকতা না করেও, আমি নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছি, কেবল বৈষ্ণব বলে নয়, যে কোন হিন্দু ব্রাহ্মণের ওপরেই সুলতানী রাজরোষ বড় প্রকট। এর মধ্যে কিছু রাজনীতিও কি আছে? সন্ধান করে দেখা দরকার। তার আগে, একবার যাই জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে।

চার



আগেই বলেছি, আমি একবারও 'শ্রীচৈতন্য' নামোচ্চারণ করিনি। নীলাচলেও আমি আপাততঃ যাব না। আমার বর্তমান গন্তব্য নবদ্বীপ। ঐতিহাসিক চরিত্রটি আপাতত দেখছি পরিহাসপ্রিয় দুষ্টু বালক, অথচ রেগে গেলে রক্ষে নেই। আবার লেখাপড়ায়ও আশ্চর্য পারদর্শী এবং রমণী-মোহন প্রেমিক। আমি তাঁর লীলা দেখব।

আজ কত তারিখ? চৌদ্দশো ছিয়াশি খৃষ্টাব্দের উনিশে ফেব্রুয়ারি। তার মানে খৃষ্টাব্দের হিসাবে মাসের এদিক ওদিক বাদ দিলে ঠিক পাঁচশো বছর আগের ঘটনা। বাংলা মাসটা ফাল্গুন। আজ শুধু ফাল্গুনী পূর্ণিমা নয়, চন্দ্রগ্রহণের দিনও বটে। চন্দ্রগ্রহণের সময়, যখন গোটা নবদ্বীপ সংকীর্তনে মুখরিত, জগন্নাথ মিশ্রের পত্নী তখন প্রসব করলেন ভবিষ্যতের নতুন ইতিহাস স্রষ্টা নেতা ও অবতার সন্তানকে। তখনও তার নাম হয়নি। পরিচয় শ্রীশচীনন্দন। পরে বিশ্বম্ভর রাখা হয়েছে। কিন্তু প্রতিবেশিনীদের কথায় শচী নাম রাখলেন নিমাই। আমি নিমাই নামের একটা ব্যাখ্যা দিয়েছি। তবে এই অনিত্য সংসারে ভুল ত্রুটি কার না হয়? আমারও হতে পারে। আমি একটা অর্থের সন্ধান করেছিলাম। কিন্তু কেবলমাত্র নিম থেকেই যদি নিমাই নাম হয়ে থাকে, তবে প্রচলিত আর একটা অর্থও পাওয়া যাচ্ছে। নিম যদিও এ দেশের সব দিক থেকেই উপকারী, তার পাতা, ডাল, এমন কি নিমগাছের গা থেকে নির্গত রসও অনেকে মৌমাছির মতোই পান করেন, তবু তার স্বাদের তিক্ততার জন্য একটা কলংকিত নামও তাকে দেওয়া হয়েছে। সেই নামটি হল, যমের অরুচি।

সেই অর্থেই কি নিমাই নাম রাখা হয়েছে? যেন যমের অরুচি হয়ে তিনি বেঁচে থাকেন। নিম কি সত্যি যমের অরুচি? মানুষের তো দেখি, নিমের সব কিছুতেই রুচি। ফাল্গুন চৈত্রে কচি নিমপাতা ভাজা দিয়ে ঘৃত সহযোগে অন্নে রুচি নেই, এমন বাঙালী বিশেষ দেখিনি। নিমের দাঁতন তো সর্বভারতীয় দন্ত-মর্দনের শলাকা। নিমগাছের গা ফেটে যে রস বেরোয়, কেবল মৌমাছিই সেখানে ভিড় করে না, সাধুসজ্জন ব্যক্তিদেরও দেখেছি, খেজুর গাছের রস

ধরবার মতো, নিমগাছে হাঁড়ি বেঁধে রস সংগ্রহ করছে। তার ফলের স্বাদ তিক্ত কী না জানি না, পাখিদের খেতে দেখা যায়। সেই হিসাবে দেখলে নিমকে কেন যমের অরুচি বলবে ?

তর্কের গতি সব সময়েই কুটিল। আপাতত এ তর্ক থাক। এবার যাই, সেই সদ্যোজাত অপরূপ শিশুটিকে দর্শন করি। 'ফাল্গুন শোভন নিশি হিমকর জ্যোতি' তখন 'চন্দ্রমা-গ্রাহয়ে রাহু' সেই সময়ে 'প্রভু শুভজন্ম, পৃথিবীতে হেনকালে।' রূপ লাবণ্যে অমিয় গোরাচাঁদ, এ সব হল আমাদের মানুষের চোখে দেখা। অতুলন বিশ্ববিমোহন। কিন্তু কবিদের কথা আলাদা। কবি লোচনদাস জন্মমাত্রই নিমাইয়ের বর্ণনা দিয়েছেন, 'তিলফুল জিনি নাসা উন্নত, গোরা অঙ্গ যেন অমিয় কিরণে ঝলমল করছে। চারু গালের জ্যোতি, অরুণ অধর। এমন সুন্দর শ্রীবুক, দেখে পিরিতি জেগে ওঠে। যেমন বিশাল বক্ষ, তেমনি সিংহ গ্রীবা, হস্তীর মতো স্কন্ধ। আজানুলম্বিত বাহু। কদলীর মতো বিশাল নিতম্ব আর উরু। চরণ দুটি অরুণ-কমলদল। শুধু তাই নয়। পায়ের তলে দেখতে পেলেন, ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশের চিহ্ন। অর্থাৎ কৃষ্ণের যা ছিল।

আমার স্মৃতিতে জেগে উঠছে, কবিরাজ গোস্বামীর নিমাইয়ের যুবক মূর্তির বর্ণনার ব্যাপারটা যেন সেই রকমই। নইলে সদ্যোজাত শিশুর এমন রূপ কি সম্ভব ? লোচন ভাবাবেগে যুবক চৈতন্যের রসমূর্তিটি সদ্যোজাতের ওপরেই আরোপ করেছেন। তার পরেও উনি বলছেন, দেখতে দেখতে সবাইয়ের নয়ন জুড়াল ! হ্যাঁ, তা আমাদেরও জুড়াল। কিন্তু 'সভার মনে হইল এই নাগরীর প্রাণ।'…তার মানে উপস্থিত রমণীগণ মনে করলেন, বৈকুণ্ঠ থেকে শ্রীকৃষ্ণ এসে জন্ম নিয়েছেন। বেশ, এ কথাও না হয় মেনে নেওয়া গেল। কেন না, নিমাই ইতিহাসের এমন একটি ক্ষণে জন্মগ্রহণ করলেন, যখন অত্যাচারিত দেশবাসীরা কৃষ্ণের মতো একজন উদ্ধারকারী অবতারের জন্য প্রার্থনা করছে। নিমাই সেই ভবিষ্যতের অবতার—এটাই কবির বক্তব্য। কিন্তু রমণীদের 'আলসল অঙ্গসভার শ্লথ নীবিবন্ধ' এ আবার কেমন কথা ? আঁতুড় ঘরের একদিনের শিশুকে দেখতে এসে যদি নদীয়ার নাগরীদের প্রাণে এমন ভাবের উদয় হয়ে থাকে, তবে তাঁরা সুস্থ সাধারণ ছিলেন কি ? অবশ্য লোচন বরাবরই নগরালী ভাবের প্রচারক আদিরসের কবি। তবে একটা কথা, লোচন এবং আরও অনেকেই শিশু নিমাইকে দেখে বললেন, 'মহারাজ রাজাধিপ লক্ষণ বিরাজে।'

কবিরাজ গোস্বামী একটা নতুন কথা কেন আমাদের শুনিয়েছেন, বুঝতে পারছি না। তিনি বলছেন, তের মাস হয়ে গেল, তবু শচীর সন্তান প্রসব হল

না, এতে জগন্নাথ মিশ্র উদ্বিগ্ন হলেন। নিমাইয়ের জন্ম সংক্রান্ত বিষয়ে এমন কথা আর কেউ বলেননি। তাঁর শকাব্দের হিসাবে, চৌদ্দশো ছয় শকে মাঘের শেষে নিমাই মাতৃগর্ভে এলেন। আর জন্ম হল, চৌদ্দশো সাত শকে ফাল্গুন মাসে, পৌর্ণমাসী সন্ধ্যাকালে সেই জন্মলগ্নের শুভক্ষণ উপস্থিত হল।

এই হিসাবটা কবিরাজ গোস্বামী কোথা থেকে পেয়েছেন, তার কোন ব্যাখ্যা দেননি, বাকি কথাগুলি সবই মিলছে। সিংহরাশি সিংহলগ্ন উচ্চগ্রহ গণ ষড়বর্গ, অষ্টবর্গ সর্ব সুলক্ষণ। যে চাঁদে কলঙ্ক আছে, তাকে দিয়ে আর কি প্রয়োজন? অকলঙ্ক গৌড়চন্দ্রই তো দর্শন দিলেন। লক্ষ্য করে দেখছি, তিনি 'গৌড়চন্দ্র' বলেছেন, গৌরচন্দ্র নয়।

'গৌড়চন্দ্র' বলার উদ্দেশ্য কি? গৌড় মানে রাজধানী, সুলতান সেখানে থাকেন। গৌরবার্থে সুলতানকেই 'গৌড়চন্দ্র' বলতে হয়, কারণ তিনি গৌড়ের রাজা। কিন্তু কবিরাজ গোস্বামী নিমাইকে বললেন, 'গৌড়চন্দ্র'। সেই জন্যই আকাশের কলঙ্কিত চাঁদকে রাহু গ্রাস করল।

কবিরাজ গোস্বামী আরও সংকেত করলেন, 'প্রসন্ন হইল সব জগতের মন / হরি বলি হিন্দুকে হাস্য করয়ে যবন ...।' অবশ্য তাঁর আগেই, বৃন্দাবনদাস ঠাকুর, নিমাইয়ের জন্মমাত্র বলেছেন, 'অন্যের কি দায় বিষ্ণুদ্রোহী যে যবন / তাহারাও এ শিশুর ভজিবে চরণ।'...কবিরাজ গোস্বামী এক্ষেত্রে বৃন্দাবন দাসকেই অনুসরণ করেছেন।

নিমাইযের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে যবনদের প্রতি এ বিরূপতার কাবণ কী? ইতিহাসের পথের যাত্রায় কোনো অনৈতিহাসিক গল্প-কাহিনীর স্থান না থাকা উচিত। আমাকে যথার্থ ঐতিহাসিক পথেই যেতে হবে।

চৌদ্দশো ছিয়াশি খ্রীস্টাব্দের উনিশে ফেব্রুয়ারি, ফাল্গুনী পূর্ণিমা আর চন্দ্রগ্রহণের দিন, নিমাইয়ের জন্ম-সময়ে কি সারা নবদ্বীপ অঞ্চলে, আর কোনো হিন্দু ব্রাহ্মণ-সন্তান জন্মগ্রহণ করেননি? নবদ্বীপ ছোটখাট দেশ নয়। নবদ্বীপকে যদি বাদই দিই, সারা বাংলা দেশেও কি সেই দিন, সেই মুহূর্তটিকে আর কোন বাঙালী ব্রাহ্মণ-সন্তানকে তার মা প্রসব করেননি? অনিত্য এই সংসারের মতো জন্ম-মৃত্যুও তো অনিত্য এবং নিরবধি। একথা কেউ বলতে পারেন না, সেই দিনে, সেই সময়ে আর কারুর জন্ম হয়নি। হয়েছিল নিশ্চয়ই। তবে নিমাইয়ের প্রতিই ইতিহাসের উজ্জ্বল আলোক রেখাটি কেন এসে পড়ল?

তাহলে আমাদের নিমাইয়ের জন্ম সময়ের কিছু আগে, নবদ্বীপের পরিবেশ পরিস্থিতি কিছু পর্যালোচনা করা দরকার। দেখা দরকার, সেখানে তখন কি

ঘটছিল। একটা বিষয় বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়, নবদ্বীপের যে চিত্র আমি দেখেছি, সেখানে বিস্তর জগজ্জয়ী পণ্ডিত অধ্যাপক ছাত্রগণ রয়েছেন, অন্যদিকে চণ্ডী বাশুলী বিষহরির পূজা, বলি, মদ মাংস নৃত্যগীতে সবাই মশগুল। কিন্তু বৈষ্ণবের সংখ্যা দেখছি খুবই কম।

অবশ্য বৈষ্ণবের সংখ্যা কম বলেই যে গৌড়ের মুসলমান সুলতান আর তার চ্যালা চামুণ্ডারা অন্যান্য ব্রাহ্মণদের উপর তুষ্ট ছিলেন, ঘটনা আদৌ তা নয়। গোটা ব্রাহ্মণ জাতির ওপরেই যবনরাজের বিশেষ অবিশ্বাস এবং ক্রোধ। কে তখন গৌড়ের সিংহাসনে অবস্থান করছেন? মাহমুদ শাহী বংশের জলালুদ্দীন ফতেহ্ শাহ। কিন্তু কেন, বিশেষ করে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদের উপরেই তাঁর এত রাগ, এত অবিশ্বাস?

ফতেহ্ শাহর আমল দেখছি চৌদ্দশো তিরাশি থেকে চৌদ্দশো একানব্বই। ইতিহাসের পাতা উলটে দেখছি, রাজা গণেশের ছেলে যদু, যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে জলালুদ্দিন নাম নিয়ে গৌড়ের সুলতান হয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে ফতেহ্ শাহকে মিলিয়ে ফেলবার প্রবণতা অনেকের মধ্যে দেখা যায়। এই ফতেহ্ শার আমলে দেখছি, নবদ্বীপের কাছেই পিরল্যা গ্রামের সব ব্রাহ্মণরা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে, রাজানুগ্রহ লাভ করেছেন। স্বভাবতই এই সব ধর্মান্তরিত ব্রাহ্মণরা নবদ্বীপের যাবৎ হিন্দু ব্রাহ্মণকেই মুসলমান করতে চাইলেন।

ইতিহাসকে বিকৃত করার দায়িত্ব আমি নিতে পারি না। আমার ঐতিহাসিক হবার ইচ্ছা নেই। পিরল্যা গ্রামের ব্রাহ্মণরা নিজেরা যেচে মুসলমান হয়েছিলেন, এমন মনে হয় না। দু-চারজন হতে পারে, সবাই মিলে একসঙ্গে স্বেচ্ছায় ধর্মান্তরিত হয়েছিল, এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। গৌড়ের সুলতানদের আমলে হিন্দুদের জোর করে মুসলমান-করণের ঘটনা বাস্তবিকই ঘটেছিল। ঘটনা ঘটে যাবার পরে, আর তো কোন উপায় নেই। উপায় যখন নেই, তখন বাকিদেরই বা ছাড়াছাড়ি কেন? সবাইকেই এক গোয়ালের গরু করতে হবে।

অবশ্য মনে রাখতে হবে, এক্ষেত্রে কেবল ব্রাহ্মণদের কথাই বিশেষ করে বলা হচ্ছে। আর ব্রাহ্মণ যখনই মুসলমান হয়েছে, তাদের হিন্দুবিদ্বেষ ইতিহাসে প্রলয় কাণ্ড না করে ছাড়েনি। ইতিহাসই তার সাক্ষী। সেই মতানুসারেই দেখা যাচ্ছে, পিরল্যা গ্রামের যত যবন, নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদের উচ্ছন্ন করবার জন্য মেতে উঠেছে। সেজন্য 'পিরল্যাগ্রাম' ইতিহাসে 'বিষম' আখ্যা পেয়েছে। তারা গিয়ে ফতেহ্ শাহর দরবারে এক মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করল, "নবদ্বীপের ব্রাহ্মণরা আপনার রাজ্যে প্রমাদ ঘটাবে! শোনা যাচ্ছে, গৌড়ে

ব্রাহ্মণ রাজা হবে। আপনি এই প্রমাদ জেনেও নিশ্চিন্ত থাকবেন না, ব্রাহ্মণরা অবশ্যই রাজা হবে। কেন না 'গন্ধর্বে লিখন আছে ধনুর্ময় প্রজা।' " 'ধনুর্ময় প্রজা' মানেই প্রাচীন যুগের হিন্দু যোদ্ধাদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তা ছাড়া, পিরল্যার ধর্মান্তরিত ব্রাহ্মণ যবনেরা আরও যুক্তি দেখাল, 'ব্রাহ্মণে যবনে বাদ যুগে যুগে আছে।'

ব্যাপার বড় সাংঘাতিক! ফতেহ্ শাহ বিচলিত হলেন। এই মিথ্যা কথা তাঁর মনে লাগল। তিনি হুকুম দিলেন, নদীয়া উচ্ছন্ন কর। শুরু হয়ে গেল জগঝম্প। ব্রাহ্মণের টিকি কাটে, মুখে থু থু দেয়, উপবীত ছিঁড়ে ফেলে। ব্রাহ্মণদের ধরে ধরে রাজা রীতিমত জাতি প্রাণ নিতে লাগল। যার ঘরে শাঁখ বাজে, তার ধন প্রাণ জাতি নাশ। কপালে তিলক, গলায় পৈতা দেখলে রক্ষে নেই। দেব-দেউল ভাঙা-চোরা তুলসী গাছ উপড়ানো। এমন কি হিন্দুদের জল ঢালার জায়গা বট অশত্থ গাছ কেটে উড়িয়ে দিল। গঙ্গায় স্নান করতে যাওয়া মানেই প্রাণ হাতে করে যাওয়া।

এই রকম যখন অবস্থা, তখনই বাসুদেব সার্বভৌম সকলের আগে নবদ্বীপ ছেড়ে উড়িষ্যায় চলে গেলেন। কিন্তু যে সব অত্যাচারের বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে, সবই বৈষ্ণব কবিদের লেখায়। 'গন্ধর্বে লিখন আছে' এ কথাটা কোথা থেকে এলো? কোন্ গন্ধর্বে, কোথায়? বিশেষ করে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ 'রাজা হবে হেন আছে' আর 'ধনুর্ময় প্রজা' এ সব কথা আগেই কোন্ গন্ধর্বে ভবিষ্যৎবাণী করেছে?

পুরাণের সঙ্গে নবদ্বীপের বৈষ্ণব জাগরণের কোন সম্পর্ক নেই। পাণ্ডববর্জিত এ দেশের কথা পুরাণে বলা হয়নি। গন্ধর্বের কথা বললেই পুরাণের কথা মনে আসে। তবু আপাতত সে-সব প্রশ্ন না তুলে, এটা বলা যায়, শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণেরই আর এক ভিন্ন রূপের অবতার। বৈষ্ণব কবিগণ সবাই এ কথা বলেছেন। অথচ, যবন রাজ্যের সেই ভয়ঙ্কর অত্যাচার যখন চলছে, তখন ফতেহ্ শাহ রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন, 'কালী খড়্গ-খর্পরধারিণী দিগম্বরী। / মুণ্ডমালা গলে কাট কাট শব্দ করি॥ / ধরিয়া রাজার কেশে বুকে মারে শেল। / কর্ণরন্ধ্রে নাসারন্ধ্রে ঢালে তপ্ত তেল।' ..

শুধু তাই নয়, মা কালী সুলতানকে এ কথাও বললেন, 'আজি তোর গলায় পেলিমু গোড়পাট / সবংশে কাটিমু তোর হস্তী ঘোড়া ঠাট।' ফতেহ্ শাহ ভয়ে বলল, 'মা আমাকে বাঁচিয়ে রাখ। নবদ্বীপে আমি ব্রাহ্মণদের বসাব, আমাকে প্রাণে রাখ।' বলে মা কালীর কাছে নাকে খত দিলেন, তারপরেই মূর্ছা। সকালে ঘুম থেকে উঠেই তিনি আজ্ঞা দিলেন, 'নবদ্বীপে সবাই সুখে থাকুক।'

রাজকর চাই না, সকলে চাষ-আবাদ করুক। এখন থেকে যে হাটে ঘাটে বিরোধ করবে (মুসলমানরা), দেব-দেউল ভাঙবে, অশত্থ বটগাছ কাটবে, তাকে ত্রিশূলে চড়াব।'

রাজাজ্ঞা পেয়ে নবদ্বীপে সবাই খুশি। রাজা বলেছেন, শঙ্খ ঘণ্টা বাজুক, মন্দিরে মন্দিরে পূজা হোক, নৃত্য গীত হোক, ফুলপত্র ছড়িয়ে পড়ুক, সবাই গঙ্গা-স্নান করুক। নবদ্বীপের লোকেরাও আমার প্রজা, তাদের অধিকার আছে নিজধর্ম পালনের। কবি দয়ানন্দ বললেন, 'নবদ্বীপের নতুন জন্ম হল। শরৎ-কালে রাত্রিশেষে পুষ্পবৃষ্টি হল। মহা-মহাজন যারা গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছিলেন, তাঁরা আবার ফিরে এলেন।'

আশ্চর্য, এটা লক্ষণীয় নয়, শ্রীকৃষ্ণ ফতেহ্ শাহকে ভয় দেখালেন না, ভয় দেখালেন মা কালী? তাও আবার সে কথা বলছেন বিশেষ করে বৈষ্ণব কবিরাই! তাঁদেব বিশ্বাস মতে, অত্যাচারী শাসককে এক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণেরই তো ভয় দেখাবার কথা। কিন্তু মা কালীর লীলাই আলাদা। তিনি বৈষ্ণবদের কাছ থেকেও এমন শ্রদ্ধা ভক্তি পেলেন, তাঁকে দিয়েই সুলতানকে শায়েস্তা করলেন। ইতিহাস এ ব্যাপারটা কতখানি মেনে নেবে জানি না। তবে, এমন অনুমান হয়তো করা যায, নবদ্বীপের প্রজাদের দুর্দশা দেখে ফতেহ্ শাহ অন্য কোন কারণে তাঁর মত পরিবর্তন করেছিলেন।

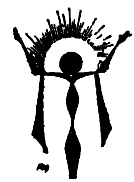
ইতিহাসের দিক থেকে ভাবতে গেলে, পিরল্যা গ্রামের যবনেরা যদি মিথ্যা কথাও রটিয়ে থাকে, সে কথা শুনে, কোন শাসকের পক্ষেই নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকা সম্ভব না। বিশেষ করে, মাহ্মুদ শাহী আমলের আগে, রাজা গণেশ মুসলমানদের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করেছিলেন, গৌড়ের সিংহাসন ছিনিয়ে নিয়ে-ছিলেন। মুসলমানদের যথেষ্ট ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও, তিনি বেশ কিছুকাল গৌড়ের সিংহাসনে ছিলেন। তাঁর মুদ্রা এবং আরও অনেক কিছুই তার সাক্ষী দিচ্ছে। অতএব হিন্দু রাজা হবার একটা আশঙ্কা, গৌড়ের মুসলমান সুলতানরা একে-বারে উড়িয়ে দিতে পারেন না।

কিন্তু অলৌকিক উপায়ে ফতেহ্ শাহকে অত্যাচার থেকে দমন করা, ইতিহাস-প্রসূত নয় বলেই মনে হয়। লৌকিক উপায়ে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদের সুলতানের অত্যাচার বন্ধ করার সামর্থ্য ছিল না। কী করে থাকবে? ক্ষত্রিয় নেই, ক্ষত্রিয় বর্ণই লুপ্ত। শূদ্রেরা বহু জাতিতে ভাগাভাগি, কেউ কারুর জল ছোঁয় না। মুসলমানদের মতো একতাও তাদের নেই।

এ সব ঘটনা নিমাইয়ের জন্মের আগে। বিশেষ করে, তাঁর জন্মের কয়েক মাস

আগে, অত্যাচারের বিশেষ বাড়াবাড়ি হয়েছিল, যে কারণে বাসুদেব সার্বভৌম নিমাইয়ের জন্ম দেখে যেতে পারেননি। কয়েক মাস আগেই জাতি ধর্ম বাঁচাবার জন্য উড়িষ্যায় চলে গিয়েছিলেন।

পাঁচ



নিমাই-জন্মের পূর্বে, এটা গেল একটা অধ্যায়। কিন্তু লক্ষ করলে দেখা যাবে, আরও আগে থেকে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের মধ্যে কিছু ঘটনা ঘটছিল। এ বিষয়ে আমার নিজের কোন মন্তব্য করার নেই। ইতিহাসই সব কিছুর সাক্ষী। সেই ঐতিহাসিক দৃষ্টিতেই দেখতে পাচ্ছি, নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ প্রচুর ছিলেন, কিন্তু তার মধ্যে বৈষ্ণবের সংখ্যা কম। তার কিছু নজীর দেখা যাক।

বৃন্দাবন দাস নিজেই নবদ্বীপের বাস্তব চিত্রটি তুলে ধরে, আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন। তার মধ্যেই তিনি আক্ষেপ করে বলেছেন, 'কেউ যুগ-ধর্মের কথা বলে না, কৃষ্ণের কীর্তন করে না, কারুর জিভে ভক্তির ব্যাখ্যান নেই। বললেও কেউ কৃষ্ণনাম নিতে চায় না। পূজা ভক্তি তো দূরের কথা। মঙ্গলময় কৃষ্ণের নামও শুনতে চায় না।'... বড় মর্মান্তিক আক্ষেপ!

এই আক্ষেপ থেকে বোঝা যাচ্ছে, নবদ্বীপে কয়েক ঘর মাত্র কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব আছেন। ভবিষ্যতে শ্রীচৈতন্য যখন কৃষ্ণের অবতার হলেন, তখন সেই অন্যান্য বৈষ্ণবরাই শ্রীকৃষ্ণের সমসাময়িক অন্যান্য অবতারত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু সে সব তো অনেক পরের কথা। তবে সমধর্মী বলে, তাঁদের সকলের সঙ্গেই একটা বান্ধবতা ছিল। সকলেই সকলের সঙ্গে আত্মীয় বান্ধবের মতো মেলামেশা করেন। তার মধ্যে বিশেষ করে 'অদ্বৈত'র ঘরেই সবাই বিশেষ করে যাতায়াত করেন। অন্য কোথাও বসে বৈষ্ণবধর্ম বিষয়ে কিছু করার উপায় নেই। যে যাঁর বাড়ি চলে যান। আর, কান্নাকাটি করেন। কেননা, কোথাও গিয়ে হরিনাম করার উপায় নেই।

এই অবস্থার মধ্যে, গভীর রাত্রে, শ্রীনিবাসেরা চার ভাই হরিনাম উচ্চস্বরে গান করেন। এই হরিনামটি নবদ্বীপে মোটেই নিরাপদের ব্যাপার ছিল না। যবনরা শুনতে পেলেই বলে, এ কি প্রমাদ! এ ব্রাহ্মণরা গ্রাম উচ্ছেদ করে ছাড়বে। এদের উচ্ছন্ন করতে হবে, ঘর দরজা ভেঙে নদীতে ফেলে দিতে হবে। এ কথা কেবল যবনরাই বলছে না। অন্যান্য ব্রাহ্মণরাও বলছেন, 'এ ব্রাহ্মণরা

গ্রামের অমঙ্গল করবে। যবনরা বলীয়ান হয়ে এসে আমাদের ওপরও অত্যাচার করবে।' এক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি, 'পাষণ্ডী' নামে কুখ্যাতি কেবল যবনদের ছিল না। ব্রাহ্মণদেরও ছিল।

এইবার দেখি আচার্য অদ্বৈতকে। তিনি কেবল আচার্য নন। তিনি 'সিংহ' নামেও খ্যাত। কেন? কারণ তিনি যখন বৈষ্ণবদের ওপর অত্যাচারের কথা শুনলেন, রাগে অগ্নিমূর্তি হয়ে উঠলেন। দিগম্বর হয়ে সমস্ত বৈষ্ণবদের বললেন, 'শ্রীনিবাস, গঙ্গাদাস, শুক্লাম্বর, আমি সবাইকে কৃষ্ণ দর্শন করাব। কৃষ্ণ এসে সবাইকে উদ্ধার করবেন। আমি তোমাদের কৃষ্ণভক্তি বোঝাব। যদি তাতেও না হয়, তবে নিজেই চার হাতে চক্র নিয়ে পাষণ্ডীদের গলা কাটব।'

এই সব উক্তি খুবই লক্ষণীয়। বোঝা যাচ্ছে, পাষণ্ডীদের আর যবনরাজ ভয়কে দূর করার জন্য কৃষ্ণের অবতারের আগমন একান্তই আবশ্যিক হয়ে উঠেছে। এই পাষণ্ডীরা হল অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ। বৃন্দাবনের কৃষ্ণ এখানে প্রার্থিত নন, মথুরা বা কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণই 'অবতারিবারে' প্রয়োজন। সেটাই অদ্বৈতর সংকল্প, তাই নিযে তিনি রীতিমত হুংকার করছেন। ত্রিভঙ্গ মুরলীধরের হাতে বাঁশী তিনি চাননি। চেয়েছেন চক্র। কংস, শিশুপাল-বধ, কুরুক্ষেত্র সমরাঙ্গণে ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অবতীর্ণ যে কৃষ্ণ, তাঁরই অবতার এসে পাষণ্ডীদের আর যবনরাজভীতি দূর করবেন।

পরিষ্কারই দেখছি, এ সব উক্তির মধ্যে কিন্তু অলৌকিক অবাস্তব কিছু নেই। নিমাইয়ের জন্মের পূর্বে দেখছি, অদ্বৈতই কৃষ্ণভক্তদের অগ্রগণ্য। তিনি বলছেন, কৃষ্ণের আগমনের সময় হয়েছে। "তিনি আসবেন, তিনি আসছেন।" তার আগেই, যবনরাজত্বে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদের ওপর যে অত্যাচারের চিত্র দেখেছি, তাতে হিন্দু রাজত্ব ফিরে আসুক, গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হোক, এমন ইচ্ছা হওয়া তো খুবই স্বাভাবিক।

এই 'ইচ্ছা'টাই কি "বিপ্র রাজা গৌড়ে হইবেক হেন আছে," এই গুজবের কারণ সেটা হয়তো পরে দেখতে পাব। আপাতত আমি কি দেখছি? অদ্বৈত কৃষ্ণের অবতার চান। বিনা উদ্দেশ্যে নয়। জীবের উদ্ধারের জন্য চান। এ বড় বিরাট কথা! ধর্মের বিলাসে মত্ত ব্যক্তিদের ইচ্ছাপূরণের কথা এ সব নয়। জীবের উদ্ধার মানেই, এর সঙ্গে সামাজিক ও রাজনৈতিক উদ্ধারের সংকল্প প্রকাশ পাচ্ছে। তিনি সমস্ত ভয় ত্রাস অত্যাচার থেকে উদ্ধার পেতে চেয়েছেন। সেইজন্য একদিকে তাকে 'সিংহ' বললেও, স্বভাবে তাঁর হৃদয় বড় করুণ। সর্বদাই জীবের উদ্ধারের কথা চিন্তা করছেন।

এ কথাও ঠিক। কেবল হুংকার নয়, করুণা যাঁর প্রাণে নেই, তিনি কেমন করে জীবের উদ্ধারের কথা ভাববেন ? তিনি কেবল আচার্য নন, সিংহ নন, করুণার অবতারও বটে। বলছেন, 'আমার প্রভু এসে যদি অবতার হন, তবে সকল জীবের উদ্ধার হয়। তবেই অদ্বৈতসিংহ হিসাবে আমার বড়াই।' পরিষ্কার কথা। আগে চাই জীবের উদ্ধার। তার জন্য চাই দ্বাপরের কৃষ্ণের মতো একজন মহা শক্তিমান ব্যক্তি। নিমাইয়ের জন্মের আগেই, নবদ্বীপে এ রকম একটা প্রস্তাবনা চলছিল, আর তার নেতৃত্ব করছিলেন আচার্য অদ্বৈত।

শুধুই কি তিনি ? আর একজনও সেই প্রার্থনা করছিলেন। ইতিহাসও কি আশ্চর্য বিপরীতের মায়ায় ভরা। কারণ এই দ্বিতীয় ব্যক্তি একজন যবন, নাম তাঁর হরিদাস। দেখছি, যবন হয়েও তিনি কৃষ্ণকেই ডাকছেন, সর্বদা কৃষ্ণনাম করছেন। শান্তিপুর-ফুলিয়ায় তিনি গঙ্গাস্নান করেন, আর কেবল কৃষ্ণনাম করেন। 'মুলুক-পতি'র কানে খবর গেল। এ আবার কেমন কথা, মুসলমান হয়ে হিন্দু দেবতার নাম সংকীর্তন করে ? 'মুলুক-পতি' ডেকে হরিদাসকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। অবশ্য মনে একটা প্রশ্ন জাগে। মুসলমানের নাম 'হরিদাস' কেন ? সম্ভবত নতুন মুসলমান আমলে, যারা ধর্মান্তরিত হয়েছিল। তখনও তারা তাদের পূর্ব হিন্দু নাম পাকাপাকি ভাবে বদলে উঠতে পারেননি। আজকাল তো অবশ্য আধুনিকতা সবই এলোমেলো করে দিয়েছে। নাম শুনলে হিন্দু মুসলমান বোঝার উপায় থাকে না।

একেবারেই কি থাকে না ? বাংলাদেশের মুসলমানদের মধ্যে যদিও নামের অভিনবত্ব নিয়ে খুবই আধুনিকতা করতে দেখা যায়, তবু ধর্মীয় ব্যাপারে, নামের ক্ষেত্রে আধুনিকতা বজায় রাখা সম্ভব হয়নি। কোনো ছেলেমেয়েরই কখনো হিন্দু দেবদেবীর নাম রাখে না। হিন্দুরাও অবশ্য রাখে না। কিন্তু 'যবন' অথচ 'হরিদাস' এটা খুবই বিস্ময়কর। তার ওপরে মুসলমান হয়ে যদি গঙ্গাস্নান করে, আর কৃষ্ণনাম জপে, তাহলে মুলুকপতির পক্ষে ক্রুদ্ধ হবারই কথা। তিনি হরিদাসকে অনেক বোঝানো সত্ত্বেও, হেসে বললেন, 'শুন বাপ ! সবারই একই ঈশ্বর।'...

এ কথা শুনে মুলুকপতির পক্ষে নিরস্ত হওয়া সম্ভব নয়। কৃষ্ণ আর আল্লা কখনো এক হতে পারে না। তিনি কাজীর বিচারের শাস্তির ভয় দেখালেন। তাতেও হরিদাস বললেন, 'যা করেন, কৃষ্ণই করাবেন, আমি কে ? যদি অপরাধ কিছু করে থাকি, তবে তিনিই শাস্তি দেবেন।'

মুলুকপতি রেগে বললেন, 'ব্যাটাকে বাইশবাজারে নিয়ে গিয়ে চাবুক মার।

যত ক্ষণ প্রাণ না যায়, ততক্ষণ মার।'

হরিদাসের সেই মতোই শাস্তি হল। বাইশবাজারে নিয়ে গিয়ে চাবুক মারতে মারতে প্রাণ নেওয়া হল। মৃত জ্ঞান করে ফেলে দেওয়া হল গঙ্গায়। কিন্তু হরিদাস মারা গেলেন না। আবার বেঁচে উঠলেন। হরিদাসের যোগবলের কথা এখানে বলা হয়েছে। আসলে কাজী হরিদাসকে কবর দিতে চায়নি, তাহলে তিনি তরে যেতেন। সেইজন্যই গঙ্গার জলে ফেলে দেওয়ার হুকুম হয়েছিল। তবু যখন তিনি বেঁচে উঠলেন তখন স্বয়ং মুলুকপতি তাঁর কাছে এসে ক্ষমা চাইলেন।

হরিদাসের এসব বৃত্তান্ত আমার আখ্যানে তেমন মূল্যবান নয়। অর্থাৎ একান্ত আবশ্যিক নয়। তাঁর কথা বলবার উদ্দেশ্য হল, নিমাইয়ের জন্মের আগে, আচার্য অদ্বৈত আর হরিদাস কৃষ্ণকে ডাকছিলেন। অদ্বৈতর সঙ্গে হরিদাসের সখ্যতাও ঐতিহাসিক ঘটনা। হরিদাসকে অদ্বৈতর সখা না বলে অনুগত বলাই সঙ্গত। তা হলে দেখা যাচ্ছে নিমাইয়ের জন্মের আগেই একটি আন্দোলন ধীরে ধীরে দানা বেঁধে উঠছিল।

'আন্দোলন' কথাটাতে হয়তো কেউ কেউ আপত্তি তুলতে পারেন। কিন্তু আচার্য অদ্বৈত, হরিদাস কী উদ্দেশ্যে, দুজনেই কৃষ্ণকে অবতীর্ণ করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছেন? কেবল কি অবতারের রূপ দেখবার জন্য? বোধ হয় না। অদ্বৈত তাঁর মনের কথা গোপন করেননি। তিনি স্পষ্ট বলেছেন, 'আচণ্ডাল আদি যত হইব নিস্তার।' এ বড় সহজ কথা নয়! একজন ব্রাহ্মণ বলছেন, 'আচণ্ডাল উদ্ধারে'র আশাতেই কৃষ্ণের অবতারকে প্রার্থনা করছেন।

চৈতন্য-মঙ্গলের কবি (অবশ্য মনে রাখা দরকার, বৃন্দাবনদাস ঠাকুরও তাঁর কাব্যের নাম রেখেছিলেন শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঙ্গল। পরবর্তী কালে, সম্ভবত কবি লোচনদাস বৃন্দাবনদাসের কাব্যের 'মঙ্গল'কে 'ভাগবত' বলে উল্লেখ করেছেন। অথবা অন্যান্য ভক্তরাই বৃন্দাবনদাসের কাব্যকে 'ভাগবত' নাম দিয়েছিলেন।) জয়ানন্দ স্মার্ত রঘুনন্দনের বংশধর। রঘুনন্দন তাঁর অষ্টবিংশতি তত্ত্বে, ব্রাহ্মণ-শূদ্রের অস্পৃশ্যতার ভেদাভেদটা এমনই প্রকট করেছিলেন, উভয় শ্রেণীর মিলনের কোন সূত্রই রাখেননি। এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে আন্দোলনের এক নাম 'আচণ্ডাল-উদ্ধার'। জয়ানন্দ তাঁর চৈতন্যমঙ্গলে লিখেই গেছেন, খুড়া জ্যাঠা পার্বতী, চৈতন্যে ভক্তি নেই। তাঁর কথা থেকে মনে হয়, নিমাই যখন শ্রীচৈতন্য হয়েছেন, তিনি সেই সময়েরই লোক।

তা হলে আচার্য অদ্বৈতর অবতারতত্ত্ব নিতান্ত ব্যক্তি-ধর্মের অলস বাসনা নয়। তাঁর লক্ষ দেশ কাল সমাজের উপর। সেইজন্যই আমি আন্দোলন

কথাটি বলেছি, আর আন্দোলনকে রূপ দেবার জন্য প্রস্তুতিপর্বের প্রাথমিক দিকটি কী রকম ? ইতিহাস করুণ সাক্ষী দিচ্ছে. দেশে ক্ষত্রিয়কুল বলতে কিছু নেই। অত্যাচারী রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ কে করবে ? কেবল মাত্র স্মার্ত রঘুনন্দনের তত্ত্ব নয়, প্রতি মুহূর্তে রাজভয়ে, হিন্দু প্রজারা ভীত সন্ত্রস্ত। তা ছাড়া. অদ্বৈত নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন, মুসলমানদের মধ্যে একতা গভীর। হিন্দুদের মধ্যে নেই। না থাকার কারণও অবিদিত নেই। হিন্দুরা নিজেদের পায়ে নিজেরা কুড়াল মেরেছে, নিজেদের বর্ণ ভাগাভাগি করে, নিজেরাই দুর্বল হয়েছে। অতএব তেত্রিশ কোটি দেবতা নয়, এক ধর্ম, এক ঈশ্বর চাই। তার জন্য চক্রধারী কৃষ্ণের মতো পরম শক্তিশালী একজন অবতার।

কে হবেন সেই অবতার ?

এইখানে এসে, নবদ্বীপের পরিস্থিতিটা আবার একবার ফিরে দেখা দরকার। লক্ষ্য করে দেখছি নিমাইয়ের জন্মের আগে, যে বৈষ্ণব আবেষ্টনটি লক্ষ্য করা গিয়েছিল, এঁরা নবদ্বীপের লোক নন, সকলেই বাইরে থেকে এসে এখানে জড়ো হয়েছেন। আচার্য অদ্বৈতকে আমি দেখছি বটে শান্তিপুরের অধিবাসী, আসলে এই নেতা ছিলেন শ্রীহট্টের অধিবাসী। শ্রীহট্ট থেকে শান্তিপুরে এসেছেন। শ্রীহট্টের এক গ্রামের নাম জয়পুর। তার পূর্বে সরস্বতী নদী, উত্তরে গোমতী। পশ্চিমে ঢোল সমুদ্র, দক্ষিণে করাতি। এই জয়পুরের ব্রাহ্মণ বংশে জগন্নাথ মিশ্রের জন্ম। তিনিও শ্রীহট্ট থেকে এসেছিলেন। কোন ঐতিহাসিক বলছেন, দুর্ভিক্ষ আর দুর্ভিক্ষের তাড়নায়, জগন্নাথ মিশ্র আর নীলাম্বর চক্রবর্তী নবদ্বীপে এসেছিলেন। এখানে এসে নীলাম্বর চক্রবর্তীর কন্যা শচীদেবীকে জগন্নাথ মিশ্র বিয়ে করেছিলেন। দুর্ভিক্ষ মহামারীর কথা বা জগন্নাথ মিশ্র নবদ্বীপে এসে শচীদেবীকে বিয়ে করেছিলেন, এ সবের ঐতিহাসিক ভিত্তি কতটা খাঁটি, তা বিচারের অবকাশ আছে।

কবি জয়ানন্দ বলছেন, জগন্নাথ মিশ্র, নীলাম্বর চক্রবর্তীর কন্যাকে শ্রীহট্টেই বিয়ে করেছিলেন। জয়ানন্দ নামটি স্বয়ং নিমাইয়ের দেওয়া। এতে মনে হয়, তিনি মিশ্র পরিবারের বিষয়ে অনেক কিছু জানবার সুযোগ পেয়েছিলেন। অতএব তাঁর কথার ওপরে আমরা বেশী নির্ভর করতে পারি। যদিও তাঁর খুড়া জ্যাঠা চৈতন্যবিরোধী ছিলেন। কিন্তু তাঁর পূর্বপুরুষ স্মার্ত রঘুনন্দন ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্তী দেশের লোক, বর্ধমানের আমাইপুরে এসে আস্তানা নিয়েছিলেন। ঐতিহাসিক অনুমান করছেন, সম্ভবত তিনি ময়মনসিংহ থেকে এসেছিলেন। তা হলে জানা যাচ্ছে, জয়ানন্দও শ্রীহট্টের খুব দূরের লোক নন।

জয়ানন্দ আর একটি তথ্য দিয়েছেন, চৈতন্যদেবের পূর্বপুরুষরা উড়িষ্যার যাজপুরে বাস করতেন। রাজা ভ্রমরের ভয়ে তাঁরা যাজপুর ছেড়ে শ্রীহট্টে পালিয়ে গেছলেন। 'ভ্রমর' উপাধি ছিল, রাজার আসল নাম কপিলেন্দ্রদেব। এঁর অবশ্য একটা গুণও ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইনি উড়িষ্যাকে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য বলে ঘোষণা করেছিলেন।

তা হলে দেখা যাচ্ছে, আচার্য অদ্বৈত, নিমাইয়ের লীলার কেন্দ্র শ্রীবাস, স্বয়ং নিমাইও শ্রীহট্টেরই অধিবাসী। কিন্তু বাস্তবিকই কি তাই? এঁরা কি আদি শ্রীহট্টবাসী? না, উড়িষ্যাবাসী? ইতিহাসের সর্পিল পথে সেই সত্যের দেখা নিশ্চয়ই পাবো। আপাততঃ শ্রীহট্টের অধিবাসী বলেই চলতে থাকুক। জন্ম যদিও নিমাইয়ের নবদ্বীপে। তাঁর দাদামশাই নীলাম্বর চক্রবর্তীও শ্রীহট্ট-বাসী। এঁরা ছাড়াও, শ্রীরাম পণ্ডিত, বৈদ্য মুরারি গুপ্ত, শ্রীহট্টের অধিবাসী, নবদ্বীপে এসেছিলেন। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি এসেছেন চট্টগ্রাম থেকে। গঙ্গাতীর থাকতে, এইসব বৈষ্ণব অবতাররা অশৌচ্য দেশে জন্মেছিলেন কেন? কারণ, শৌচ্য কূলে শৌচ্য দেশে জন্মালেও, নিমাই গঙ্গাতীরে জন্মে যে ভবিষ্যতে সব বৈষ্ণবকে ত্রাণ করবেন! এটি ভক্ত কবির বক্তব্য। ইতিহাস কী বলছে সেটা আলাদা কথা।

আমি তো আগেই বলেছি, একটি বৈপ্লবিক আন্দোলন নবদ্বীপকে ঘিরে যেন আস্তে আস্তে দানা বেঁধে উঠছিল। অবশ্য এক্ষেত্রে একটি কথা আছে। কেবল যে বৈষ্ণব ব্রাহ্মণরাই বাইরে থেকে এসে নবদ্বীপে ভিড করছিলেন, এমন নয়। যেমন ধরা যাক নব্যন্যায়-উদ্ভাবনকারী রঘুনাথ শিরোমণির পিতা, পিতামহও শ্রীহট্ট থেকে নবদ্বীপে এসেছিলেন। তা হলে তন্ত্রসার-প্রণেতা কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশকে বাদ দিলে, ষোড়শ শতাব্দীর নবদ্বীপে বাঙালী সভ্যতার তিনটি বিশেষ বিভাগ, নব্যন্যায়, নব্যস্মৃতি, বৈষ্ণবধর্ম, তিনটিই বাঙাল ব্রাহ্মণদের মনীষার দ্বারা ঘটেছে। এ কালের বাঙালী সভ্যতার নব কলেবর গড়ে উঠেছিল নবদ্বীপে, কিন্তু এই নব কলেবর গড়ে তুলেছেন নবদ্বীপের বাইরে থেকে আসা বাঙাল দেশের লোক। অন্তত ইতিহাস তাই বলছে।

তা হলে বাঙাল ছাড়া, বৈষ্ণব শিরোমণিদের মধ্যে যাঁরা বিশিষ্ট, নিমাইয়ের সময়ে বা তাঁর জন্মের আগে, হরিদাসকে ফুলিয়ায় দেখেছি। শান্তিপুর থেকে বেশী দূরে নয়। রাঢ়ের একচাকা গ্রামে জন্মেছিলেন নিত্যানন্দ। ত্রিহুতে পরমানন্দপুরী।

ইতিহাসের অগ্রিম পত্রে দেখেছি, অন্যান্য ব্রাহ্মণদের তুলনায় বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ-

গণের উপরেই যেন যবনরাজের দৌরাত্ম্যটা বেশী ছিল। কারণ কী? না, তাঁরা উচ্চস্বরে নাম গান করেন। এটাই কি একমাত্র দোষ? তা হলে সার্বভৌম নবদ্বীপ ছেড়ে উড়িষ্যায় পালিয়েছিলেন কেন? তিনি তো তখন বৈষ্ণব ছিলেন না। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, ব্রাহ্মণদের মধ্যে বৈষ্ণব আর অবৈষ্ণবে বেশ একটা বিরোধ ছিল। সেই জন্যই অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণেরা পাষণ্ডী আখ্যা পেয়েছে।

ব্রাহ্মণদের নিজেদের মধ্যে কাজিয়া থাকতে পারে। কিন্তু ইতিহাস আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে, রাজার অত্যাচার সব ব্রাহ্মণদের উপরেই সমান। কারণ, গৌড়ের বাদশা আর তাঁর 'মুলুকপতি' মুসলমান 'অমাত্যগণ' ব্রাহ্মণদের সন্দেহের চোখে দেখছেন। বিশেষ করে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদের। তাঁদের বিদ্যা-বুদ্ধিকে সহজে এড়িযে যাওয়া চলে না।

আসলে, এ ক্ষেত্রে ইতিহাসের পটভূমিকায যাঁরা বৈপ্লবিক ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা সকলেই বৈষ্ণব। তাঁরা কেবল পাণ্ডিত্য অধ্যাপনা বিদ্যাচর্চা নিয়েই মগ্ন ছিলেন না। তাঁরা এবং তাঁদের নেতা 'আচণ্ডাল উদ্ধার'-এর পরিকল্পনা করছিলেন।

ছয়



নিমাইয়ের জন্মের সাল তারিখটা আমি আগেই দেখে নিয়েছি। নিমাইয়ের জন্মের পরে প্রথম তাঁর দাদামশাই নীলাম্বর চক্রবর্তী দৌহিত্রকে দেখতে এলেন। দেখতে এসে জন্মের লগ্ন দেখে তিনি বিস্মিত হলেন। তিনি দেখলেন, শিশুর লগ্নে সবই মহারাজ লক্ষণ। তাব উপরে আবার, চারদিকে একটা প্রচার আছে, গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হবে। নীলাম্বর বললেন, এই সেই রাজা কি না, তা পরে জানা যাবে। আর এক ব্রাহ্মণ বললেন, বিষ্ণু-দ্রোহী যে যবন, তারাও এই শিশুর চরণ-ভজন করবে।

কেন? কয়েকটি 'কেন' আছে। কারা সেই গুজব রটিযেছিল, 'ব্রাহ্মণ গৌড়ের রাজা হবে।' ঠিক কারা সেই গুজব রটিয়েছিল, সে সম্পর্কে ইতিহাস বিশেষ পরিচ্ছন্ন নয়। তবে গুজবটি যারাই রটাক, নিঃসন্দেহে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। মিথ্যা রটিয়ে থাকলেও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। বৈষ্ণবরাও যদি মুক্তির আশা-আকাঙ্ক্ষায় রটিয়ে থাকেন, সেটাও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। আশা-আকাঙ্ক্ষাটা যে খুবই স্বাভাবিক, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। যবনরাজের অত্যাচারের

মাত্রাটা ঐতিহাসিক সত্য ও বাস্তব। যদি দেখা যেত, একমাত্র হিন্দুরাই যবন-রাজার অত্যাচারের কথা বলেছেন, তা হলে একদেশদর্শিতার দোষ দেওয়া যেত। কোন কোন সুলতান যে হিন্দুদের প্রতি তীব্র বিরুদ্ধ মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন, তা মুসলমান ঐতিহাসিকরাও ক্ষেত্রবিশেষে বলতে বাধ্য হয়েছেন। পাশ্চাত্যের দু-চারজন পর্যটকের কথায়ও তা জানা যায়।

নিমাইয়ের জন্মের সময় ফতেহ্ শাহ সুলতান। তাঁর আগে দুজন সুলতান বিশেষ ভাবে হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন। ফতেহ্ শাহ তা থেকে নিজেকে একেবারে মুক্ত করতে পারেননি। নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদের অভিযোগ যে ভিত্তিহীন নয়, তাঁর আরও প্রমাণ বিজয়গুপ্তের মনসা-মঙ্গল। তাঁর হাসন-হোসেন পালার মধ্যে সেই অত্যাচারের ছবি খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তা হ'লেই, গৌড়ে হিন্দু রাজা হবে বা হোক, এই আশা-আকাঙ্ক্ষা থাকা, হিন্দুদের মনে জাগাটা খুবই স্বাভাবিক।

কেবল তো যবনরাজের অত্যাচারই নয়। আমি এ যুগের চোখ ও মন দিয়ে দেখছি, অত্যাচারী শাসকদের ভয়ে একবার যদি জনসাধারণের শিরদাঁড়া ভাঙতে আরম্ভ করে, তার ফল কি ভয়াবহ হতে পারে। সমাজের পতনের লক্ষণগুলো তখন অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তখন কেবল 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা।' তার জন্য যতদূর নীচে নামতে হয়, মানুষ তাই নামে, আর শাসক-গোষ্ঠীর চ্যালাচামুণ্ডারা সকলের মাথায় পা দিয়ে চলে। নিজেদের গোষ্ঠীকে ছাড়া, বাকিদের তারা মানুষ বলে গণ্য করে না। মানুষও তাঁদেরই চাটুকারিতা করে ধন্য হয়, প্রসাদ পায়। পতিত মানুষেরা তখন অনাচারের পঙ্কে ডুবে যায়।

ইতিহাসের একটি শিক্ষা, যুগে যুগে মানুষের মূল্যবোধের রূপ বদলায়। বর্তমানের মূল্যবোধ নিশ্চয়ই পাঁচশো বছর আগের মূল্যবোধকে আঁকড়ে নেই। নিমাই জন্মের আগে এবং পরেও, সমাজের অনাচারের ছবিটা হিন্দুদের পক্ষে মোটেই গৌরব করার মতো নয়। একশ্রেণীর হিন্দুর নানা অনাচারের চিত্র আমি আগেই লক্ষ্য করেছি। পূজার নামে বলি, মাংস, মদ, নাচগান, বিয়ে বা অন্যান্য উৎসবে মাত্রাতিরিক্ত খরচ আর বিলাস-প্রমোদে মেতে থাকা, একটি চিত্র। এদের নিয়ে শাসকদের কোন ভয় বা চিন্তা নেই। ওই সব নিয়ে লোকে যত মেতে থাকে, শাসকদের ততই সুবিধা।

হিন্দু সামাজিক অনাচারের আর একটি চিত্রও মর্মান্তিক। বিবাহিতা স্ত্রীরা স্বামীর কথা মানছে না। যা খুশি তাই করে বেড়াচ্ছে। এমন কি বিধবা যুবতীরা মাছ মাংস খাচ্ছে। তার মধ্যেই, 'বৃক্ষ লতা ফল হরে রাজা ম্লেচ্ছ-জাতি।' এর একটাই অর্থ, সবই রাজা আর রাজার দলেরা হরণ করছে। সে

এ সব প্রজা-পালনে অসমর্থ, বরং অনাচারকেই প্রশ্রয় দেয়। বধূরা স্বামীর কথা শোনে না, যুবতী বিধবারা মহানন্দে মাছ মাংস খাচ্ছে। এ যুগে স্বয়ং রাজার প্রশ্রয় না থাকলে, সমাজে এমন ভয়াবহ ব্যাপার সম্ভব নয়। তৎকালে প্রচলিত সতীদাহের সময়েও বিধবা যুবতীর যদি মাছ মাংস প্রিয় হয়, তাদের পিছনে রাজশক্তিধর চ্যালা-চামুণ্ডারা নিশ্চয়ই আছে। ওদিকে ব্রাহ্মণ মাত্রেই ম্লেচ্ছ-জাতির শত্রু। ক্ষত্রিয়রা নেই। যারা আছে, তারাও শক্তিহীন।

তা হলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াচ্ছে? অবক্ষয়ের চূড়ান্ত। একেই বলা যায়, ধর্মের পরাভব। অধর্মের প্রবলতা। তা হলে এমন কিছু করা দরকার, 'আচণ্ডাল আদি যত হইব নিস্তার।' আর এই নিস্তার করতে হলে, একটা ব্যাপক আন্দোলনের দরকার, তার জন্য চাই একজন 'অবতার'। অর্থাৎ সব দিক থেকে পারঙ্গম একজন নেতা।

নিমাইয়ের জন্মের সময়ে, অনেকে বলেছেন, দৈবে যুগধর্মের কাল এসে উপস্থিত হল। অতএব, যিনি নেতৃত্ব দিতে আসছেন, তিনি পূর্ণ ভগবান হলেও, এবং যুগধর্ম প্রবর্তন তাঁর কাজ না হলেও, দৈবে এককালে যোগাযোগ কারণে, দুই উদ্দেশ্য সাধন নিমিত্তই তিনি শুধুই অবতার হবেন না, হবেন যুগাবতার। যুগাবতারের উদ্দেশ্য কেবল আচণ্ডাল উদ্ধার হতে পারে না। তিনি যবনকেও উদ্ধার করবেন।

ইতিহাসের জটিল গতি কোন্ দিকে? থিসিসটা ক্রমাগতই যেন গুণগত পরিবর্তনের রূপ নিচ্ছে। কেবল আচণ্ডাল নয়, যবনের উদ্ধারও তাঁর কাজ! যবন রাজত্বে বসে এমন চিন্তা করা অতি দুঃসাহসের কাজ কোন সন্দেহ নেই। এই অবস্থায় বৈষ্ণবরা কৃষ্ণের অবতারকে আহ্বান করছেন। কে সে কৃষ্ণের অবতার?

নিমাই কি জন্মমাত্রই অবতার রূপ নিয়ে জন্মালেন? পরবর্তী কালের চৈতন্য-জীবনীকার কবিরা অবশ্য নিমাইয়ের অতীত সম্পর্কে অনেক গুণগান করেছেন, কারণ তিনিই আসলে কৃষ্ণ, অবতারিতে ও উদ্ধারিতে নবদ্বীপে জন্ম নেবার আগেই অনেক পরিকল্পনা করে আচার্য অদ্বৈত, হরিদাস, তাঁর এই সব পার্ষদদের আগেই ধরাধামে যাঁর যাঁর কর্তব্য পালনে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আর তাঁরা কেউ শ্রীহট্ট, কেউ চট্টগ্রাম ইত্যাদি পৌচ্য দেশ থেকে এসে নবদ্বীপে এবং তার আশেপাশে জড়ো হতে লাগলেন।

ভক্তদের এ সব কথা নিয়ে বিতর্কে যাব না। কারণ তাঁদের মধ্যেও দেখা গেছে, নানা রকমের মতদ্বৈধতা। কেউ বলেছেন, নিমাই চৈতন্যরূপে কৃষ্ণ।

কেউ বলেছেন, তিনি এক দেহে রাধা ও কৃষ্ণ। আবার কেউ বলেছেন, তিনি কেবলমাত্র রাধা। রাধা রূপেই তিনি সংসারে কৃষ্ণের ভজনা করেছেন। এমন কি তার দেহকে পর্যন্ত রাধা অঙ্গ বলে বিচার করেছেন। যেমন রামানন্দ যখন একবার ভাবাবেশে প্রভুকে স্পর্শ করতে উদ্যত হলেন, তখন তিনি বলে উঠলেন, 'তুমি আমাকে ছুঁয়ো না, কেননা আমার শরীর গৌরাঙ্গ নয়, রাধাঙ্গ। কৃষ্ণ ছাড়া এ অঙ্গ আর কেউ ছুঁতে পারেন না।'

অতএব, ভক্তদের এ সব যুক্তি-তর্কে জড়িয়ে পড়াটা আমার উচিত হবে না। আমি দেখতে চাই, নিমাই কি জন্মমাত্রই অবতার হলেন? আজ পর্যন্ত কোন অবতারই কি জন্মমাত্র অবতারত্ব লাভ করেছেন? কিন্তু নিমাইয়ের জন্মক্ষণেই কিছু কিছু লক্ষণ দেখা গেল। সে-কথা একটু আগেই জেনেছি। তাঁর দাদামশাই নীলাম্বর চক্রবর্তী বলছেন, 'লগ্নে মহারাজ লক্ষণ।' 'গৌড়ে ব্রাহ্মণের রাজা হবার কথা।' 'দেখা যাক এ ছেলেই সেই রাজা হবে কী না।' ...কিন্তু এসব তিনি বলেছেন কি না, বোঝা যাচ্ছে না। কেননা, তিনি বোধ হয় আদৌ রাজা হবার কথা বলেননি। বললেও সেই 'রাজা' ভিন্ন প্রকারের রাজা, শাসক রাজা নয়। যেমন, তিনি 'বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণ' 'মহাপুরুষের চিহ্ন' শিশুর অঙ্গে দেখে সবাইকে বললেন, 'ধ্বজ বজ্র শঙ্খ চক্র মীন' পায়ের তলে এ সব চিহ্নও দেখা গেল। দেখা যাচ্ছে, নীলাম্বর চক্রবর্তী 'রাজা' 'কৃষ্ণের অবতার' বললেন না। বললেন যা, তা সবই মহাপুরুষ লক্ষণ।

বৃন্দাবনদাস পরে লিখেছেন, 'কৃষ্ণচন্দ্র কেন অবতার হয়ে আসছেন, তার তত্ত্ব জানবার শক্তি কারুর নেই।' কথাটা কিন্তু এক দিক থেকে, আধুনিকদের কথারই প্রতিধ্বনির মতো শোনাচ্ছে। অবতার পুরুষের আবির্ভাবের কারণ কি সত্যি জানতে পারা যায়? যে সামাজিক পরিবেশে অবতার পুরুষের আবির্ভাব হয়, সেই পরিবেশই অবতারের আবির্ভাবের একমাত্র কারণ, এ কথা বলা রীতিমত দুঃসাহসের কাজ। তবে একটা সোজা কথা তো আছে। ধর্ম যেখানে পরাভব মানে, প্রবলতা সেখানে বাড়ে। আর তারই জন্য 'সাধুজন রক্ষা—দুষ্ট-বিনাশ কারণে' দল ও নেতার আবির্ভাব। নেতা এখানে নামান্তরে 'অবতার'।

কিন্তু নিমাইয়ের সতেরো বছর বয়সের আগে, আমি তো তাঁর অবতারত্বের মৌলিক পরিবর্তন কিছু দেখতে পাচ্ছি না; সতেরো বছর বয়সে যেইদিন তিনি শোকমগ্ন হয়েও, শুকনো চোখে মাথা হেঁট করে মাকে বললেন, 'সংসার অনিত্য মা...।'

আমি প্রথমেই বলেছিলাম, শ্রীচৈতন্যের অবতার রূপ দর্শন আমার

আপাততঃ লক্ষ না। নবদ্বীপে একটি অপরূপ পরিহাসপ্রিয় দুষ্টু বালক, যে ক্ষণে ক্রুদ্ধ ক্ষণে হাস্যময়, এবং রমণীমোহন, তাঁর জীবনলীলা দেখব।

সাত



নিমাইকে আমি জন্মাতে দেখলাম। শিশুটির নামকরণের ঘটনাও শুনলাম। তবে, যেহেতু আমি শিশুর জন্মক্ষণে নবদ্বীপে আসিনি, সেই কারণেই নামকরণের বিষয়টি আর একটু বিশদ হওয়া দরকার। নামের আগে কিছু স্ত্রী-আচার আছে, দেশবাসী মাত্রেই জানেন। যেমন একটি হল আটকৌড়ে। তারপরে পুরো এক মাস আঁতুড় ঘরে কাটিয়ে, আঁতুড় তোলা হল। শচীদেবী সুরাঙ্গনা—অর্থাৎ প্রতিবেশিনীদের সঙ্গে গঙ্গা-স্নানে গেলেন। শিশু রইল ধাত্রী নারায়ণীর কাছে।

চার মাসেরও কিছু দিন পরে, সকলে বিচার-বিবেচনা করে দেখলেন, এ শিশুর যেহেতু এমন সম্ভাবনা আছে, এ বিশ্বের দায়িত্ব ভার নেবে, সেই জন্যই তার নাম বিশ্বম্ভর রাখলেন। তাছাড়া আগেই বলেছি, এ শিশুর জন্ম সময়ে, দেশে সুসময় চলছিল। ধরেই নেওয়া হল, দুর্ভিক্ষ ঘুচল, কৃষকেরা পেল বৃষ্টি। আর প্রতিবেশিনীরা বললেন, 'এর আগে সাতটি কন্যার মৃত্যু হয়েছে।' কবির ভাষায় 'ইহান অনেক জ্যেষ্ঠ কন্যা পুত্র নাই। শেষ যে জন্মায় তার নাম সে নিমাঞ।'

কবির এই উক্তির মধ্যে একটু গোলমাল দেখা যাচ্ছে। বিশ্বরূপ দাদা তখনও বেঁচে রয়েছে। তার আগে শচীর কোন পুত্রসন্তান মারা যায়নি। মারা গেছল কন্যাসন্তান। সুরাঙ্গনাদের কথা পণ্ডিতরা ফেলতে পারলেন না। বললেন, 'পতিব্রতাদের কথাও থাক। শিশুর মা তার সন্তানকে নিমাঞ বলেই ডাকবেন।'

যাই হোক, আর নাম পর্ব নয়। এবার শিশুর লীলা পর্ব। নাম নিয়ে অনেক কথা হয়েছে। নিমাই ক্রমে বড় হতে লাগল, শুরু হল হামাগুড়ি দেবার পালা। ছ'মাস বয়সে অন্নপ্রাশন হল। অন্নপ্রাশনের সময় কোন মাতুলকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ এটাই নিয়ম। মাতুলের কোলে শিশু অন্নপ্রাশনের দিন বসবে। মাতুলের হাত থেকে অন্ন গ্রহণ করবে। জীবনীকার কবিদের বর্ণনায়ও অন্নপ্রাশনে মাতুলের উপস্থিতি দেখা যায়নি। নীলাম্বর চক্রবর্তীর কি শচী ছাড়া আর কোন সন্তান ছিল না? নিমাইয়ের মামা-মামীর সংবাদ কোথাও পাওয়া যায় না। যাক

এক জায়গায় 'মাতুল ঘর' কথাটি পাওয়া গেছে। তার মানে এই নয় যে, নিমাইয়ের মাতুল ছিল।

অন্নপ্রাশন উৎসবে ঘণ্টা শঙ্খ বাজল। ব্রাহ্মণরা গীতা বেদ পাঠ করলেন। শিশুর সামনে শুদ্ধ থালায়, ধান, পুঁথি, খড়ি, সোনা, রূপো সবই বেড়ে দেওয়া হল। এটি একটি লৌকিক আচার। অবোধ শিশু যেটি থালা থেকে তুলে নেবে, ভবিষ্যতে সেই দিকেই তার গতি হবে। নিমাই হাত বাড়িয়ে আগেই থালা থেকে পুঁথির মধ্যে ভাগবতটি তুলে নিয়ে নিজের গায়ে মুখে মাখামাখি করল। সবাই জয়-জয়কার দিয়ে উঠল। কেউ বলল, 'ছেলে বড় পণ্ডিত হবে।' কেউ বলল, 'পরম বৈষ্ণব হবে। নিশ্চয় শাস্ত্র বিষয়ে এছেলে বিশেষ পারঙ্গম হবে। তা নইলে এত সব থাকতে, ভাগবতটি কেন গায়ে টেনে নিল।'

কিন্তু নিমাইয়ের বাবা-মা কি খুব খুশি হলেন? জগন্নাথ মিশ্র শ্রীহট্ট থেকে মহামারী দুর্ভিক্ষের জন্য পালিয়ে এসেছিলেন কি না, এ বিষয়ে নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না বটে, তবে তাঁর সংসার মোটেই সচ্ছল নয়, এটা সবাই জানে। তা ছাড়া, তাদের বড় ছেলে বিশ্বরূপের মতিগতিও খুব সংসারী বলে মনে হয় না। সে যে সংসারের সচ্ছলতা নিয়ে আসবে, তার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। সব সময়েই পুঁথিপত্র নিয়ে থাকে। এমন কোন্ সংসারী পণ্ডিত আছেন, যিনি সচ্ছলতা চান না?

যাই হোক, তবু নিমাই ভাগবতটি টেনে তোলায়, তাঁদের মনে একটাই সান্ত্বনা, ছেলে হবে হয়তো মস্ত পণ্ডিত। নবদ্বীপের অনেক পণ্ডিতও রীতিমত সম্পন্ন, বহু দেশজয়ী পণ্ডিত। কিন্তু আসল কথা যেটি, তা হল জগন্নাথ মিশ্রের ঘর যেন একটি শিশুর রূপে আলোকিত হয়ে উঠল। দেখতে দেখতে কুন্দ-কলিকার মতো দুটি দাঁত উঠল। ঠোঁট দুটি যেন রাঙা তেলাকুচোর মতো। আর গোরা রূপের তো কথাই নেই। যে দেখে, সে-ই আর চোখ ফেরাতে পারে না। পাড়ার যত নারীবৃন্দ মিশ্রের বাঁড়ি এসে শিশু নিমাইকে কোলে নেবার জন্য ব্যাকুল।

অন্নপ্রাশনে ভাগবত তুলে নেওয়া যেমন একটি বিশেষ লক্ষণ, তেমন আর একদিন ঘটল এক ভয়ঙ্কর ঘটনা। নিমাই বাড়ির উঠোনে হামাগুড়ি দিয়ে খেলছে। শচী সব সময়েই টের পান, ছেলে কোথায় হামা দিয়ে বেড়াচ্ছে। কেন না, তার কটিতে কিঙ্কিণী বাজে ঠিন ঠিন। তবে ছেলে বড় দুরন্ত। কোন কিছু মানে না, যা দেখে, তাতেই হাত দেয়। আগুনকে আগুন বলে মানে না। বঁটিকে বঁটি বলে মানে না। কখন হাত পা পোড়ে কি কাটে, এই এক চিন্তা। কিন্তু একদিন শচী দেখলেন, নিমাই উঠোনে হামাগুড়ি দিয়ে খেলা করছে। হঠাৎ উঠোনে দেখা

গেল এক ভয়ঙ্কর বিষধর সাপ।

শচী একা ছিলেন না, আরও কয়েকজন প্রতিবেশিনী ছিলেন। তাঁরা যখন হায় হায় করছেন, নিমাই হামাগুড়ি দিয়ে থাবা দিয়ে সাপ ধরল। সর্বনাশ! 'আথে ব্যথে সভে দেখি হায় হায় করে।' স্বাভাবিক। জাত সাপ ধরে খেলা! বালক-লীলায় সবই সম্ভব। শ্বাপদ সরীসৃপের কথা কেউ বলতে পারে না। সবাই যখন ভয়ে কাঁটা, সাপ এবার ফণা তুলে নিমাইকে দংশন করবে, তখন অনায়াস স্পর্শে সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে মাথা নীচু করে রইল। এদিকে খবর পেয়ে জগন্নাথ মিশ্রও এলেন। সকলে কান্নাকাটি জুড়ে দিলেন।

কিন্তু সাপই যেন দেখল, বড় বিপাক! আশেপাশে লোকজন, হাঁকডাক, কান্না-কাটি, আর একজন তার গায়ের উপর গড়াগড়ি যায়। মানুষ সব কিছুরই একটা যুক্তি ব্যাখ্যা চায়। সেই হিসেবে বলা যায়, সাপ যে সব সময়েই দংশন করে, এমন নয়। সেও অনেক সময়ে নিজেকে অতর্কিতে আক্রান্ত হতে দেখলে পালাবার চেষ্টা করে। নিমাই তাকে মারতে যায়নি। বরং তাকে জড়িয়ে ধরেছে। আধুনিক মানব জাতি জানেন, পশুপক্ষীর বুদ্ধি বলে কিছু নেই, আছে 'প্রবৃত্তি'। জাত-সাপটি প্রবৃত্তিবশতই হয়তো, নিমাইয়ের অনায়াস স্পর্শে, বিপদের আশংকা করেনি। কুণ্ডলী পাকিয়ে মাথা নীচু করেছিল। তার কাছেও ঘটনাটি একটি খেলার মতো হতে পারে। তারপরে লোকজনের ভিড় দেখে তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল।

শিশু দেখল বিচিত্র খেলার সঙ্গীটি পালিয়ে যাচ্ছে। সে আবার তাকে ধরবার জন্ত হামাগুড়ি দিল। তার আগেই শচীদেবী পুত্রকে কোলে টেনে নিয়ে এলেন। এ রকম বিস্ময়কর ঘটনা দেখলে সকলেই স্তম্ভিত হয়। একটা অলৌকিক চিন্তা মনে আসে। কারণ জাতসাপ পর্যন্ত এ শিশুকে কাটল না!

ভক্তের চোখে এটি একটি লীলাখেলাই মনে হল। সব শিশু তো এমন পারে না! কিন্তু জ্ঞান বলে, অবোধ শিশুরও যষ্ঠেন্দ্রিয় বলে একটা ব্যাপার আছে। যত অবোধই হোক, সে সব কিছুতে হাত দিতে যায় না। জাতসাপ এমন জীব শিশুরাও থমকে যায়। নিমাই তাকে অনায়াসেই হাত দিয়ে চেপে ধরল। সবাই বলল, 'শিশুর পুনর্জন্ম হল।' কেউ বলে, 'গরুড় গরুড়!' কেউ স্বস্তিবাণী উচ্চারণ করল।

আসলে, এ সব থেকে এটাই প্রমাণ হচ্ছে, নিমাই শিশু বয়স থেকেই দুরন্ত। ভয়ডর বলে তার মনে কোন বস্তু নেই। কিন্তু ব্যাপার-স্যাপার দেখে জগন্নাথ মিশ্র আর শচীদেবীর মনে শান্তি নেই। মানতেই হবে, একে তো বুড়ো বয়সের ছেলে।

তার আগে অনেকগুলো সন্তান মারা গেছে। তার মধ্যে এ সব ঘটনা ঘটতে দেখলে ভয় পাওয়া স্বাভাবিক।

কিন্তু ভয় পেয়েই বা লাভ কি? নিমাই আস্তে আস্তে বড় হতে লাগল। প্রথম প্রথম বাড়ির উঠোনেই থেই থেই হেঁটে বেড়ায়। আছাড় খায়, আবার ওঠে, হাঁটে। শচী হাততালি দিয়ে ছেলেকে ডেকে ডেকে হাঁটতে শেখান। নিমাই হাঁটতে হাঁটতে আছাড় খায়, আবার ওঠে। এইভাবে, ক্রমে সে হাঁটতে শিখল। কিন্তু হাততালি তার বড় পছন্দ। হাততালি দিলেই সে নাচতে আরম্ভ করে। আর অপরূপ সুন্দর শিশুটির নাচ দেখবার জন্ত প্রতিবেশিনীরাও এসে হাততালি দেয়। বৈষ্ণব পরিবার বলেই, সবাই হাততালি দেবার সময় 'হরি হরি' বলে। নিমাইও ভাবল, 'হরি' বলে হাততালি দিলেই নাচতে হয়।

তা না হয় নাচুক, কিন্তু দিগম্বর থাকতে বড় ভালোবাসে। সাজগোজের ধার ধারে না। ধুলায় গড়াগড়ি খাচ্ছে, হাসছে, নাচছে। কিন্তু কেউ যদি ভেবে থাকে, নিমাই কৃষ্ণ নামে তদ্গত তা হলে ভুল হবে। ও সব বালাই তার নেই। ইতিমধ্যে পাড়ায় সমবয়সী অনেক বন্ধু জুটেছে। তাদের সঙ্গে সে এখন বাড়ির বাইরে যেতে আরম্ভ করেছে।

নিমাইয়ের দুরন্তপনার কাহিনী বলবার আগে, দু-একটি ঘটনা লক্ষ করা দরকার। শিশু বয়সে তার কটিতে কিঙ্কিণী ছিল, সেটা দেখা গেছে। কিন্তু সে যখন হেঁটে বেড়ায়, তখন তার পায়ে নূপুর ছিল না। একদিন মিশ্র ছেলেকে ডেকে বললেন, 'বাবা বিশ্বম্ভর, ঘর থেকে আমার বই এনে দাও।'

নিমাই বাবার কথা শুনে ঘরের মধ্যে গেল। তখন ঘরের মধ্যে শোনা গেল রুনুঝুনু নুপুরের ধ্বনি। মিশ্র ভাবেন, নুপুরের ধ্বনি কোথা থেকে ভেসে আসছে? শচীও স্বামীর সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, 'নুপুরের শব্দ কোথায় বাজে? ঘরের মধ্যে? কিন্তু আমার ছেলের পায়ে তো নুপুর নেই, এমন মধুর নুপুর বাজে কোথায়?'

নিমাই ঘর থেকে বেরিয়ে বাবাকে বই দিয়ে বাড়ির বাইরে খেলতে চলে গেল। কর্তা গিন্নি দুজনে ঘরের মধ্যে ঢুকলেন। এসে দেখলেন, ঘরের মেঝের সবখানে ধ্বজ বজ্র পতাকা অঙ্কুশের চিহ্ন ছড়িয়ে আছে। দুজনের গায়ের মধ্যে যেন একটা শিহরণ খেলে গেল! তার সঙ্গে একটা অলৌকিক আশঙ্কাও! নিমাইয়ের পায়ে কি এই চিহ্নিত ছাপ পড়েছে? কেন? ছেলে কি তবে আমাদের অন্ত কেউ? মা বাবার প্রাণ, তাঁরা মানব-শিশুকেই চান। তাঁরা চান নিজেদের ছেলেকে। অলৌকিকতা কিছু চান না। কারণ, একটিই ভয়। সন্তান যেন ঘর না ছাড়ে।

আমি আগেই শিশুর পায়ে 'শঙ্খ চক্র ধ্বজ বজ্র মীন' চিহ্ন দেখেছি। যে কারণে নীলাম্বর চক্রবর্তী নাতির সম্পর্কে বলেছিলেন, কালে এই ছেলে মহাপুরুষ হবে। তিনি জ্যোতিষ গণনাদি জানতেন। সেই হিসাবে তাঁর ভবিষ্যৎবাণী আক্ষরিক অর্থেই মিলে গিয়েছিল।

কিন্তু সে তো পরের কথা। নিমাইয়ের দাদা বিশ্বরূপ সম্পর্কে ইতিহাসও যেন তেমন সোচ্চার নয়। এ কথাটা আমার স্বাভাবিক ভাবেই মনে উদয় হয়েছে। তাঁর উপস্থিতি কেমন যেন অস্পষ্ট, আবছায়ার মতো মনে হয়। অথচ নিমাই নিজে কিন্তু অগ্রজকে মান্য করত। আর কাউকেই বড় একটা করত না। যে আচার্য অদ্বৈত কৃষ্ণ অবতারের জন্য সর্বদাই অপেক্ষা করছেন, তিনি কিন্তু বালক নিমাইকে দেখে আদৌ কিছু ভাবছেন না। তাঁর চোখের সামনে দিয়েই নিমাই ঘোরাফেরা করে। যেমন, তিনি বিশ্বরূপের সঙ্গে গীতা ব্যাখ্যা নিয়ে বসতেন। শচী নিমাইকে বলতেন, 'দাদাকে খেতে ডেকে নিয়ে আয়।'

'উলঙ্গ সর্বঅঙ্গ ধূলায় ধূসর' নিমাই ছুটে অদ্বৈতর বাড়ি গিয়ে দাদাকে ডাকত, 'দাদা মা ডাকছে, খেতে এসো।'

বিশ্বরূপ যখন বাড়ি যেতেন, নিমাই দাদার কাপড়ের কোঁচা ধরে সঙ্গে সঙ্গে যায়। এই শিশু বালককে দেখে অদ্বৈত এই পর্যন্ত বলেছেন, 'চিত্ত বিত্ত হয়ে শিশু সুন্দর দেখিয়া।'...কিন্তু এ বালক একদা অবতার হবেন, এ কথা তিনি বা কেউ বলছেন না।

বলবেন কি করে? এমন দুর্জয় দুষ্ট ছেলে নবদ্বীপে কে কবে দেখেছে? প্রথম প্রথম, পাড়ায় যখন ঘুরে বেড়ায়, বালকের রূপ দেখে সবাই মুগ্ধ। সবাই ডাকে। সে সব বাড়িতে যায়। কখন যে কোন্ দিকে দৌড় দিয়ে পালাবে, কেউ বলতে পারে না। এর তার বাড়ি যায়। খই কলা সন্দেশ, যা দেখে, তাই হাত পেতে চায়। ছেলেটির ভুবনমোহন রূপ দেখে, কেউ না করতে পারে না. হাত ভরে তুলে দেয়। সব যে নিজেই খায়, তা নয়। সঙ্গীদের দেয়। আবার গরীব স্ত্রীলোকদেরও দিয়ে দেয়। কেন না, তারা হাততালি দিয়ে 'হরি' নামের গান করে। ওই হাততালি করে গান নিমাইয়ের বিশেষ প্রিয়। কেন? না, নাচের তাল আছে। তালে তালে নাচা যায়। তা বলে হরি নামে ভক্তি? আদৌ নেই।

লোকের বাড়ি চেয়ে-চিন্তে খাবার নেয়, সে এক রকম কথা। ক্রমেই নিমাই এমন দুর্বিনীত হয়ে উঠল, সকালে দুপুরে বিকালে, এমন কি রাত্রেও বাড়ির বাইরে বাইরে টহল দিয়ে বেড়াতে লাগল। সঙ্গে অবশ্য কিছু সাঙ্গ-পাঙ্গ আছে। তবে সে হল সকলের চালক। এখন আর চেয়ে চিন্তে নয়, রীতিমত চুরি করতে

আরম্ভ করল! চুরি মানে, আর কিছু নয়, খাবার। কারুর ঘরে ঢুকে দুধ খেয়ে নেয়। কারুর ঘরে ঢুকে ভাত খেয়ে উজাড় করে। আর খাবার যদি কিছু না পেল, হাঁড়িকুড়ি সব ভেঙে চুরমার করতে লাগল। কেবল তা নয়। কোন বাড়িতে শিশুকে ঘুমোতে দেখলে বা খেলা করতে দেখলে তাকে কাঁদায়। এ ভাবে প্রতিবেশীদের উপর নানান অত্যাচার চলে।

কিন্তু রেগে গেলেও, শ্রীমানের রূপ দেখে, কেউ কিছু বলে না। হাসে, প্রীতির চোখে দেখে। তা বলে, সব সময় তো এ সব চলে না। বিশেষ করে, নিজের সমবয়সী বালকদের ধরেও ঠ্যাঙায়। আবার তাদের বাড়ির দুধ খই কলাই চুরিও করে খায়। সব বালকেরা তো আর নিমাইয়ের রূপে মজেনি। তারা এসে শচীর কাছে নালিশ করে। শুনতে শুনতে শচী একদিন ছেলের ঘাড়ে ঝাঁকুনি দিয়ে সরোষে বললেন, 'কেন চুরি করিস, কেন ছেলেদের ধরে মারিস? কেন পরের ঘরে যাস? তোর জন্যে ঘরে কী নেই?'

আর যায় কোথায়! গোঁয়ার নিমাই ঘরের মধ্যে গিয়ে, হাতের সামনে থালা বাসন যা পেল, সব ভেঙেচুরে তছনছ করে, এক ছুটে বাড়ির বাইরে।

আসলে এ সব উপসর্গ উৎপাত শুরু হয়েছে, যখন থেকে নিমাই দাঁড়িয়ে হেঁটে বেড়াতে শিখেছে। নিমাই বাইরে বাইরে বেড়ায়। গঙ্গার ধারে গাছতলায় বন্ধুদের সঙ্গে খেলা করে। খেলা আর শেষ হয় না। ছেলের বাড়ি আসার নাম নেই। মা ডাকতে এলেই, দে ছুট। শচীদেবী ধর ধর বলে ছেলের পিছনে ছোটেন। ছুটলে কি হবে? উনি কি পারেন নিমাইয়ের সঙ্গে? তবু ছোটেন। ফল হয় উল্টো। মায়ের এই তাড়া করায় শ্রীমানের মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। ছুটে বাড়ি এসে, ঘরের মধ্যে ঢুকে, গোটা ঘর দরজা তছনছ করে দেয়। বড় উগ্র ছেলে। শচী বাধ্য হয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে, গালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখতে থাকেন। তখন মায়ের দিকে তাকিয়ে নিমাইয়েরও মাথা হেঁট। বুঝতে পারে, কাজটা ভালো করেনি।

কিন্তু কদিন? কতক্ষণ? নিমাই এতই দুরন্ত, সবাই বলল, ব্রাহ্মণ ডেকে যজ্ঞ স্বস্ত্যয়ন করা দরকার। নইলে এ ছেলেকে বাগ মানানো যাবে না। জগন্নাথ মিশ্র তাই করলেন। করলে কি হবে। সব বৃথা। নিমাই যেমন তেমনি আচরণ করতে লাগল। তখন শচী ভাবলেন, নিয়মিত গঙ্গাস্নান করলে, ছেলের এই দুরন্তপনা ঘুচবে। এইভাবে তিনি নিমাইকে বলে কয়ে গঙ্গাস্নান করাতে নিয়ে চললেন। কয়েক দিনের মধ্যেই তার ফল হল বিপরীত।

নিমাই রাস্তা দিয়ে খেলতে খেলতে, রাস্তার ধারে ফেলে রাখা গৃহস্থের যত

এঁটো নোংরা ভাঙা মালসা হাঁড়ি, সে সব হাতে তুলে ছোড়াছুঁড়ি শুরু করল। শচীদেবী একেই বায়ুগ্রস্ত। বয়সকালে সব স্ত্রীলোকদেরই প্রায় মনের এই রোগটি দেখা যায়। তিনি তো হায় হায় করে উঠলেন, 'করিস কি, করিস কি নিমাই, তোর কি কোন অশুচি বোধও নেই? ওই সব নোংরা তুই ঘাঁটাঘাঁটি করছিস?'

নিমাই বললে, 'কে বলল এ সব অশুচি? এ সব অশুচি নয়।'

শচী বললেন, 'তোর কি ঘেন্নাপিত্তি বলে কিছু নেই?'

নিমাইয়ের এক কথা, 'এ সব অশুচি নয়। ঘেন্নাপিত্তি দিয়ে কী হবে?'

শচীমা নিমাইয়ের সঙ্গে এটে উঠতে পারেন না। ছেলেকে গঙ্গাজলে স্নান করিয়ে নিজে স্নান করে শুচি হবার চেষ্টা করেন, আর মনে মনে প্রার্থনা করেন, 'হে বাসুদেব, ছেলেকে আমার সুমতি দাও।'

বাসুদেব এমন সুমতি দিলেন, শচীদেবীর মাথা ভিরমি খেয়ে গেল। একদিন গঙ্গাস্নানে যেতে যেতে, নিমাই এটোকাঁটা ভাঙা বাসনপত্রের যত আবর্জনার মধ্যে গিয়ে বসে পড়ল। তার মানেই, যত নিষিদ্ধ কাজে নিমাইয়ের ঝোঁক। শচী সহ্য করতে পারলেন না, রেগে উঠে বললেন, 'তোর লজ্জা ঘেন্না বলে কিছু নেই। এমন অশুচি জায়গায় যাওয়া দূরের কথা, তুই গিয়ে বসলি? আজ তোকে আমি পিটব।'

নিমাই উলটে মাকে বিতর্কে আহ্বান করল, 'কেন এ সব অশুচি, আমাকে বল। কে বলেছে তোমাকে অশুচি? কি শুচি আর কি অশুচি, আমাকে বুঝিয়ে বল, তবে আমি উঠব।'

শচী সে সব পাগলের কথা মনে করে, নিমাইকে বকেঝকে মারতেই উদ্যত হলেন। নিমাই এক কাণ্ড করে বসল। কাছেই পড়ে ছিল ইটের টুকরো। তাই তুলে ছুড়ে মারল মাকে। মা কপালে আঘাত পেয়ে রাস্তার উপরেই মূর্ছা গেলেন। নিমাই এবার কাঁপরে পড়ল। তাড়াতাড়ি মায়ের কাছে ছুটে এলো, দেখল, মা কপালে হাত দিয়ে ব্যথায় অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে। তখন মাকে জড়িয়ে ধরে, 'মা মা বলে কান্নাকাটি জুড়ে দিল, মা আমি আর ওরকম করব না, তুমি চোখ খুলে তাকাও।'...

অবস্থার গুরুত্ব বুঝলে নিমাই এ রকম কান্নাকাটি করে। আবার ভুলে যেতেও সময় লাগে না। নিমাইয়ের নিজের ইচ্ছে না হলে, আর গঙ্গাস্নানে যাবার নাম করে না। শচীমাতাও বেশী ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন না। কিন্তু একদিন গঙ্গা স্নান করে বাড়ি ফিরে দেখলেন, নিমাই কোথাকার একটা রাস্তার কুকুরের বাচ্চা নিয়ে এসে, কোলে বসিয়ে তাকে আদর করছে।

শচীর তো চক্ষুস্থির! মাথা চাপড়ে চিৎকার করলেন, 'ওরে সর্বনেশে, তুই করছিস কি? আমি যে তোর কিছুই বুঝি নে!'

শিশু বালকদের পশুর বাচ্চাদের ওপর একটু বিশেষ আকর্ষণ দেখা যায়। কিন্তু শচীদেবীর পক্ষে এ সব অত্যন্ত অনাচার। এ ঘটনার পর থেকে তিনি বাধ্য হয়েই নিমাইকে হাত পা বেঁধে রেখে গঙ্গাস্নান করতে যেতেন।' গেলে কি হবে, শুচি অশুচি ধর্মাধর্ম বোধ, গুরুজনকে ভক্তি করার তেমন লক্ষণ নিমাইয়ের আদৌ দেখা গেল না। সত্যি বলতে কি, নিমাইয়ের কাছে যেন পুরীষ চন্দনে ভেদাভেদ নেই, সে এমনই ময়লা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে।

একদিন নিমাই বন্ধুদের সঙ্গে বাড়ির কাছাকাছি রাস্তায় খেলা করছে। এমন সময় বৈদ্য মুরারি কয়েকজনের সঙ্গে রাস্তা দিয়ে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করতে করতে যাচ্ছিলেন। নিমাই মুরারি বৈদ্যকে দেখিয়ে দেখিয়ে, হাত নাক মুখ ঘুরিয়ে, তাঁকে অনুকরণ করে ভেংচাতে লাগল। বৈদ্য ভক্ত মানুষটি তো ক্ষেপেই অস্থির। মুখে যা এলো তাই বলে গালাগালি করলেন, 'অসভ্য মূর্খ, এই কি ব্রাহ্মণের ছেলের কাজ? অকাল-কুষ্মাণ্ড, পাজী ছেলে, বাপ মা কি দেখে না?'

বৈদ্য মুরারি জানতেন না, এই সব কুবচনের ফল কি হতে পারে। পরদিন তিনি নিশ্চিন্তে দুপুরে বাড়িতে খেতে বসেছেন। নিমাই তক্কে তক্কে ছিল। কোথা থেকে ছুটে এসে বৈদ্য মুরারির ভাতের থালায় ছর ছর করে পেচ্ছাব করে দিল। বৈদ্য কথা বলবেন কি, ভাবতেই পারেননি, কেউ এমন কর্ম করতে পারে! নিমাই ততক্ষণে কাজ সেরে বাড়ির বাইরে।

অভিযোগ? সে তো জগন্নাথ-শচীর কাছে রোজ দিনই আসছে, আর জগন্নাথ লাঠি নিয়ে নিমাইকে তাড়া করছেন। সে সব ব্যাপারে নিমাই বেশ চতুর ছেলে। বাবাকে লাঠি নিয়ে তেড়ে আসতে দেখলেই, মায়ের আঁচলের তলায় গিয়ে লুকায়। তখন আবার শচীর ছেলের জন্য মন কেমন করে। তাই বা কী করে বলি যে, নিমাই বাবাকে ভয় পায়? মিশ্র একদিন খেতে বসেছেন। নিমাইয়ের কি খেয়াল হল। বাবার পৈতা টেনে খুলে নিয়ে বাড়ি থেকে দৌড়, একেবারে নীলাম্বর চক্রবর্তীর বাড়ি। নিমাইয়ের মাতামহ আছেন। বাবার পৈতা কেড়ে ছিঁড়ে নিয়ে, মাতামহকে গিয়ে বলল, 'দাদামশাই, তোমাকে দেখতে না পেলে আমার ভালো লাগে না।'

গোরাচাঁদ দৌহিত্রের কথা শুনে মাতামহ খুশিতে গলে গেলেন। আদর করে ঘরে নিয়ে গেলেন। শ্রীমানের দুষ্টামির কথা কিছুই জানতে পারলেন না। পরে যখন জানতে পারলেন, তখন নিমাই আর মাতামহের ধারেকাছে নেই। কিন্তু

বাবার পৈতা কেড়ে নিয়ে পালানোটা যে খুবই গর্হিত কর্ম হয়েছে, চতুর বালক তা বেশ হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে। কি করে যেন তার মাথায় এলো, সে খাওয়াদাওয়া বন্ধ করল। কেন? না, আমার শরীর মন ভালো না।

নিমাইয়ের বয়সী ছেলেদের সঙ্গে, এখানেই তার তফাত, বুদ্ধিতে আর চাতুর্যে তার সঙ্গে কেউ পেরে ওঠে না। এই লক্ষণটিও আসলে নিমাই-চরিত্রেরই বৈশিষ্ট্য। নিমাইকে সব সময় শুয়ে থাকতে দেখে, সকলেই চিন্তিত হলেন। কী হয়েছে নিমাই? কী চাই তোমার? নিমাই বলল, 'মনে হচ্ছে আমি প্রাণে বাঁচব না, যদি না, জগদীশ আর হিরণ্য ঠাকুরের বাড়ির বিষ্ণুপূজার নৈবেদ্য প্রসাদ না খাওয়াও।'

সকলে ভেবে দেখলেন, তাই তো, আজ একাদশী। জগদীশ আর হিরণ্য দুই পরম বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ আজ বিষ্ণুপূজা করছেন। বিশ্বরূপ তখনো সন্ন্যাস নেয়নি। সবাই গিয়ে জগদীশ আর হিরণ্যকে নিমাইয়ের বাসনা জানাল। দুই পরম বৈষ্ণব মহাখুশি হয়ে পূজার নানা উপচার নৈবেদ্য পাঠিয়ে দিলেন। সকলের নৈবেদ্য থেকে নিমাই কিছু কিছু খেয়ে, সুস্থ হয়ে দিব্বি হেঁটে বেড়াতে লাগল। বোঝা গেল সে কেবল দুরন্ত নয়, অতিশয় চতুর।

আসলে অল্প বয়সেই নিমাইয়ের বুদ্ধিবৃত্তির প্রসারতা দেখা যাচ্ছে। সব কিছুতেই সে ব্যতিক্রম। আর দশটি ছেলের মতো সে নয়। তার প্রমাণ পাওয়া গেল হাতেখড়ির সময়। নিমাইয়ের সবে পাঁচ অতিক্রম করতে চলেছে। দুরন্তপনা এর মধ্যে কম করেনি। টুকটুকে গোরা ছেলেটি এর মধ্যে সাঁতারও শিখেছে।

আধুনিক শহরবাসী, হয়তো ভাবতেই পারেন না, পাঁচ বছরের ছেলে রীতিমত গঙ্গায় সাঁতার কেটে স্নান করে। এটি সে শিখেছে মায়ের সঙ্গে নিয়মিত গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে। এর জন্য সুইমিং পুলের দরকার হয়নি। অবশ্য শহরে নানা অসুবিধে আছে। তবু দেখি, উত্তর কলকাতা বা শহরতলীর ছেলেমেয়েরা অনেক অল্প বয়সেই সাঁতার কাটতে শেখে। গ্রামাঞ্চলের তো কথাই নেই। দিন-রাত্রি জলে-ডোবায় থেকে থেকে জলের ভয় তাদের এমনিতেই কেটে যায়। সাঁতারটা তাদের কাছে যেন জলচর প্রাণীর মতোই স্বাভাবিক।

যাই হোক, দিনক্ষণ স্থির করে, সুদর্শন পণ্ডিতকে ডাকা হল। তবে হাতেখড়ি দেওয়ালেন জগন্নাথ মিশ্র নিজের হাতে। কর্ণবেধ করে শ্রীচূড়াকরণ হল, তাও মিশ্রই করলেন। তার আত্মীয়-কুটুম্বদেরও নিমন্ত্রণ হল। সুদর্শন পণ্ডিত শিক্ষক হিসাবে প্রথম নিযুক্ত হলেন। কিছুদিন বাবার কাছে হাতে হাতে হাতখড়ি হল। বেশ তাড়াতাড়ি উন্নতিও দেখা গেল। বাবার হাত থেকে খড়ি নিয়ে নিজে

নিজেই স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ অক্ষরমালা দিব্বি লিখতে আরম্ভ করল। তারপরে অন্যান্য বালক বন্ধুদের সঙ্গে, সুদর্শন পণ্ডিতের বাড়ি গেল। এই প্রথম গুরুগৃহে আগমন। কাঠের তক্তায় অনায়াসে সমস্ত ব্যঞ্জনবর্ণ সুন্দর করে লিখল। সুদর্শন ঝুঁকে দেখলেন, খুশিও হলেন। কিন্তু ছাত্রটি তো সহজ নয়। জিজ্ঞেস করল, 'গুরুমশাই, এইগুলোকে ক খ গ ঘ কেন বলে?'

গুরু বললেন, 'ব্যঞ্জনবর্ণের ওগুলিই অক্ষরমালা।'

নিমাই জিজ্ঞেস করলো, 'কেন?'

সুদর্শন পণ্ডিত বিরক্ত হয়ে বললেন, 'কেন আবার? এই অক্ষরমালার সঙ্গে এর পরে আকার ইকার নানা যুক্তাক্ষর তৈরি করে, পূর্ণ বয়ান সৃষ্টি হবে।'

নিমাই বলল, 'তা তো হবে। কিন্তু এগুলি যে ক খ গ ঘ, এ সব কেন বলে? এর আদি অন্ত কি?'

সুদর্শন পণ্ডিত এতটুকু বালকের কাছ থেকে এ রকম তর্ক মোটেই পছন্দ করলেন না। রেগে গিয়ে, কয়েক ঘা বেত কষিয়ে দিলেন। নিমাই অবশ্য কিছু বলল না। কিন্তু তর্কটা মনে মনে রয়েই গেল। মোটের উপর অল্প দিনের মধ্যেই নিমাই দ্বাদশ ফলা অক্ষর আয়ত্ত করে নিল। তবে, দুরন্তপনাও যেন পাল্লা দিয়ে বাড়তে লাগল। বিশেষ করে গঙ্গার ঘাটে। এত দিন বন্ধু ছিল পাড়ার কয়েকটি বালক। সুদর্শন পণ্ডিতেব গৃহে গিয়ে, নবদ্বীপের অন্যান্য পাড়ায় ছেলেদের সঙ্গেও ভাব হল। সকাল থেকে মধ্যাহ্নের কিছু আগে পর্যন্ত পড়াশোনা। তারপরই গুরুগৃহ থেকে সোজা গঙ্গায়। স্নান সেরে বাড়ি।

কথাটা শুনতে ভালোই শোনায়। সকাল থেকে গুরুগৃহে লেখাপড়া সাঙ্গ করে, গঙ্গায় স্নান করে বাড়ি ফেরা। কিন্তু গঙ্গায় স্নান করতে কতক্ষণ সময় লাগে? ঘড়ির প্রহর ধরে, যদি বেলা এগারোটার সময় গুরুগৃহ ত্যাগ করা হয়, তবে নিমাই তার দলবল নিয়ে বেলা 'দুই প্রহর' কেটে গেলেও জল থেকে উঠতে চায় না। এতক্ষণ ধরে কিসের এত গঙ্গাস্নান?

স্নান তো না, দল বেঁধে হাঁসের খেলা। হাঁস কি সহজে জল থেকে উঠতে চায়? সুদর্শন পণ্ডিতের বাড়ি থেকে অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে রাস্তায় খেলতে খেলতে গঙ্গার ধার। তারপরেই গঙ্গায় ঝাঁপ। গঙ্গার জলে জলক্রীড়া দেখতে ভালোই লাগে। বিশেষ করে সকলের মধ্যে নিমাইকে। রূপটি যে তার ভুবনমোহন। চিৎ সাঁতার, ডুব সাঁতার, এমনি সাঁতার, সাঁতারের রকমারির তো কথাই নেই। কিন্তু আগেই দেখেছি, নবদ্বীপের গঙ্গার ঘাটের চিত্রের বৈশিষ্ট্য,

লক্ষ লোক এক এক ঘাটে স্নান করে। পূজা করে, আহ্নিক করে।

এক এক ঘাটে লক্ষ লোক হয়তো একটু বেশি মনে হয়। তবে ঘাটে ঘাটে প্রচুর ভিড়, কোন সন্দেহ নেই। এমন অবস্থায় জলে ঝাঁপাঝাঁপি করলে ফল যা হয়, তাই হতে লাগল। বয়স্ক লোকদের গায়ে পায়ের জলের ছিটা লাগে। কেউ বারণ করলে, কেউ যদি বা শোনে, নিমাই শোনে না। বারে বারে বারণ করলেও শোনে না। বেশি বললে, মুখের জল কুলি করে গায়ে ছুঁড়ে দেয়। এমন দুরন্ত সাহস নিমাই ছাড়া কারুর নেই।

বাধ্য হয়ে ব্রাহ্মণেরা জগন্নাথ মিশ্রের কাছে অভিযোগ করতে আসেন। 'দেখ মিশ্র, জলে দাঁড়িয়ে ধ্যান করি, তোমার ছেলে নিমাই আমার গায়ে মুখে পায়ের জল ছিটিয়ে ধ্যান নষ্ট করে। আবার কি বলে জানো তোমার ছেলে? বলে কার পূজা কর? করতে হলে আমার পূজা কর, আমিই তোমার নারায়ণ—ছি ছি, এ কি কথা বল তো?'

কেউ এসে বলেন, 'মিশ্র, স্নান করে শিবপূজা করছিলাম, তোমার ছেলে আমার শিবলিঙ্গটি নিয়ে পালিয়েছে।' কেউ বলে, 'স্নান করে উঠতে যাব, গায়ের উত্তরীয় নিয়ে তোমার ছেলে উধাও।'

শুধু কি এই? কোন ব্রাহ্মণ হয়তো নদীর পাড়ের ওপরে বিষ্ণুপূজার ফুল-দূর্বা-নৈবেদ্য সাজিয়ে গঙ্গায় ডুব দিতে নেমেছে। নিমাই ঠিক লক্ষ করে, আস্তে আস্তে পাড়ে উঠে আসে। দূর্বা-ফুল ছড়িয়ে ফেলে, চন্দন নিজের গায়ে মেখে, নৈবেদ্যের সব ফল মিষ্টি খেয়ে সাবাড়। ব্রাহ্মণ উঠে এসে ব্যাপার দেখে থ। লেগে গেল চিৎকার চেঁচামেচি, মারবার জন্য ছুটোছুটি।

কাকে মারবে? নিমাই ততক্ষণে হাসতে হাসতে জলে ঝাঁপ। ডুব সাঁতারে অনেক দূর। কোন ব্রাহ্মণ হয়তো জলে দাঁড়িয়ে পূজা করছে, নিমাই ডুব দিয়ে ব্রাহ্মণের পা ধরে এমন হ্যাঁচকা টান মারল, তাঁর তো প্রাণ যায়। চমকে লাফিয়ে হেঁকে ডেকে একাকার। শত হলেও জলের তলে শরীর। কোন জলচর প্রাণীই বা পা টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা পাচ্ছিল। ভয় কার না লাগে?

নিমাই জলে ভেসে উঠে খিলখিল করে হাসে। এ তো গেল তবু এক রকম। নিরীহ ব্রাহ্মণ মানুষ বুক-জলে দাঁড়িয়ে সূর্যকে পূজা করছেন, হঠাৎ জলের তলে তাঁর কোমরে সুড়সুড়ি! ব্যাপার কি? ভাবতে ভাবতেই দেখলেন, তাঁর কোমরের কাপড় কে খুলে নিয়ে গেল জলের তল থেকে। উলঙ্গ ব্রাহ্মণের সূর্যপূজা মাথায় উঠল। আমার কাপড়? আমার কাপড় কোথায় গেল?

নিমাই সেই ধুতিটি নিয়ে একটু দূরে ভুস করে ভেসে উঠল, আর হাসি জুড়ে দিল। বেচারি ব্রাহ্মণের অবস্থাটা বোঝ! জল থেকে তীরে উঠবার উপায় নেই। এত লোকের সামনে কি করে উলঙ্গ হয়ে উঠবেন? তখন বকাঝকা দূরের কথা, দু হাত বাড়িয়ে প্রাণান্ত ভিক্ষা, 'দে বাবা নিমাই, ধুতিটা দে, এমন করে বেইজ্জত করিস না।'

নিমাইয়ের যখন দয়া হল, তখন ধুতিটি ছুঁড়ে দিল। তারপরে ব্রাহ্মণের হাঁক-ডাক গালিগালাজ। শুধু সেই ব্রাহ্মণ তো গাল পাড়ে না, ঘটনা দেখে আরও অনেকেই গালি দেয়। নিমাই কারুর ব্যাপারই ভোলে না। সবাইকে মনে রেখে দেয়। সুযোগ বুঝেই, জলের মধ্যে লাফিয়ে ওঠে আর এক ব্রাহ্মণের ঘাড়ে, লাফ দিয়ে উঠে, আবার তৎক্ষণাৎ জলে ঝাঁপ। ভেসে উঠেই হেসে বলে, 'মহেশের পূজা করছিলে না? তা আমিই মহেশ, তোমার কাঁধে চেপে নিলাম।'

আবার গালাগালির পালা। নিমাই মনে মনে হাসে। কেউ হয়তো তাঁর শিশুসন্তানটিকে গঙ্গার পাড়ে বসিয়ে স্নান করছেন। নিমাই পাড়ে উঠে, নিজের ভেজা কাপড় নিংড়ে, সেই শিশুর কানে জল ঢুকিয়ে তাকে কাঁদাতে আরম্ভ করল। ব্রাহ্মণ কান্না শুনে জল থেকে তড়িঘড়ি উঠে এলেন। নিমাই ততক্ষণে আবার জলে ঝাঁপ।

নিমাই ঘাটে এলে, কারুরই নিস্তার নেই। নবদ্বীপের সব ব্রাহ্মণই গঙ্গায় স্নান করে, পূজা সেরে বাড়ি ফেরেন। নিমাই পূজার আগেই নৈবেদ্যের ফলমূল খেয়ে, নিজেই পূজার আসনে বসে মন্ত্র আওড়াতে শুরু করে দিল। মার্ মার্ বলে পূজারী জল থেকে ছুটে এলেন। নিমাই মুঠো মুঠো বালি তুলে তাঁর গায়ে মারতে আরম্ভ করল। সঙ্গীরাও মেতে গিয়ে বালি নিয়ে যার তার গায়ে ছোঁড়াছুঁড়ি শুরু করে দিল।

নিমাইয়ের দৌরাত্ম্যের নানা রকমফের। কাছাকাছি ঘাটে মেয়ে পুরুষরা স্নান করেন। তাঁদের কাপড়-চোপড় পাড়ের উপর থাকে। নিমাই মজা করবার জন্য, পুরুষের কাপড়ের জায়গায় মেয়েদের শাড়ি, মেয়েদের শাড়ির জায়গায় পুরুষের ধুতি রেখে চম্পট। স্নান করে উঠে সবাই তো হতভম্ব। মেয়েরা খোঁজে শাড়ি, পুরুষরা ধুতি। তাদের নিজেদের মধ্যেই ঝগড়া লাগাবার অবস্থা। কেউ কেউ আবার কিছু লক্ষ না করেই, উলটো-পালটা, শাড়ির বদলে ধুতি আর ধুতির বদলে শাড়ি পরে বাড়ি গিয়ে লজ্জায় পড়ে যায়। অবশ্য টের পেতে দেরী হয় না, এ হল মিশ্রের ব্যাটা নিমাইয়ের কাণ্ড!

কিন্তু নিমাই মহা ধুরন্ধর ছেলে। সে যে কেবল ব্রাহ্মণ সজ্জনদের পিছনেই লাগে, তা নয়। গঙ্গার ঘাটে বালিকাদের পিছনে লাগতেও ছাড়ে না। শাড়ি তো চুরি করেই, আর যা মুখে আসে, তাই বলে দেয়। বেচারিরা স্নান করে পূজার জন্য ফুল দূর্বা নিয়ে আসে, সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলে দেয়। বিশেষ করে বালিকাদের গায়ে বালি ছিটিয়ে দিতে তার আমোদ যেন আরও বেশী। কোন বালিকা হয়তো স্নান করে উঠেছে, ছুটে এসে তার কানের কাছে নানান বোল্‌চাল দিয়ে গেল। ব্রাহ্মণদের তো তবু গায়ে কুলকুচা করে জল দেয়। বালিকাদের দেয় মুখে। আর জলের ধারে ওকড়া গাছের কাঁটা ফল নিয়ে মাথার চুলে ছুঁড়ে দেয়। চুলের ভিতরেও ঢুকিয়ে দেয়। শচীদেবীর কাছে মেয়েরা এসে অভিযোগ করে। এমন কি একটি মেয়ে এমন কথাও বলল, 'তোমার নিমাই আবার আমাকে বিয়ে করতে চায়।'...

ভাবো, ছ'বছরের ছেলে, সমবয়সী বালিকাকে বলছে, 'তোকে বিয়ে করব।' বালিকারা পরিষ্কার জানিয়ে দিল, তারা যদি বাবা-মাকে এ সব কথা বলে, তাহলে কিন্তু ব্যাপার খুবই খারাপ হবে। ছেলেকে ডেকে বারণ কর। এ সব কাজ নদীয়ায় চলে না। শ্রীহট্টে চলতে পারে।

এ কথা থেকে বোঝা যাচ্ছে, নদীয়া আর শ্রীহট্টের লোকদের আবার আচরণ এক রকমের নয়। কারণ বালিকাদের কথাতেই স্পষ্ট, শ্রীহট্টে যা চলে নদীয়ায় তা চলে না। শচীদেবী অবশ্য বালিকাদের প্রবোধ দেন, নিমাইকে, তিনি শাসন করবেন। বালিকাদের কোলের কাছে বসিয়ে আদর করেন, বলেন, নিমাইকে আমি খুব বকব, সে আর তোমাদের উপর উপদ্রব করবে না।

শচী ঠাকুরাণীর কথা শুনে বালিকাদের মনে শান্ত হয়। তারা শচীর পায়ের ধুলো নিয়ে আবার স্নান করতে চলে যায়। লক্ষ করুন রাগ তেজ সবই আছে, কিন্তু গুরুজনে ভক্তিও আছে। আমার মনে হয়, এই বয়সেই নিমাই প্রেম করতে শেখেনি। এ সব নিতান্তই বালকের দুষ্টামি। 'তোকে বিয়ে করব' এ কথা বলাটাও আসলে প্রচলিত হাস্যপরিহাসের একটা কথা মাত্র।

কিন্তু যে সব বালিকারা শচীর কাছে নালিশ করে গেল. তাদের মনের কথা কি? চিরকাল দেখে এসেছি, সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র। বঙ্কিমবাবু কথাটা পুরনো অভিজ্ঞতা থেকেই বোধ হয় লিখেছিলেন। এই তো দেখছি, এক ব্রাহ্মণের নালিশ শুনে, জগন্নাথ মিশ্র রীতিমত ক্রুদ্ধ হয়ে লাঠি হাতে গঙ্গার ঘাটে চলেছেন, নিমাইকে ধরতে। নিমাইয়ের কপালে নির্ঘাত দুঃখ ছিল। কিন্তু যে বালিকারা তার নামে নালিশ করেছিল, তারাই ছুটে গিয়ে নিমাইকে সাবধান

করে দিল, 'নিমাই, শীগ্‌গির পালাও, তোমার বাবা ঠ্যাংগা নিয়ে আসছেন।'

নিমাই শোনা মাত্রই ঘাট থেকে দৌড়ে ভিড়ের আড়ালে আড়ালে পালিয়ে গেল। মিশ্র ছেলেকে খুঁজে পেলেন না। কুমারী বালিকারা মুখে আঁচল চেপে হাসল। কেন? তবে যে নিমাইয়ের নামে, মায়ের কাছে গিয়ে এত অভিযোগ? বোঝা গেল, বয়স যা-ই হোক, রমণীর মন, কখন কোন্ পথে যায়, বলা দুষ্কর। আসলে মনে মনে সব বালিকাই নিমাইকে পছন্দ করে। পছন্দ অবশ্য প্রেমঘটিত বলা যায় না। কিন্তু একটা কথা ভুললে চলবে না। এই সেই যুগ যখন মেয়েদের শিশু বয়সেই বিয়ে হয়। জীবনের অভিজ্ঞতা তারা অল্প বয়সেই অনেকখানি আয়ত্ত করে নেয়।

আট



দেখলাম, নিমাই কি রকম দুরন্ত। দুর্বিনীতই বলা চলে। নিজের শিক্ষক পণ্ডিতের সঙ্গে তর্ক করে। বয়স্ক পূজ্যদের মানে না। বৈদ্য মুরারির মতো লোককে ভেংচি কাটে। গঙ্গার ঘাটের কীর্তি-কলাপের তো কথাই নেই। অবশ্য গঙ্গার ঘাটে আরও অনেক ঘটনাই আমাকে পরে দেখতে হবে। তবে নিমাই বাবা-মাকেও যে ভয় পায় না তাও আমরা দেখলাম।

কিন্তু ভয় না থাক, নিমাই কি কারুর প্রতিই নম্র নয়? তা তো না, লক্ষ করে দেখছি, একজনের প্রতিই নিমাইয়ের আচার-আচরণ-ব্যবহার অন্য রকম। তার কথা শুনলেই কাছে ছুটে যায়। মা ডেকে আনতে বললেই তাকে ডেকে নিয়ে আসে। একমাত্র তার সামনেই নিমাই শান্ত নম্র। এমন কি তার মুখের দিকে তাকালেও নিমাইয়ের মুখের ভাব বদলে যায়। সে হল নিমাইয়ের অগ্রজ বিশ্বরূপ। নিমাইয়ের থেকে দশ বছরের বড়।

নিমাইয়ের এখন ছ'বছর বয়স পূর্ণ। বিশ্বরূপের ষোল। সে সারাদিন পুঁথিপত্র আর বিষ্ণুভক্তি নিয়ে আছে। বেশীর ভাগ সময় কাটে আচার্য অদ্বৈতর কাছে। আলোচনা বিষ্ণুর নানা লীলা। জগন্নাথ আর শচী বিশ্বরূপের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, ছেলে রীতিমত যুবাপুরুষ হয়ে উঠছে। সেও ভাইটিকে বড়

ভালোবাসে। যেখানেই যখন যায়, ভাইয়ের জন্য কিছু নিয়ে আসে। অথচ সংসারের দিকে বিন্দু মাত্র লক্ষ নেই। অতএব, ছেলের বিয়ে দেওয়াই শ্রেয়।

জগন্নাথ মিশ্র বিশ্বরূপের উপযুক্ত পাত্রীর সন্ধানে লাগলেন। বিশ্বরূপের কানে সে-কথা যেতেই সে প্রথমে উচ্চারণ করল, 'বিয়ে? শাস্ত্র পড়ে বুঝেছি, সংসার তিল মাত্র সত্য নয়, অতএব বিয়েও নয়।'

তা বললে কি চলে? মিশ্র কন্যার সন্ধান করলেন। বিশ্বরূপ বেগতিক দেখে, রাত্রি শেষ না হতেই, বাঁ হাতে পুঁথিপত্র নিয়ে গঙ্গার ঘাটে। দেখল নৌকা নেই। নেই তো নেই, সাঁতার কেটে ওপারে গিয়ে, সোজা হাজির একেবারে কাটোয়ায়। সেখানে ছিলেন কেশব ভারতী। বিশ্বরূপ তাঁর কাছে সন্ন্যাস নিলেন। কেশব ভারতী তার নাম রাখলেন, শ্রীশঙ্করারণ্য।

শচী ডুকরে কেঁদে উঠে নিমাইকে বুকে আঁকড়ে ধরলেন। বিশ্বরূপ বড় গম্ভীর ছিল, একমাত্র নিমাইয়ের কাছে ছাড়া। মা তাকে বিশেষ কিছু বলতে পারতেন না। বিশ্বরূপ নিজেও যে সন্ন্যাস নেবে, আগে বোধ হয় কখনো ভাবেননি। বিয়ের কথা শুনেই তার মাথা খারাপ হয়ে গেল। শচী কাঁদেন, জগন্নাথ মিশ্রও কাঁদেন। এতগুলি কন্যা মারা গেল। দুই ছেলের একটি সন্ন্যাসী হয়ে গেল। তারপরে কোন্ বাবা-মায়ের প্রাণ স্থির থাকে? এখন একমাত্র কোল জুড়ে নিমাই।

দাদার গৃহত্যাগ আর সন্ন্যাস গ্রহণে, নিমাইও যেন কেমন বিমর্ষ শান্ত হয়ে গেল। সব সময়েই প্রায় বাবা-মায়ের কাছে থাকে। আর পড়াশোনায় গভীর মনোযোগ দিল। খেলাধুলা একরকম ছেড়েই দিল। বন্ধুরা ডাকতে এলেও মাকে ছেড়ে যায় না। যায় কেবল গুরুগৃহে, আর সেখানে নানা সূত্র পাঠ করে, আবার সেই সূত্রকেই পালটিয়ে অন্য রূপে বিচার করে। তবু বুঝতে পারে, মা-বাবার বুক ফাটছে। বুক যে নিমাইয়েরও ফাটছে। সে একদিন বলেই ফেলল 'তোমরা কেঁদো না। আমি বড় হয়ে তোমাদের সেবা করব।'

হোক ছেলেমানুষের কথা, তা শুনেও বাবা-মায়ের মন শান্তি পেল। তবু নিমাই তো আছে। আশেপাশে সবাই নিমাইয়ের ভাবান্তর আর লেখাপড়ার কাজ দেখে, তার বাবা-মাকে বলতে লাগলেন, 'তোমাদের এ ছেলে বৃহস্পতির তুল্য জ্ঞানী হবে। সবাইকে শাস্ত্রজ্ঞানে পরাজিত করে, জগজ্জয়ী হবে।'

শচীদেবীর মন আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠল। নিমাই তাঁর জগজ্জয়ী বৃহস্পতিতুল্য পণ্ডিত হবে। কিন্তু জগন্নাথ মিশ্র খুশি হলেন না, শান্তি পেলেন না। শচী স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে স্বামীর মনোভাব বুঝতে পারলেন না। নিমাই বৃহস্পতিতুল্য

পণ্ডিত হবে শুনে স্বামী এমন বিমর্ষ কেন ? জিজ্ঞেস করলেন, 'নিমাই জগজ্জয়ী হবে, শুনে কি খুশি হওনি ?'

মিশ্র বললেন, 'না, সুখী হতে পারছি না গো নিমাইয়ের মা। মনে করে দেখ, বিশ্বরূপ এত পড়াশোনা করে, যাবার আগে কি বলেছিল ? বলেছিল, এত শাস্ত্র পড়ে এই সার জেনেছি, সংসার সত্য নহে তিলমাত্র। ব্রাহ্মণী, আমার ভয়, নিমাইও বেশী শাস্ত্র পাঠ করে, হয়তো ঘর ছেড়ে চলে যাবে।'

শচী যেন মিশ্রের কথায় তেমন ভয় পেলেন না। বললেন, 'তা বলে ছেলে কি অশিক্ষিত হয়ে থাকবে ?'

মিশ্র পরিষ্কার বললেন, তাই থাকুক, আমার নিমাইয়ের লেখাপড়া করে কাজ নেই। মূর্খ হয়েও, ছেলে ঘরে থাকুক, আমার তাতেও শান্তি।'

· শচীমাতা বললেন, 'কিন্তু ব্রাহ্মণের ঘরের ছেলে মূর্খ হয়ে থাকলে, তার জীবিকা কী হবে ? লোকে এমন ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়েই বা দেবে কেন ?'

মিশ্র বললেন, 'ব্রাহ্মণী, ঈশ্বর বিদ্যা হয়তো দিতে পারেন, খেতে কি দেন ? এই তো আমাকেই দেখ না, শিক্ষা পাঠ করেও আমার ঘরে ভাত নেই কেন ?'

মিশ্রের কথা থেকে এই প্রথম জানতে পারছি, তাঁর ঘরে ভাতের কষ্ট ছিল। কিন্তু পাণ্ডিত্যের মর্যাদা তিনি পেয়েছেন। শচী বললেন, 'তবে তুমি যা ভালো বোঝ, তাই কর।'

বিশ্বরূপের গৃহত্যাগে, সন্ন্যাস গ্রহণে, নিমাই দুরন্তপনা ছেড়ে, নতুন করে বিদ্যার্জনে মেতে উঠেছিল। তাকে ডেকে জগন্নাথ মিশ্র বললেন, 'শোন নিমাই, আজ থেকে তোমার আর লেখাপড়া করে কাজ নেই।'

নিমাই প্রথমে অবাক হল। জিজ্ঞেস করল, 'কেন ?'

মিশ্র বললেন, 'আমার আজ্ঞা, লেখাপড়ায় আর কাজ নেই।'

অগ্রজের অদর্শনে নিমাই লেখাপড়া নিয়ে মগ্ন থেকে, দুঃখ ভুলতে চেয়েছিল। পিতৃআজ্ঞায় বাধা পেয়ে, প্রবল স্রোত যেন বাধা পেল, আর ভিতরে যেন তা ফুলে ফেঁপে উঠল। পরিণতি : নিমাই আবার দুরন্ত হয়ে উঠল, তার দৌরাত্ম্য আবার বাড়ল। তার এই দৌরাত্ম্যকে দৌরাত্ম্যের দ্বিতীয় অধ্যায় বলে ধরে নেওয়া যায়। দেখে শুনে, ব্যাপারটা হাস্যকর মনে হতে পারে, কিন্তু আমি দেখছি নিমাইয়ের মতো শিশুর ভিতরে এক মহাশক্তি কাজ করছে। সকল মানুষের মধ্যেই শক্তি অবস্থান করে, সে শক্তিকে কাজে লাগাতে চায়। পথ না পেলেই তা বিপথে যায়। আর নিমাইয়ের মতো দুর্জয় শক্তিমান ছেলের তো কথাই নেই। নিমাই এক

রকমের দস্যিবৃত্তি আরম্ভ করল। যেখানে যা পায় তাই ভেঙে চুরমার করে। এই প্রথম দেখা গেল, রাত হলেও সহজে সে বাড়ি ফেরে না। নানান রকম তার দুষ্টামির ফন্দি-ফিকির। রাতের অন্ধকারে, অন্য বালকের সঙ্গে, দুজনে কম্বলে গা মাথা মুড়ি দিয়ে, বিশাল কালো যণ্ডের মতো ছোটে। লোকে দেখে ভয়ে দৌড়ায়। ভয়ভর যা-ও-বা ছিল, সব গেল। লোকজনের বাড়ি গিয়ে, বাইরে থেকে দরজায় শিকল টেনে দিয়ে চলে যায়। ঘুম ভেঙে গৃহস্থের দুর্ভোগের শেষ নেই। বুঝতে পারে না, কার কাণ্ড এ সব?

সেই যুগের নিয়মানুসারে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণরা প্রতি দিনই কুমোরের দোকান থেকে হাঁড়ি মালসা এনে দেবতার পূজা করেন। পরে সেই সব পাত্র গঙ্গায় ফেলে দেন।

একদিন মিশ্র বাড়ির বাইরে গেছেন। নিমাই দেখল পূজাপাঠ শেষ। সেসব বর্জনীয় হাঁড়ি মালসা, প্রসাদের অবশিষ্টাদির ওপর দিব্বি আসন তৈরি করে বসে পড়ল। শচীদেবী এমনিতেই শুচিবায়ুগ্রস্ত। ছেলেকেও চেনেন ভালো। তিনি চিৎকার করে বকে উঠলেন, 'ছি ছি ছি, করিস কি তুই? জানিস না, ও সব ছুঁলে স্নান করতে হয়? এই অসময়ে তুই ওই এঁটোতে গিয়ে বসলি?'

নিমাই বলল, 'তোমরা আমাকে লেখাপড়া করতে দাও না, আমি ব্রাহ্মণের মূর্খ ছেলে, লোকে এর কী আর জানবে? আমি মূর্খ, ভালো মন্দ বুঝি না। সব জায়গাতেই আমি বসতে পারি।'

শ্রীমানের চাতুর্যের সীমা নেই। সবই জানে, তবু যুক্তি দিতে ছাড়ে না। শচী দেবীও ছাড়বেন না। তিনি ওকে ধমকে বারে বারে আবর্জনা থেকে উঠে আসতে বললেন। নিমাই গম্ভীর চালে মাকে বলল, 'বিষ্ণুর রান্নাবান্নার পাত্র, এ কখনো খারাপ হতে পারে? এ সব ছুঁলে বরং শুদ্ধ হয়, কেন না, এ তো শুদ্ধ স্থান।'

এ কি কেবল চাতুর্য, দুষ্টুমি? কথাবার্তার মধ্যে যেন স্বাধীন চিন্তার ছাপ, প্রচলিত নিয়মকানুনের বিরুদ্ধে রীতিমত বিদ্রোহ। কিন্তু নবদ্বীপে কারুরই সেই দূরদৃষ্টি নেই, এই বালকই ভবিষ্যতে অস্পৃশ্য অঙ্গের উপরে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। আজও কি মানব-জাতি কোন বালককে দেখে ভবিষ্যৎবাণী করতে পারে? অবশ্য জ্যোতিষীর কথা আলাদা। আজকাল ওসবের বড় বোলবোলাও দেখা যায়। শাস্ত্রজ্ঞ কে কতখানি, তার বিচার কি আমরা জানি?

মিশ্র দেখলেন, নিমাইকে সামলানো দায়। তিনি বাড়ি ফিরে নিমাইয়ের কাণ্ডকারখানা দেখে আদেশ দিলেন, 'আচ্ছা, উঠে এসো, স্নান করতে যাও। আবার লেখাপড়া শুরু কর।'

নিমাই মহাখুশি হয়ে অশুচি স্থান থেকে উঠে এল। মিশ্র বুঝলেন, দৃঢ়তা নিমাইয়ের সহজাত সংস্কার। নিমাই মনের আনন্দে পড়াশোনা আরম্ভ করল। দেখতে দেখতে নিমাইয়ের ন' বছর বয়স হল। মিশ্র শচীদেবীর সঙ্গে কথা বলে, নিমাইয়ের যজ্ঞোপবীতের আয়োজন করলেন। বৈশাখ মাসের অক্ষয় তৃতীয়ার দিন, নিমাই 'যজ্ঞসূত্র' ধারণ করল। রত্নাকর নামে নবসুন্দর এসে ক্ষৌরকার্য করল। মাতামহ নীলাম্বর কানে দিলেন গায়ত্রী মন্ত্র। 'কৃষ্ণসার চর্মসূত্র মিথিলি প্রবন্ধে'। বেলগাছের ডালও শুভক্ষণে কাঁধে নিল।

মাতামহী অর্থাৎ নীলাম্বর চক্রবর্তীর গৃহিণী হবিষ্যান্ন খাওয়ালেন দৌহিত্রকে। নিমাই সাতদিন মৌনব্রতী হয়ে রইল। তিনদিন শূদ্রের মুখ দর্শন করল না। কিন্তু মৌনব্রতী হয়ে থাকলে কী হবে। বন্ধুরা এলে, মাকে ঠারেঠোরে জানিয়ে দেয়। আমার বন্ধুদের নাড়ু মোয়া খাওয়াও।

মিশ্র জিজ্ঞাসা করলেন, 'নিমাই এবার বল, তুমি কার কাছে বিদ্যাভ্যাস করতে চাও?'

নিমাই বলল, 'গঙ্গাদাস পণ্ডিত ব্যাকরণ শাস্ত্রের তত্ত্ববিৎ। আমি তাঁর কাছে পড়তে চাই।'

মিশ্র ইচ্ছে করেই নিমাইয়ের মতামত জানতে চাইলেন। কারণ, ছেলেকে তিনি ভালোই জানেন। নিজের পছন্দমত কোন অধ্যাপকের কাছে নিয়ে যাবেন, নিমাই হয়তো বেঁকে বসবে। এটা একটা বিশিষ্ট ঘটনা, নিমাই নিজের অধ্যাপক নিজেই বেছে নিল। নিয়মিত অধ্যাপক-গৃহে যাওয়া শুরু হল। শুরু হল ব্যাকরণ পাঠ। কিছুদিনের মধ্যেই, কেবল যে গুরুর ব্যাখ্যাই খণ্ডন করতে লাগল তা নয়। খণ্ডন করেও আবার সেই ব্যাখ্যাকেই নিজের সূত্রে স্থাপন করে।

এই খণ্ডন আর স্থাপন সহজ কাজ নয়। বিশেষ, নিমাইয়ের মতো বয়সের ছেলের পক্ষে। এ সব তীক্ষ্ণ মেধার লক্ষণ। গঙ্গাদাসও ছাত্রের তীক্ষ্ণ মেধায় সুখী। তিনি শিষ্যদের মধ্যে নিমাইকে সকলের শ্রেষ্ঠ আসন দিলেন। ছাত্র তো নিমাই একলা নয়। মুরারি গুপ্ত, শ্রীকমলাকান্ত, ব্রহ্মানন্দ, অনেক মেধাবী ছাত্রই ছিল। তাদের মধ্যে নিমাই শ্রেষ্ঠ। কেবল শ্রেষ্ঠ না। সবাইকে আবার 'ফাঁকি' জিজ্ঞাসা করে।

শাস্ত্রীয় কূট তর্ককে 'ফাঁকি' বলে। নিমাইয়ের সঙ্গে কূট তর্কে কেউ এঁটে উঠতে পারে না। বদ্যিদের নিয়ে বাঙালী ভদ্রগণ এখনও বন্ধুবান্ধবদের ঠাট্টা করেন। নিমাইও দেখছি বন্ধু মুরারি গুপ্তকে বলছে, 'তুই তো বদ্যি, তোর এ সব ব্যাকরণ পড়ে কি হবে? লতাপাতা নিয়ে রুগী দেখতে যা। ব্যাকরণে

কি কফ পিত্ত অজীর্ণের ওষুধের কথা আছে ?'

শ্রীবাসের সকলের পিছনে লাগা চাই। বন্ধুরা ভাবে, নিমাই বড় অহংকারী। আসলে সে আমোদপ্রিয়। নিমাই কিন্তু লেখাপড়ায় অত্যন্ত মনোযোগী। সকালে গুরুগৃহে, মধ্যাহ্নে ভোজন সেরেই আবার লেখাপড়া নিয়ে বসে। মিশ্র দেখলেন, ছেলে এগারো বছর বয়সেই সূত্রের টিপ্পনী করে। মিশ্রের মন আনন্দে ভরে ওঠে। কিন্তু অবচেতন মনে একটা ভয়ও আছে। ছেলেকে সর্বক্ষণই লেখাপড়া নিয়ে থাকতে দেখে, একদিন স্বপ্ন দেখলেন। শচীকে ডেকে বললেন, 'ব্রাহ্মণী, আমি স্বপ্ন দেখলাম, নিমাই যেন শিখা মুণ্ডন করেছে।'

সন্ন্যাসীর শিখা মুণ্ডন একটি আবশ্যিক ধর্ম। শচীদেবীর বুক কেঁপে উঠলো। তবু মুখে আশ্বাস দিলেন, 'তুমি ভয় পেও না, নিমাই আমার ঘরেই থাকবে।'

এদিকে নিমাই গঙ্গাদাস অধ্যাপকের গৃহে রীতিমত প্রতিভার পরিচয় দিয়ে চলেছে। চন্দ্র সারস্বত কাব্য নাটক, স্মৃতি, তর্ক, সাহিত্য সবই পাঠ করল। এক-দিন তো গঙ্গাদাসের সামনেই বলে উঠল, 'কোন্ ব্যাটা আছে, আমার ব্যাখ্যা খণ্ডন করবে ? তাকে দেখাও, তার কাঁধে চেপে মাথায় গাঁট্টা মারব।'

গঙ্গাদাস কথাটা সহ্য করতে পারলেন না। খুবই স্বাভাবিক। হাতের কাছে খুঁটি তুলে নিমাইকে আঘাত করলেন। নিমাই পাল্টা মারল না, কিন্তু পুঁথি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে কেঁদে উঠল। মিশ্র খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি ছেলেকে বুকে করে বাড়ি নিয়ে এলেন। বললেন, 'এ ছেলে নিয়ে আমাকে নবদ্বীপ ছেড়ে যেতে হবে।'

মিশ্র তবু পরের দিন গঙ্গাদাসকে গিয়ে আবার অনেক অনুনয়-বিনয় করে, নিমাইকে পড়তে দিয়ে এলেন। গঙ্গাদাসকে বললেন, 'কি করব বলুন, নিজের কথা ছাড়া কারুর কথা মানতে চায় না। আপনি একটু মানিয়ে নিন।'

তারপরেই নিমাইয়ের জীবনে এলো আর একটি আঘাত। জগন্নাথ মিশ্র মারা গেলেন। বিশ্বরূপ সন্ন্যাস নেবার পাঁচ বছর পরের ঘটনা। মিশ্র অসুস্থ ছিলেন, নিমাই জানতো। জ্বর পিত্ত কফের রোগে ভুগছিলেন। সে ছিল গঙ্গাধর দাসের গৃহে পাঠরত। খবর গেল, 'নিমাই শীঘ্র চল, তোমার বাবার অবস্থা খারাপ, অন্তর্জলি যাত্রায় গঙ্গার ধারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

নিমাই সংবাদ শোনা মাত্র পুঁথি ছুঁড়ে ফেলে গঙ্গার ঘাটে অন্তর্জলে গেল। বাবার মাথা নিজের কোলে নিয়ে বসে, কেঁদে উঠে বলল, 'বাবা, আমাকে ছেড়ে তুমি কোথায় চললে ? তোমাকে ছেড়ে আমি থাকব কেমন করে ? কোথায় বা থাকব ? বাবা বলে কি আর ডাকতে পাব না ?'

মৃত্যুপথযাত্রী মিশ্র শিথিল হাত নিমাইয়ের গলা জড়িয়ে ধরে, শীর্ণ স্বরে বললেন, 'বাপ নিমাই, তোমাকে আমি জগন্নাথের কাছে সমর্পণ করছি, তুমি স্থির থাক। আর শোন বাবা, দেখবে মায়ের যেন কোন অপমান না হয়।'

নিমাই সকলের সঙ্গে পিতৃদেহ দাহ করল। দাদা গৃহত্যাগী, বাবা মারা গেলেন, সংসারে বিধবা মা। ঘরেও দরিদ্রতা আছে। তবু নিমাই মাকে সান্ত্বনা দিল, 'মা, চিন্তা করো না। আমি যখন আছি, তোমার সবই আছে।'

তবু নিমাই চরিত্র একদিক থেকে জটিল। পিতার মৃত্যুর কিছুকাল পরেও একদিন নিমাই মায়ের সঙ্গে খারাপ আচরণ করল। অথচ সামান্য ব্যাপার। নিমাই স্নান করতে যাবার আগে মাকে বলল, 'আমাকে তেল আমলকি চন্দন আর মালা এনে দাও, স্নানে যাব।'

মা বললেন, 'দাঁড়াও, মালা এনে দিচ্ছি।'

'এখন মালা আনতে যাবে?' নিমাই একেবারে ক্ষেপে আগুন। ঘরের মধ্যে ঢুকে হাতের কাছে যা পেল, সর্বস্ব ভাঙচুর করল। তারপরে ঘরটাকেও মারতে আরম্ভ করল। ঘরকে ঠেঙিয়ে বাইরে এসে গাছ ঠেঙাতে আরম্ভ করল।

শচী তো ভয়েই অস্থির। আড়ালে লুকোবেন কিনা ভাবছেন। নিমাই মায়ের গায়ে হাত তুলল না, নিজেই মাটিতে পড়ে আছাড়ি পিছাড়ি খেতে লাগল। এই রাগ একটি বিশেষ লক্ষণ। পরেও, পাষণ্ডী সংহার, যবনরাজভীতি দূরীকরণ, জগাই মাধাই উদ্ধার, চাঁদকাজীর বাড়ি আক্রমণ এবং লুণ্ঠনে তার দু'বার এই রকম দুরন্ত ক্রোধ দেখা গেছে।

নয়



এবার যাই গঙ্গাতীরের নাট্যলীলায়। নিমাইয়ের এখন বয়স বাড়ছে। ঠিক আগের মতো আর দৌরাত্ম্য করে না বটে। তবে স্নানার্থিনী কুমারীদের সম্পর্কে তার উৎসাহ যেন একটু বেড়েছে। নৈবেদ্য খেয়ে নেওয়া, ফুলের মালা নিজের গলায় পরা, চন্দন নিজের কপালে লেপা, এ সব আছেই। নিজেই দেবতা সেজে বসা, তাও আছে। আবার বলে, 'কালী দুর্গা সবাই আমার দাসী, মহেশ আমার দাস। আমাকেই পূজা কর না কেন।'

মেয়েরা তো অস্থির। তারা বলে, 'নিমাই, আমরা তোমার গ্রাম সম্পর্কে বোন, তোমার কি এ সব করা উচিত? তুমি কোন্ সাহসে দেবতার সাজ নাও?'

নিমাই চতুর বড়। হেসে বলে, 'শোন শোন, আমি তোমাদের বর দিচ্ছি তোমাদের সকলের পরম সুন্দর স্বামী হবে। পণ্ডিত হবে, যুবক হবে, প্রচুর ধন-ধান্য হবে। তোমাদের এক-একজনের সাত-সাতটি করে ছেলে হবে।'

বর শুনে মেয়েরা মনে মনে খুশি, বাইরে ভাব দেখায় রাগের। তবু কোন মেয়ে হয়তো নৈবেদ্য ফুল মালা নিয়ে দৌড়ে পালায়। নিমাই চিৎকার করে বলে, 'শোন কিপ্‌টেনি, আমাকে নৈবেদ্য দিলে না, তোমার বুড়ো বর হবে।'

অমনি সেই মেয়ের মনে ভয় হল। কি জানি,' নিমাইয়ের কথাই হয়তো সত্যি হবে। সে তাড়াতাড়ি নিমাইকে নৈবেদ্য এনে দিল। নিমাই খেয়েদেয়ে তাকে বর দিল।

এর মধ্যেই বিশেষ একটি মেয়েকে নিয়ে বিশেষ ঘটনা ঘটল। মেয়েটি বল্লভাচার্যের কন্যা, নাম লক্ষ্মী। মেয়েটি প্রকৃতই রূপে গুণে লক্ষ্মী। সে পূজা ও স্নানে এসেছে গঙ্গার ঘাটে। নিমাইও এসেছে। নিমাই কি এতদিন লক্ষ্মীকে ঘাটে দেখেনি? যেন হঠাৎ দর্শনে মুগ্ধ হয়ে গেল। মুগ্ধ চোখে তাকালো মেয়েটির দিকে।

লক্ষ্মীর চোখেও নিমাইকে দেখা মাত্রই মুগ্ধতা ফুটে উঠল। প্রাণের মধ্যে একটা লজ্জা মিশ্রিত সুখের উল্লাস অনুভূত হল। তবু লজ্জায় চোখ নত করল। কিন্তু নিমাইয়ের দৃষ্টির আকর্ষণ এমনই গভীর, আবার চোখ তুলে তাকাল, আবার চোখ নত করল। দুজনেই দুজনকে দেখে, কী করবে কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না।

লক্ষ্মী যদি বা চোখ নামায়, নিমাই তা পারে না। লক্ষ্মীর রূপ দেখে তার সাধ মেটে না। লক্ষ্মীর চুল বড় সুন্দর। 'লাবণ্য কেশ, ভ্রমর গুঞ্জরে।'

কবির উক্তি। কিন্তু কবিরা কি ঐতিহাসিক? তাঁরা কি সকলের রোজনামচাও লেখেন? এখানে তো তাই দেখছি। কোন কবিই নিমাইয়ের সঙ্গে লক্ষ্মীর দু'বারের বেশী দেখা করাননি। বল্লভাচার্যের বাড়ি এমন কিছু দূরে নয়। ঘাটে দেখা হলেও, পাড়ায় কি নিমাই আর লক্ষ্মীর দেখা হয় না?

যেখানে দেখছি, দুজনে দুজনকে দেখে মুগ্ধ, একদৃষ্টে অপলক চেয়ে থাকে, দুজনে দুজনকে মনে মনে অভিলাষ করছে, সেখানে মাত্র দু'বার দেখা? বিশেষ করে নিমাইয়ের মতো, একদিকে যেমন চতুর, তেমনি বুদ্ধিমান। তার রাগ-বিরাগ দেখে, তাকে যথেষ্ট আবেগপ্রবণও বলা যায়। তার মতো ছেলে কি মাত্র দু'দিন দেখেই সব স্থির করে ফেলল? গঙ্গার ঘাটে কি দুজনে নিয়মিত যেত না?

এইটি হল যুগলক্ষণ। কবিরাও সেই যুগলক্ষণ ত্যাগ করতে পারেন না। যে ভবিষ্যতে কৃষ্ণেরই অবতার হবে, তার সঙ্গে কৃষ্ণের এত চরিত্রের বৈপরীত্যই বা থাকবে কেন? বলা যায় সময় এবং কালের একটা ব্যাপার আছে। চতুর্দশ শতাব্দীর নবদ্বীপে প্রেমিক-প্রেমিকার দু'বারের বেশি সাক্ষাৎ দেখানো চলে না। নবদ্বীপের সামাজিক জীবন কি ঠিক তাই?

নিমাই আর লক্ষ্মীর একদিন গঙ্গার ঘাটে দেখা। লক্ষ্মী এক মনে শঙ্কর পূজা করছে। বারে বারে নমস্কার আর দণ্ডবত করে লক্ষ্মী বর প্রার্থনা করছে, 'আমার মানস সিদ্ধ কর ত্রিলোচন/নবদ্বীপচন্দ্র করুন পাণিগ্রহণ।'

নবদ্বীপচন্দ্র মানেই নিমাই। এই বর প্রার্থনা মাত্রই লক্ষ্মীর বাঁ চোখ নাচতে লাগল। মেয়েদের বাঁ চোখ নাচা মানে, মনস্কামনা সিদ্ধ হবার লক্ষণ। লক্ষ্মী চোখ মেলেই তাকিয়ে দেখল, সামনে দাঁড়িয়ে নিমাই। নিমাই কি বলল?

নিমাই হেসে বলল, 'এতদিনে তোমার বিধি প্রসন্ন হল।' তার মানে, নিমাই স্পষ্টই বলল, 'আমিই তোমার। তোমার সঙ্গে আমার মিলন হবে।'

আবার দেখি, লক্ষ্মী গঙ্গাস্নানে গিয়ে হঠাৎ নিমাইকে দেখতে পায়। নিমাইয়ের মুখে স্মিত হাসি। অপলক দৃষ্টি লক্ষ্মীর দিকে। লক্ষ্মী যেন তৎক্ষণাৎ বুঝল, কার জন্যে সে পৃথিবীতে জন্মেছে। মনে মনে নিমাইকে প্রণাম করল।

লক্ষ্মীর আর একটু ছেলেবেলায় দেখছি, বাড়িতে বলছে, 'আমাকে সেই বরের সঙ্গে বিয়ে দিও, যে বকুল ফুলের মালা কাঁচর চুলে বাঁধে। কুঙ্কুমে মেজে সরু পৈতা পরে।' এ তো দেখছি নিমাইয়ের রূপের বর্ণনা! তার পরেও দেখছি, দৈবে লক্ষ্মী একদিন গঙ্গাস্নানে গেছে। নিমাই সেখানে উপস্থিত। নিজের লক্ষ্মীকে চিনে গৌর হাসে। লক্ষ্মীও মনে মনে গৌর বন্দনা করে। 'হেন মতে দোঁহা চিনি দোঁহা ঘর গেলা।'…

কিন্তু আর এক স্থানে তো দেখছি, ব্যাপার অনেক দূর গড়িয়েছে। গঙ্গার ঘাটে লক্ষ্মীর পূজার সময় নিমাই উপস্থিত। দুজনে দুজনকে দেখে মনে মনে উল্লসিত। নিমাইয়ের যা চরিত্র আর মুখের বুলি। লক্ষ্মীকে বলল, 'আমিই মহেশ্বর, আমাকে পূজা কর, তোমার অভীপ্সিত বর আমি দেব।'

লক্ষ্মী অমনি নিমাইয়ের 'অঙ্গে দিল পুষ্পচন্দন/মল্লিকার মালা দিয়া করিলা বন্দন।' কবির ভাষায় এ হল 'সাহজিক প্রীতি'। কিন্তু এ যে একেবারে গান্ধর্ব বিয়ে হয়ে গেল! লক্ষ্মীর সাহস কম নয়! লক্ষ্মীকে আমরা বারো বছরের বালিকা দেখছি বটে। বারো বছরের বালিকা নিতান্ত বালিকা নয়। প্রেমরস

তার মনে। অবশ্য এটা ঘটেছে আরও অল্প বয়স থেকেই, নিমাই দর্শনে।

ঐতিহাসিকরাই বলছেন, প্রতিভাসম্পন্ন বালকদের অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই বিয়ে করবার ইচ্ছা প্রকাশ পায়। নিমাই সম্পর্কে কথাটা বর্ণে বর্ণে খাটে। কারণ তার এগারো বছর বয়স থেকে ষোল বছর বয়সের মধ্যে কবিরা যদিও মাত্র দু'বার দেখা করিয়েছেন, নিমাই কিন্তু তার মধ্যেই সব স্থির করে বসেছে। লক্ষ্মীকে সে বিয়ে করবে। সে বসে থাকবার পাত্র নয়। সে বনমালী আচার্যকে ঘটকালি করবার জন্য মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিল। বনমালীও ঘটকালি করতে রাজি হয়ে, শচীদেবীর কাছে গেলেন। তারপর এ কথা সে কথার পরে বললেন, 'ছেলে তো বড় হল, বিয়ের কথা কেন চিন্তা করছ না দেবী ?'

শচী বললেন, 'ছেলে আমার পিতৃহীন। আগে জীবনধারণের ব্যবস্থা করুক, তারপরে বিয়ের কথা ভাবা যাবে। এখনই কি ?'

বনমালী বিরস মুখে গাত্রোত্থান করলেন। জানতেন না, নিমাই তাঁকে পাঠিয়ে বাইরে রাস্তায় অপেক্ষা করছে। সে বনমালীকে আসতে দেখে মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করল, 'কি খবর ?'

বনমালী বললেন, 'তোমার মায়ের এখন বিয়েতে মত নেই।'

নিমাই হাসতে হাসতে বাড়ি ঢুকল। নিজে থেকেই কথা পাড়ল, 'বনমালী আচার্যকে কি উত্তর দিলে ? মনে হল সে তোমার কাছে কোন কথা বলতে এসেছিল, কিন্তু কথা বলে খুশি হয়নি। কেমন যেন বিমনা।'

শচী বললেন, 'সেএক কথাহয়েছে। কেন, বনমালী তোমাকে কিছু বলেছে ?'

নিমাই বলল, 'বনমালীর মন খারাপ দেখে আমারও মন খারাপ হল। তাকে সন্তুষ্ট করলেই পারতে।'

কথায় বলে, তুমি আমার পেটের ছাঁও, আমারে খাইতে চাও ? শচীদেবীও যথেষ্ট সুচতুরা। মুহূর্তেই বুঝে নিলেন, বনমালী নিজের থেকে আসেনি, ওকে নিমাই পাঠিয়েছিল। ইঙ্গিত বুঝতে পেরেই তিনি আর দেরী করলেন না। পরের দিনই লোকপাঠিয়ে তিনি বনমালীকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, 'তোমার কথা আমি বুঝেছি। যা বলতে এসেছিলে, আর দেরী না করে তাড়াতাড়ি তার ব্যবস্থা কর।'

বনমালী খুশি হয়ে বল্লভাচার্যের কাছে গিয়ে শচীর বক্তব্য হিসাবে কথা পাড়লেন। শুনে বল্লভাচার্য বললেন, 'নিমাই রীতিমত পণ্ডিত, সুদর্শন, সৎ পিতামাতার ছেলে। এ তো আমার মেয়ে লক্ষ্মীর ভাগ্যের কথা। কিন্তু আমি গরীব ব্রাহ্মণ, নির্ধন মানুষ। কী দিয়ে বিয়ে দেব ? কন্যা তো বড় হয়ে যাচ্ছে।'

বনমালী বললেন, 'প্রস্তাব ছেলের মায়ের। আপনি যা হাতে তুলে দেবেন, তাতেই বিয়ে হবে।'

বল্লভাচার্য বললেন, 'পাঁচটি হর্তুকি ছাড়া, দেবার আমার আর কিছুই নেই।'

বনমালীর মুখের কথা শুনে, শচীদেবী তাতেই রাজি হলেন। কেনই বা হবেন না? এ তো আর সত্যি সম্বন্ধের বিয়ে নয়। ভালোবাসার বিয়ে। এতে যৌতুকের প্রসঙ্গ আসবে কেন? এজেই বা শুনছে কে?

লেগে গেল নিমাইয়ের সঙ্গে লক্ষ্মীর বিয়ে। সংসারের কি বিচিত্র রূপ! ষোল বছর বয়সে বিশ্বরূপ বিয়ের কথা শুনে সন্ন্যাস নিয়েছিল। নিমাই ষোল বছর বয়সে প্রেমে পড়ে বিয়ে করল।

দশ



নিমাইয়ের বিয়ে। নাগরীরা এলো বিয়ে দেখতে। কে জানত, এতকাল সকল নবদ্বীপ নাগরীরা নিমাইকে দেখে মনে মনে মজেছিল? রমণীরা কেউ বাড়ির ভিতরে যাবার জন্য ব্যাকুল। কেউ বলে, নিমাইকে দেখতে না পেলে গঙ্গায় ডুবে মরব। আবার কেউ বলে, ওলো সখি, আমার গা কাঁপছে!

যুবতীদের মধ্যে কেউ কেউ তো নিমাইকে দেখে এমন কথাও বলল, 'ভগবান কুলের ঝি করেছে। এখন তো স্বতন্ত্র হয়ে কিছু করতে পারি না। লাজে ভয়ে পরাণ যায়। মদনের জ্বালায় মরি! কাকেই বা এ কথা বলি। বললে জাতকুলশীল থাকে না।'

এ সব রমণী যুবতীরা কম সুন্দরী নয়। এদের হাসিতে দামিনী কাঁপে। কথায় সুধা ঝরে। সকলেই জল সইতে হেসে ঢলে চলেছে। ইচ্ছা করলে এরা মুনির প্রাণও হরণ করতে পারে।

এ সব হল মনের ভাব। কেমন? মনে মনেই সবাই ভাবছে, আসলে সত্যিই কি তাই? না কি কেবল যুগের কবিকল্পনা? যেমন কোন বধূ নিমাইয়ের অঙ্গ মার্জনা করতে গিয়েই অবশ হয়ে পড়ল। কেউ হাত ধরেই অবশ। কেউ বুকের কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে থাকে। কেউ নিমাইয়ের দুই পা নিজের বুকে রাখে। কেউ দু

হাতে জড়াতে চায়। কেউ কেবল চিত্রার্পিতের মতো নিমাইয়ের রূপ দেখছে। কেউ নিমাইয়ের মাথায় জল দেয় 'মদন তরঙ্গে'। কেউ পাগলের মতো হাসে। নিমাইয়ের রূপ তাদের সতীত্ব নাশ করল।

ঈর্ষাও কি কোন রমণীর মনে হল না? হল বৈকি। ভাবল, লক্ষ্মী নিমাইয়ের এই শরীর নিয়ে বিলাস করবে। আমরা কবে সেই স্পর্শ পাব? কারণ কি? নিমাইয়ের নয়ন শরাঘাতে, মানিনীদের প্রাণমৃগ বিপথে পালায়।

এ তো গেল বিয়ে ও নাগরী বিলাস। তারপরে ডুলি বা পালকিতে চেপে, নিমাই লক্ষ্মীকে নিয়ে বাড়িতে এলো। শাঁখ খই উলুর কলরব। শচী পুত্রবধূকে বরণ করতে গিয়ে, নিমাইয়ের দিকে তাকিয়ে বধূকে চুম্বন করেন। আর বধূর দিকে তাকিয়ে নিমাইকে চুম্বন করেন।

নিমাই সুখী, লক্ষ্মীকে নিয়ে সংসারযাত্রা বড়সুখের। কেননা, সে যে লক্ষ্মীকেই চেয়েছিল। সংসারের অভাবও কমল। কারণ, নিমাই এখন তরুণ অধ্যাপক। অধরে তাম্বুল, দিব্য পরিধান বাস। সহস্র ছাত্র সঙ্গে নিয়ে চলে, দেখে মনে হয় যেন পণ্ডিত বৃহস্পতি চলেছেন। তবে পরিহাস মূর্তিটি ঠিকই আছে। বিশেষ করে, অধ্যাপক পণ্ডিতদের দেখলেই কূট তর্কে আহ্বান করে। এই অভ্যাসটি সহজে যাবার নয়। দেখে কৃষ্ণভক্তরা বেশ নিরাশ আর বিমর্ষ। নিমাই কেবল বিদ্যাচর্চাই করে। কৃষ্ণে তার ভক্তি নেই। মিশ্রের সন্তান হয়ে, এ আবার কেমন কথা?

কেউ কেউ বলেই ফেলেন, 'এত বিদ্যার বল নিয়ে কি করবে? এতে কি কাল বশ মানবে?'

নিমাই সে কথায় আদৌ কান দেয় না। মুকুন্দ এবং অন্যান্য ভাগবতগণ অদ্বৈতর বাড়িতে একত্র হন। মুকুন্দ সেখানে কৃষ্ণ সঙ্গীত করেন। তাও ভয়ে ভয়ে। পাষণ্ডীরা টের পেলে হৈ হৈ করে ছুটে আসবে। তার ওপরে নিমাই আবার মুকুন্দের পিছনে লাগে। বৈষ্ণবদের দেখলেই কূট তর্ক জুড়ে দেয়, যাকে বলে 'ফাঁকি', 'ফাঁকি' জিজ্ঞেস করে।

কিন্তু বৈষ্ণবরা তর্ক করেন না। কূট তর্কেও তাঁদের ভয়। অথচ নিমাই ছাড়বার পাত্র নয়। মুকুন্দকে দেখলেই সে 'ফাঁকি' জিজ্ঞেস করে। শ্রীবাসকেও ছাড়ে না। অবস্থা এমন দাঁড়াল, বৈষ্ণবরা নিমাইকে দেখলেই, 'ফাঁকি' জিজ্ঞাসার ভয়ে দৌড়ে পালিয়ে যান।

মুকুন্দ গঙ্গা-স্নানে যাচ্ছেন। হঠাৎ চোখে পড়ল, নিমাই আসছে। অমনি দৌড়।

নিমাই বলে, ও ব্যাটা আমাকে দেখলেই পালায় কেন ?.

অন্যান্যরা বলে, 'তুমি ঠাকুর যে রকম "ফাঁকি" জিজ্ঞেস কর, তাতে না পালিয়ে উপায় কি ?'

নিমাই মনে মনে হাসে, আর মনে মনেই বলে, 'আমি টীকা বুঝি, কলাপ ব্যাকরণ কাব্য নাটক, ন্যায় স্মৃতি, কূট শাস্ত্রের খণ্ডন জানি। কৃষ্ণকথা আমার দ্বারা হয় না। আমার মুখে কৃষ্ণ নাম শুনতে চায় কেন ? সেইজন্যই ব্যাটারা আমাকে দেখলে পালায়।'

নিমাই যে কৃষ্ণভক্ত নয়, এটা তার কথাতেই বোঝা যাচ্ছে। সংসারের মায়ামমতা আর কাকে বলে ! মনস্তাত্ত্বিকেরা এই জন্যই মানুষের অবচেতনের ওপর তার বিকাশ ও কার্যকলাপের ওপর বিশেষ জোর দিয়ে থাকেন। ষোল বছরের সুপুরুষ অনিন্দ্যসুন্দর অধ্যাপকটিকে দেখলে, কে বলবে, কৃষ্ণনাম যার মুখে নেই ভবিষ্যতে সে কি হবে। সে প্রিয়তমা লক্ষ্মীকে নিয়ে মশগুল, আর ছাত্রদের নিয়ে শাস্ত্র পাঠে ব্যস্ত। বৈষ্ণব দেখলেই পিছনে লাগে, মজা পায়।

নিমাইয়ের মতো অন্যান্য ব্রাহ্মণরাও বৈষ্ণবদের সমালোচনা করে। আসলে নিমাইয়েরই কথা, 'কীর্তন মানে পরিহাস'। সবই পেট পূজোর ব্যাপার। এদের জ্ঞানযোগ নেই, খালি হাত তুলে নেত্য কেত্য। ভাগবত পাঠ করলেই হাত তুলে নাচতে হবে ?'

শ্রীবাসকে দেখলে বলে, 'ধীরে ধীরে কৃষ্ণনাম করলে কি পুণ্য হয় না ? নেচে কেঁদে ডাক ছাড়তে হবে কেন ?'

অদ্বৈত এ সব শোনেন, কিন্তু নিমাইয়ের নামে কিছু বলেন না। অন্যান্যদের বলেন, 'সব ব্যাটা পাষণ্ডী। এদের সংহার করা উচিত। সবাইকে আমি 'কৃষ্ণ' নয়নগোচর করাব।'

এ সব ঘটনা যখন চলছে, তখন মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য ঈশ্বরপুরী অদ্বৈতর বাড়ি এসে উঠলেন। সেখানে নিত্য নামগান সংকীর্তন হয়। স্বয়ং নিত্যানন্দও মাধবেন্দ্র পুরীকে 'গুরুবুদ্ধি' করতেন। নিমাই একদিন ছাত্র পড়াতে যাচ্ছে, পথে ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। সে দেখল, আচার্য গোপীনাথ ভিক্ষুকবেশী ঈশ্বরপুরীকে নিজের গৃহে মহা সমাদরে নিয়ে যাচ্ছেন। ঈশ্বরপুরী গোপীনাথের ঘরে মাস কয়েক থাকলেন। অনেকেই তাঁকে দেখতে চায়। নিমাইও যায়। বাড়িতে গিয়ে লক্ষ্মীকে বলে, 'এ মানুষটিকে আমার ভালো লাগে। সে নিজেকে শূদ্রাধম বলে বটে, কিন্তু পণ্ডিত ব্যক্তি।'

ঈশ্বরপুরী একদিন সুযোগ বুঝে নিমাইকে বললেন, 'আমি একটা 'কৃষ্ণচরিত' পুঁথি লিখেছি। তুমি পণ্ডিত অধ্যাপক, আমার পুঁথিটি পড়ে একটু দেখে দাও, কোথায় কি ত্রুটি আছে।'

নিমাই পুঁথিটি নিয়ে গিয়ে পড়ল, কিন্তু বিদ্রূপ করল না। পড়ার পরে পুঁথি ফিরিয়ে দিয়ে বলল, 'আপনি ভক্ত, জনার্দনও ভাবগ্রাহী, আপনার বর্ণনায় কোন দোষ নেই।'

পরে একদিন ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে ব্যাকরণ নিয়ে তর্ক হল। তর্কের কূট বিষয়ের মধ্যে, ঈশ্বরপুরী বললেন, 'বেশ, ভালো কথা, কিন্তু ভাই, যে ধাতুকে তুমি পরস্মৈপদী বললে, আমি তাকেই আত্মনেপদী বলে সাধন করছি।'

নিমাই নির্বাক ! ঈশ্বরপুরীর এ কথার প্রতিবাদের ভাষা সে খুঁজে পেল না। শাস্ত্রীয় তর্কে এই সে প্রথম পরাজয় মেনে নিল। এর ফলস্বরূপ, নিমাই প্রায়ই ঈশ্বরপুরীর কাছে এসে শাস্ত্রালাপ করতে লাগল। কিছু দিন পরে ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপ থেকে দেশান্তরে চলে গেলেন। কিন্তু অলক্ষ্যে কি কেউ হাসলেন ? নিমাইয়ের অবচেতনে যে বিরাট এক পরিবর্তন ঘটে গেল, ইতিহাস তা দেখল, কাছের মানুষ কেউ বুঝল না।

কিন্তু তার মানে এই নয়, নিমাই বৈষ্ণবদের দেখে 'ফাঁকি' জিজ্ঞাসা বন্ধ করল। মুকুন্দ, গদাধর, শ্রীবাস, কেউ রেহাই পেলেন না। তাঁরা মনে মনে দুঃখ করে বলেন, 'এত বড় পণ্ডিত যুবক, অথচ কৃষ্ণের নাম নেয় না !'

নিমাইয়ের এটিই যেমন বৈশিষ্ট্য, তেমনি এটাও আবার লক্ষণীয়। শ্রীবাস ইত্যাদিদের দেখলেই নমস্কার করে। তাঁরা আশীর্বাদ করেন, 'কৃষ্ণে ভক্তি হোক।'

নিমাইয়ের চরিত্রে আর একটি বিষয় বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় সে মোটেই ঘরকুনো অধ্যাপক মানুষ নয়। নবদ্বীপের পাড়ায় পাড়ায় বাড়ি বাড়ি সে যায়, কথাবার্তা বলে। তাঁতী, গোয়ালা, বেনে, মালাকার, তাম্বুলি, শঙ্খবণিক, নগরের হেন পাড়া ঘর নেই, যেখানে সে যায় না। নবদ্বীপের সকল স্তরের মানুষকে জানবার দেখবার একটা মনোভাব তার বেশ প্রবল। এটিও যে ভবিষ্যতের একটি লক্ষণ, তা অনেকেই খেয়াল করছে না। সকল মানুষের সঙ্গে তার ভাব। অন্য দিকে তার ছাত্রসংখ্যাও বাড়ছে। বিদেশের ছেলেরা এসে তার কাছে পড়তে চায়।

আবার একটি ঘটনা ঘটল। মস্ত এক পণ্ডিত নবদ্বীপে এসে হাজির। দিল্লী, কাশী, গুজরাট, বিজয়নগর ইত্যাদি জয় করে পণ্ডিত নবদ্বীপে এসে হাজির হল। এসো, কে আছ, আমার সঙ্গে শাস্ত্রীয় কূট তর্ক করবে।

নিমাই বলল, 'আমি আছি, এসো।'

পণ্ডিতের ধারণা ছিল, নিমাই শিশুশাস্ত্রে ব্যাকরণ পড়ায় মাত্র। এক কোপেই তাকে শেষ করা যাবে। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত গঙ্গার একটি মহিমা স্তব তৈরি করে দ্রুত বলে গেলেন। নিমাই হেসে বলল, 'এ কি পণ্ডিত, এ সব তো শব্দের অলংকার মাত্র, তোমার আদি মধ্য অন্তঃ তিন স্থানেই, গঙ্গার মূল ব্যাখ্যা কোথায়? অলংকার দিয়ে ভোলাবে?'

পণ্ডিত ভাবতে পারেননি, শিশু ব্যাকরণের শিক্ষক, তাঁর অলঙ্কারের দোষ আবিষ্কার করবে, তিনি পরাভব মানলেন। নবদ্বীপে নিমাইয়ের প্রশংসায় ধন্য ধন্য পড়ে গেল। বাড়িতে লক্ষ্মীর আনন্দের সীমা নেই। একে প্রেমিক স্বামী, তার ওপরে এমন গুণী। লক্ষ্মীর অন্তরে বড় সুখ।

নিমাইও সুখী। লক্ষ্মীর ওপর পরম নির্ভর। এখন আর কথায় কথায় মায়ের কাছে ছোটে না। বরং লক্ষ্মী শাশুড়ির সেবা করে। শচীদেবীও সুখী। তা ছাড়া আজকাল নিমাইয়ের একটা পরিবর্তন দেখা যায়। সাধু সন্ন্যাসী অতিথি এলেই তাঁদের সেবা করে। লক্ষ্মীকে বলে, 'তোমার ওপর সব ভার, অতিথিদের সেবা কর।'

লক্ষ্মী বলে, 'তুমি কিছু ভেবো না, আমি সব করব।

লক্ষ্মী নিজে বিষ্ণুপূজা করে। শাশুড়ির সেবা করে। স্বামী-সঙ্গে তার প্রণয় অতি গভীর। নিমাই মনে মনে লক্ষ্মীর কথা সব সময়েই চিন্তা করে। আসলে সর্বদাই নয়, সুখী স্বামী হিসাবে লক্ষ্মী-অন্ত প্রাণ।

নিমাই এখন অধ্যাপক শিরোমণি। সময়টাও ইতিহাসের দিক থেকে কিছুটা স্বস্তিকর। গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহ তেমন অত্যাচারী নন। নিমাইয়ের ইচ্ছা হল, পূর্ববঙ্গে যাবে। এর মধ্যে তার দুটি ইচ্ছা প্রকাশ পেল। একটি নিজেদের দেশ শ্রীহট্ট দর্শন। অন্যটি অর্থ উপার্জন। নিজেই সে বলছে, 'অর্থ না হলে চলে না, আমি উপার্জনের জন্যই পূর্ববঙ্গে যেতে চাই।'

আসলে পূর্ববঙ্গে নিমাইয়ের অধ্যাপনার খ্যাতি আগেই প্রচারিত হয়েছিল। হোসেন শাহর আমলেই এই পশ্চিমের বিদ্যা পূর্বে চলাচল শুরু হয়েছিল। যাবার আগে সে মাকে বলল, 'আমি আমার শিষ্যদের নিয়ে প্রবাসে যাব মা, ধনরত্ন নিয়ে আসব।'

লক্ষ্মী অন্তরালে দাঁড়িয়ে স্বামীকে দেখছিল। নিমাই তার কাছে গেল। বলল, 'লক্ষ্মী, আমি প্রবাসে যাচ্ছি। মায়ের সেবার ভার তোমার ওপর। সেইজন্য

আমার একটা অনুরোধ, আমি ফিরে আসা না পর্যন্ত তুমি বাপের বাড়ি যেও না। এবার তুমি কি চাও বল।'

লক্ষ্মী বলল, 'আমি কি চাইব গো? বাড়িতে তোমার পাদুকা আছে, তাই পূজা করব। আর মনে মনে প্রার্থনা করব, তুমি সার্থক হও, তাড়াতাড়ি আমাদের কাছে ফিরে এসো।'

নিমাই দেখল, লক্ষ্মীর চোখে উদ্গত অশ্রু। তাকে ছেড়ে যেতে নিমাইয়ের প্রাণে বড় কষ্ট। তবু সে বাস্তববাদী। অপ্রতুল সংসারে প্রতুলতা আনতে হবে। উপার্জন চাই। নিমাই নিজের গলা থেকে যজ্ঞোপবীত খুলে লক্ষ্মীর হাতে দিয়ে বলল, 'লক্ষ্মী, এর থেকে বড় কিছু তো আমার নেই। এই স্মৃতি নিয়ে তুমি কালযাপন কর। আমি কাজ শেষ হলেই ফিরে আসব। আমার জন্যে অপেক্ষা করে থাক।'

স্বামীর যজ্ঞোপবীত, স্বামীর কাছে এক অমূল্য ধন। সে নিমাইয়ের পায়ে কপাল-কপোল স্পর্শ করে চোখের জলে বিদায় দিল।

নিমাই শিষ্যবর্গসহ পূর্ববঙ্গে যাত্রা করল। এই প্রথম, যাবার আগে, বৈষ্ণব শ্রীবাস পণ্ডিতকে বলল, 'আমার মা বউকে একটু দেখো।'

নিমাই পূর্ববঙ্গে জগৎ জয় করে চলেছে। সে শ্রীহট্টে গেল। পদ্মার তীরে তীরে গ্রামে গ্রামে গেল। সবাই একবাক্যে বলল, 'এ যে স্বয়ং বৃহস্পতি! আমাদের কি ভাগ্য!'···শত শত শিক্ষার্থীকে নিমাই বিদ্যাদান করল। সকলেই দু হাত ভরে নিমাইকে দিল ধনরত্ন।

এদিকে নবদ্বীপে দেখুন। নিমাই যখন অশেষ ধন অর্জন করছে, লক্ষ্মী তখন স্বামীর উপবীত মালা-চন্দনে পূজা করছে। উপবীতে স্বামীর স্পর্শ, পাদুকায় স্বামীর স্পর্শ। আবার কাঠের পাটায় নিমাইয়ের মূর্তি আঁকারও চেষ্টা। সব সময় যে প্রাণ 'নিমাই নিমাই' করছে। নিজের বুকে রক্ষিত মূর্তিকে তাই কাঠের বুকে এঁকে দেখতে ইচ্ছা করে।

ইতিহাস অনেক সময় ভুল পথে, আবেগের দ্বারা চালিত হয়। তাই প্রচলিত বিশ্বাস, বিষ্ণুপ্রিয়া বুঝি নিমাইয়ের বিগ্রহচিত্র পূজা করেছিল। আদৌ তা নয়। লক্ষ্মী প্রথম বিরহিণী কিশোরী প্রেমিকা বধূ, যে স্বামীর মূর্তি রোজ পূজা করে। রোজ মূর্তি আঁকে, আর রোজই হরিদ্রাবসনে ঢেকে রাখে। মনে মনে ডাকে, 'ওগো, কবে আসবে তুমি। এ বিরহ আর সইতে পারি নে।'

বিষ্ণুপ্রিয়া আসলে লক্ষ্মীকেই অনুকরণ করেছিল।

অধ্যাপক নিমাই অর্থোপার্জন করছে, বিরহিণী কিশোরী লক্ষ্মী স্বামীর মূর্তি

আঁকছে। স্বামীর ব্যবহৃত যা পায়, তাই বুকে নিয়ে থাকে। গায়ে মুখে মাথে, জড়ায়। বড় কষ্ট গো প্রভু, কবে আসবে তুমি ?…

এই আহ্বানে নিমাই এলো না। এলো এক ভয়ঙ্কর শমন। একদিন রাত্রে শাশুড়ির পাশে শুয়ে লক্ষ্মী নিদ্রা যাচ্ছে। শেষ রাত্রে এক কালসাপ ঘরে ঢুকে লক্ষ্মীর ডান পায়ে দংশন করল। লক্ষ্মী যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল। দেখল, কালসাপ তাকে দংশন করে চলে যাচ্ছে। শাশুড়িকে বলল, 'মাগো, বিষের জ্বালায় প্রাণ যায়, চোখে যে কিছুই দেখিনে !'

শচীদেবী তাড়াতাড়ি লক্ষ্মীর বাবা মা আত্মীয়স্বজনকে ডেকে আনলেন। ওঝা ধন্বন্তরী এলো। কিন্তু বিষ নামানো গেল না। শচীর কাছে নিমাই নেই। লক্ষ্মী বিষে জরজর, মৃত্যু সন্নিকটে। বউমাকে বুকে জড়িয়ে চুমো খেয়ে কেঁদে উঠলেন, 'ওগো মা, আমাকে ছেড়ে কোথা যাস। নিমাইকে আমি কি বলব ?'…

লক্ষ্মী যন্ত্রণাকাতর অস্ফুটস্বরে বলল, 'মা, ঘরে মরতে পারব না, আমাকে গঙ্গার ঘাটে নিয়ে চল। কিন্তু সবার আগে, আমার স্বামীর পৈতা আমার গলায় জড়িয়ে দাও। সে যে যাবার আগে আমাকে তার উপবীত দিয়ে গেছে।'

শচী ছুটে গিয়ে নিমাইয়ের পৈতা এনে পরিয়ে দিলেন লক্ষ্মীর গলায়। লক্ষ্মীর চোখে তখন গঙ্গার ঘাটে নিমাইয়ের দর্শন প্রেম আলাপন, বিয়ের আগেই মালা পরিয়ে দেওয়া, সেই সব স্মৃতি জেগে উঠছে। মনে মনে বললেন, 'ওগো, এ তো সাপের দংশন নয়, তোমার বিরহই সর্পরূপে দংশন করল। হায়, তোমাকে যে আর দেখতে পাব না !'…

নিমাই আরো কিছুকাল বাদে ফিরে এলো। নিয়ে এলো বহু ধনরত্ন। সুবর্ণ, রজত, জলপাত্র, দিব্যাসন, সুরঙ্গ কম্বল, নানাবিধ ধনরাজি মায়ের পায়ে রেখে, প্রণাম করে বলল, 'মা, তোমার জন্য এ সব নিয়ে এসেছি।'

নিমাই মুখে না বললেও, মনে মনে জানে, লক্ষ্মী আড়ালে আড়ালে কোথাও আছে। সবই দেখছে, সবই শুনছে। সে মাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বাঙালদের ভাষা উচ্চারণ করে পরিহাস করল। শ্রীহট্টের গল্প করল অনেক।

শচীদেবী সবই শুনলেন, কিন্তু কাছে থাকতে পারলেন না। উদ্‌গত কান্না চেপে ঘরের মধ্যে চলে গেলেন। দিগ্বিজয়ী নিমাইকে দেখতে আরও অনেকে এসেছে। কিন্তু সকলেই কেমন যেন গম্ভীর বিষণ্ণ।

নিমাই একটু যেন বিচলিত হল। মাকে ডেকে বলল, 'মা, তুমি ঘরে কেন ?

তোমার মুখে হাসি নেই কেন? কী হয়েছে?'

কেউই জবাব দিতে সাহস পায় না। এমন আনন্দের দিন, অথচ নিরানন্দে ভরা। শেষ পর্যন্ত একজন ব্রাহ্মণ বললেন, 'পণ্ডিত, তোমার পত্নী গঙ্গাপ্রাপ্ত হয়েছেন!'

'গঙ্গাপ্রাপ্ত!' নিমাই যেন আর্তনাদ করে উঠল।

শচীদেবী বেরিয়ে এসে, সর্পদংশনের কথা বললেন। নিমাই পাথরের মূর্তির মতো স্থির। যেন দেহে প্রাণ নেই। অনেকক্ষণ মাথা হেঁট করে রইল। মাত্র দুটি বছর। লক্ষ্মী, কোথায় গেলে আমাকে ছেড়ে? বুক ফাটছে, কিন্তু মুখে উচ্চারণ করল, 'মাগো, সংসার অনিত্য!' একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, 'হায়, কোথায় আমি, কোথায় লক্ষ্মী, কোথায়ই বা এই অর্থ? এ যে সকলই অনর্থ মা! মানুষের জীবন পদ্মপত্রে জল। নইলে লক্ষ্মী কেন আমাকে ছেড়ে যাবে?'

কে জবাব দেবে এ কথার? সকলের চোখে জল। নিমাই আত্মসঙ্গোপনে তখন জীবনের কথা ভাবছে। মনে মনে বলল, 'লক্ষ্মী, সংসার অনিত্য, কেউ কারো নয়। তুমিই সেই জ্ঞান দিয়ে গেলে। তুমি নেই, এবার তবে কার অন্বেষণ করব?

সেই অন্বেষণের কথা ইতিহাসের পরবর্তী অধ্যায়। তবে নিমাই অন্তর থেকে এই প্রথম শ্রীচৈতন্য রূপ ধারণ করল, এই গভীরতর বিকাশ কেউ দেখতে পেল না। সংসার অনিত্য বটে, প্রেম নিত্য। এবার সেই নিত্য প্রেমের লীলা।

আঘাত মানুষকে মহৎ করে, মহত্ত্বের পথ চিনিয়ে দেয়।

প্রেম-নিত্য
অনিত্য সংসার



এক



পাঁচশো বছরের অতীত ইতিহাসের পথযাত্রায়, ইতিপূর্বেই নবদ্বীপ নগরের স্থান কাল পাত্র পাত্রী সমাজ ভৌগোলিক বিবরণ কিছু-কিঞ্চিৎ দর্শন করেছি। এই কালের পাঠান-রাজের রাজনীতি, রাজ্য পরিচালনা, কিছু কিছু প্রত্যক্ষ করেছি। হিন্দু সমাজের দুর্গতি দেখেছি। নীলাম্বর চক্রবর্তীর দৌহিত্র নিমাইয়ের জন্ম থেকে, তার বাল্যলীলা, চপলতা, দুরন্তপনা, যে সব দেখে কৌতুকবোধ করেছি। লক্ষ্মীর সঙ্গে তার প্রেম, নিজেই মায়ের কাছে ঘটক পাঠিয়ে বিয়ের প্রস্তাব, তারপরে বিয়ে। কিছুই আজ আর অজানা নেই। এই প্রেম ও বিয়ের মধ্যে দুটি দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। পরিবারের পক্ষে সেটি মর্মন্তুদ। বিশেষ করে নিমাইয়ের মা শচীদেবীর কাছে। এক : পুত্র বিশ্বরূপের সন্ন্যাস গ্রহণ। দুই : নীলাম্বর চক্রবর্তীর পরলোকগমন।

এ দুটি ঘটনা দুরন্ত নিমাইয়ের প্রাণেও আঘাত করেছিল। লেখাপড়ায় মন দিয়ে, টোলে গিয়ে অধ্যাপনা শুরু করেছিল। কিন্তু সব থেকে বড় ঘটনা, নিমাইয়ের সঙ্গে লক্ষ্মীর প্রেম। পুরুষ হিসাবে নিতান্ত নারীর প্রতি যে আকর্ষণ, ভবিষ্যতের চৈতন্য মহাপ্রভু, নিমাইয়ের সঙ্গে লক্ষ্মীর সেই প্রেমই ঘটেছিল। আমি গঙ্গার ঘাটে নিভৃতে লক্ষ্মীর সঙ্গে নিমাইয়ের সেই প্রেমলীলা দেখেছি। দেখেছি লক্ষ্মীর সঙ্গে তার বিয়েও। নিমাই যে তখন পরম সুখী সংসারী, কোন সন্দেহ নেই। তা ছাড়া সে তখন অধ্যাপক শিরোমণি। অনেকে তার শিক্ষা-দীক্ষা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করলেও, সে প্রমাণ করে দিয়েছিল, সর্বভারত-দিগ্বিজয়ী এক পণ্ডিতকে পরাস্ত করে।

সুখের ও শান্তির সংসার। অভাব আছে। কিন্তু লক্ষ্মীকে নিয়ে, সামান্য জীবনেই গভীর শান্তিও ছিল। তবু, মন তো মানে না। নিমাই গেল পূর্ববঙ্গে, অধ্যাপনা করতে। ধন উপার্জন করতে হবে। তার ষোল বছর বয়সে লক্ষ্মীর সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল। খৃষ্টাব্দের হিসাবে সেটা ১৫০১ খৃষ্টাব্দ।

নিমাই বরাবরই নিজে যা বিশ্বাস করত, তাই করত। পরের কথায় চলা তার ধাতে ছিল না। তার ছেলেবেলা থেকেই, নবদ্বীপে বৈষ্ণবদের একটা

আন্দোলন চলছিল। তাঁদের সকলের ধারণা ছিল, বিশ্বাসও ছিল, নীলাম্বর মিশ্রের ছেলে, বিশ্বম্ভর বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করবে। কিন্তু গ্রহণ করা দূরের কথা, সে বৈষ্ণবদের দেখলেই, শাস্ত্রীয় ফাঁকির কথা জিজ্ঞেস করে নাকাল করত। সে সব ঘটনা আমি আগেই লক্ষ করেছি। এখন আর তার পুনরুল্লেখের দরকার নেই। মোট কথা, সে কৃষ্ণ-কথার আদৌ ভক্ত ছিল না, বরং বৈষ্ণবদের বিদ্রূপ করত। অবশ্য এর মধ্যে নবদ্বীপে ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে একবার তর্ক করতে গিয়ে নিমাই পরাজয় মেনে নিয়েছিল। কিন্তু তার মধ্যে নিমাইয়ের অন্তঃকরণে গভীর কোন ভাবের পরিবর্তন হয়নি। তবে, অবচেতন মনে সর্বদাই গ্রহণ বর্জন চলে। ঈশ্বরপুরীর ভক্তিকথা নিমাইয়ের অবচেতনে গাঁথা হয়ে ছিল। বাইরে থেকে তা বোঝা যায়নি। যে মানুষ কখনও নিজের বিশ্বাস ও যুক্তি ছাড়া চলে না, তার পক্ষে একজনের কাছে তর্কে পরাজয়, একটি বিশেষ ঘটনা।

লক্ষ্মীকে বিয়ের পরে, নিমাই কিছুকাল নবদ্বীপে অধ্যাপনা করেছিল। এটিও আবার পুনরুক্তি হচ্ছে। সেই সময়েই বৈষ্ণবদের প্রতিও তার অবজ্ঞাই দেখা গেছে। আসলে, সমস্ত অন্তর জুড়ে, শ্রীরূপা লক্ষ্মী। মুখে সে কিছুই বলে না। অন্তরটি ভরে থাকত লক্ষ্মীর জন্য। লক্ষ্মী শাশুড়ির দেখাশোনা করছে। স্বামী তো এক বিচিত্র ব্যক্তি। দশ বিশ যতজন সাধু-সন্ন্যাসীই হোক, তার সমীপে এলেই, লক্ষ্মীর কাছে খবর, সকলের খাবার ব্যবস্থা কর। এমন প্রাণখোলা হৃদয়বান স্বামীই তো লক্ষ্মী চেয়েছিল।

একদিনের কথা তো নয়। নিমাই দশ বছর থেকেই লক্ষ্মীকে দেখে মুগ্ধ। অবশ্য আমি আগেই দেখেছি, গঙ্গার ঘাটে মেয়েরা স্নানে গিয়ে, যে সব পূজার সরঞ্জাম ঘাটে সাজিয়ে রেখে যেত, নিমাই সে সব নৈবেদ্য ফল ইত্যাদি নিজেই খেয়ে ফেলত। পরিষ্কার কথা, মেয়েদের পিছনে লাগত। পিছনে লাগা তার স্বভাব ছিল। ব্রাহ্মণ গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে তর্পণ করছে, নিমাই জলে ডুব দিয়ে তার কাপড় টেনে খুলে নিয়ে যেত। বাবা বাছা করে, নগ্ন ব্রাহ্মণকে সেই কাপড় চেয়ে নিয়ে লজ্জা বাঁচিয়ে ফিরতে হত।

এ সবই পৃষ্ঠপটে দেখেছি। এর অন্তর্নিহিত কথাটিও আমি আগেই জেনেছি। নিমাই প্রথম থেকেই, সেই কালের প্রচলিত ধর্ম ও সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে ছিল। এই অন্তর্নিহিত মানবিক অবস্থাটিকে কি আজকের বিপ্লবীরা, বিপ্লবাত্মক বলবেন? হয়তো এখনই তা বলবার সময় আসেনি। এ বিবেচনার কথা ভবিষ্যতের জন্য তোলা থাক।

নিমাই-লক্ষ্মীর প্রেমের কথাতেই ফিরে আসা যাক। যদিও আমি তা আগেই সব দেখেছি, তবু আর একবার ছবিটার ওপর চোখ বুলিয়ে নিই। দশ বছর বয়স থেকে ষোল বছর প্রেম, তারপর বিয়ে। বিবাহিত জীবন দু'বছরের। অভাবের জন্য এবার পূর্ববঙ্গে গমন। যাবার সময় নিমাই লক্ষ্মীকে বলে গেছল, 'মার কাছেই থেকো।' আর নিজের গলার যজ্ঞসূত্র লক্ষ্মীর হাতে তুলে দিয়ে গেল, 'তোমার জন্য এইটি রেখে গেলাম।'

এই যজ্ঞসূত্র দান একটি অসামান্য ঘটনা। বোঝা গেছল, লক্ষ্মীকে কতখানি ভালবাসত। মোট দু'মাস পূর্ববঙ্গে ছিল। অধ্যাপনা করে, ফিরে এল অনেক ধন উপার্জন করে। তার কোন কোন জীবনীকার বলেছে, পূর্ববঙ্গে গিয়ে সে কেবল সবাইকে কৃষ্ণনাম শিখিয়ে এসেছিল। কথাটার মধ্যে কোন ঐতিহাসিক সত্য নেই। তার ব্যাকরণ টীকা সম্পর্কে পূর্ববঙ্গে ইতিপূর্বেই অনেকের মধ্যে বিশেষ আগ্রহবোধ জেগেছিল। হরিনাম জপ করাতে সে যায় নি। গেছল শিক্ষা দানের জন্যই। অনেককে নানাবিধ পণ্ডিত আখ্যা দিয়ে এসেছিল।

দু মাস. কিন্তু অনেক দিন। লক্ষ্মী এই দু মাস বিরহের কাল সেই গলার যজ্ঞসূত্র, স্বামীর পায়ের খড়ম বুকে নিয়ে পূজা করে কাটিয়েছে। আর কাঠনের ওপর নিমাইয়ের মূর্তি এঁকেছে। শাশুড়ির সেবাযত্ন, সংসার দেখা, সবই করেছে। মনে একজনেরই ধ্যান। শয়নে স্বপনে একজনকেই দর্শন। প্রতীক্ষা, কেবল প্রতীক্ষা দয়িতের জন্য। কিন্তু লক্ষ্মীর সে আশা পূর্ণ হয়নি। ঘরের মধ্যে ঘুমন্ত অবস্থায় কালনাগিনীর দংশনে সে মারা যায়। এ জানা কথাগুলোই আবার কেন বলছি, পরে ব্যাখ্যা করব।

নিমাই বাড়ি ফিরে এল। প্রতিবেশীরা সবাই এল। নিমাই মাকে ডেকে ডেকে দেখাল, সে কী ধন উপার্জন করে ফিরেছে। তার মধ্যেই, স্বভাবসিদ্ধ চরিত্রানুযায়ী, বাঙালদের ভাষা বলে সবাইকে খুব হাসাল। বাঙাল ঘটি ব্যাপারটা প্রায় পাঁচশো বছর আগেও ছিল দেখা যাচ্ছে। নিশ্চয় তার আগেও ছিল। এসব যখন বলছিল, তখনও সে জানত, ঘরের মধ্যে লজ্জাশীলা লক্ষ্মী সবই শুনছে আর উপভোগ করছে।

পূর্ববঙ্গ থেকে নিমাই নবদ্বীপে ফিরে এসেছিল সন্ধ্যার প্রাক্কালে বা সন্ধ্যা-কালে। বিদেশ থেকে এসেছে। ঘরে ঢোকবার আগে, প্রতিবেশীদের নিয়ে গেল গঙ্গাস্নানে। মনে মনে ব্যাকুলতা লক্ষ্মীর জন্য। কখন লক্ষ্মীকে দেখতে পাবে। প্রতিবেশীরা সদ্য প্রত্যাগত আঠারো বছরের প্রেমিক স্বামীকে কেউই লক্ষ্মীর মর্মান্তিক মৃত্যুর সংবাদ দিতে পারছে না। নিমাই বাড়ি ফিরে এলে, শচীদেবীই

তাকে খেতে দিলেন। নিমাই কি এ সময়ে আশা করেনি, মায়ের পিছনে, আশেপাশে, ঘোমটা মাথায় আর একজনকে দেখতে পাবে? চরিতকারেরা সবাই প্রথম থেকেই নিমাইকে অবতার রূপে ভেবে, লিখতে বসেছিলেন। তাঁদের এ সব মানবিক খুঁটিনাটি দেখবার সময় অথবা ইচ্ছেও ছিল না।

কিন্তু আমার ব্যাকুল চোখ সবই দেখতে পেয়েছিল। নিমাইয়ের ব্যাকুল গোপন দৃষ্টি, দুটি আলতা পরা পায়ে আঙটের ঝিলিক দেখতে চেয়েছিল। পায়ের নূপুরের নিক্কণ, হাতের শঙ্খের সঙ্গে চুড়ির ঝনাৎকার শোনবার জন্য, চন্দনলিপ্ত শরীরের আঘ্রাণের জন্য চিত্ত উদ্বেল হয়েছিল। অথচ তার কোনটাই সে পাচ্ছিল না। বরং দেখছিল, মায়ের মুখে ক্রমশই ছায়া ঘনিয়ে আসছে। তিনি নিমাইয়ের খাওয়া হয়ে যাবার পরেও, একটি কথা না বলে ঘরের মধ্যে গিয়ে আত্মগোপন করে রইলেন।

নিমাই তো সহজ পাত্র নয়। মুহূর্তেই একটা অশুভ চিন্তা তার হৃদয়ে ছায়া ফেলল। সে নিজে গেল মায়ের কাছে। জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে মা? তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, কোন অমঙ্গল ঘটেছে! আমি আসা পর্যন্ত তো একটা কথাও বলনি।'

এ কথাটা নিমাইয়ের মুখ থেকে আগে এ ভাবে আমি শুনিনি। শচীদেবী জবাব দিতে পারলেন না। কেঁদে উঠলেন। নিমাই বলে উঠল, 'মা, তোমার বউমার কোন অমঙ্গল সংবাদ আছে?'

তখন বাড়িতে যারা উপস্থিত ছিল, তারাই লক্ষ্মীর সর্পাঘাতে মৃত্যু সংবাদ দিল। আমি উদ্বেগে রুদ্ধশ্বাসে দেখেছি, নিমাই খানিকক্ষণ মাথা হেঁট করে থেকে কী বলেছিল। 'সংসার অনিত্য মা।—কোথায় আমি, কোথায় লক্ষ্মী! এত যে অর্থ নিয়ে এলাম, সবই অনর্থ। জীবন পদ্মপত্রের জল!'

এ সব সে বলল সকলের সামনে। চোখে জল ছিল না। কাঁদতে পারেনি। লক্ষ্মীকে হারিয়ে কাঁদা যায় না। কান্নাতে সে শোক ভোলবার নয়। মনে মনে বলল, লক্ষ্মী, সংসারে কেউ কারো নয়, এ জ্ঞান তুমি দিয়ে গেলে। এর আগে কোন মৃত্যু তো আমাকে এ জ্ঞান দেয়নি। লক্ষ্মী, তুমি নেই, এবার কার অন্বেষণ করব?

প্রেম নিত্য, এই কথাই অন্য রকমে আমি নিমাইয়ের মুখ থেকে শুনেছিলাম। আর বুঝেছিলাম, বাইরে থেকে নিমাইকে যা দেখা গেল, তার চেয়েও অতি গভীরতর ক্রিয়া তার অন্তরে ঘটে গেল। আমিও সান্ত্বনা খুঁজেছিলাম, এই ভেবে, আঘাত মানুষকে মহৎ করে। মহত্ত্বের পথ চিনিয়ে দেয়। এ ঘটনার কাল ১৫০৩ খৃষ্টাব্দে।

দুই



এখানে দুটি কথা স্মরণ রাখা দরকার। ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে কৃষ্ণভক্তি বিতর্কে নিমাইয়ের পরাজয় হয়েছিল। ঈশ্বরপুরীর সেই বিখ্যাত উক্তি, 'যে-ধাতু পরস্মৈপদী বলি গেলা তুমি। তাহা এই সাধক আত্মনেপদী আমি।'…ঈশ্বরপুরী নিজেকে 'শূদ্রাধম' বলে নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন। শূদ্রাধম নিরহংকার মানুষটির ভক্তিবাদের কাছে নিমাই কোন যুক্তি খুঁজে পায়নি।

মানুষের, বিশেষ সেই মানুষের, যে সহজে কোন কিছু মেনে নিতে পারে না, সে যখন কোন কথার বিরুদ্ধে অকাট্য যুক্তি দেখাতে পারে না, তখন বুঝতে হবে, তার অবচেতন মনে তা চিরদিনের জন্য বিঁধে রইল। নিমাইয়ের অবচেতন মনেও ছিল।

দ্বিতীয় ঘটনা লক্ষ্মীর মৃত্যু। ঈশ্বরপুরীর কাছে পরাজয়, তা নিয়ে নিমাইয়ের বাইরের আচরণে কথায় কোন বিশেষ তরঙ্গ দেখা যায়নি। লক্ষ্মীর সর্পাঘাতে মৃত্যুর সহসা সংবাদেও, তাকে দেখা গেল শান্ত, গম্ভীর। বলতে শোনা গেল কয়েকটি কথা। কিন্তু অবচেতনের গভীরে লক্ষ্মীর বিরহ শোক যে সিন্ধু-পরিমাণ হয়ে উঠেছে, তা জানা গেছল অনেক পরে।

সেই কারণেই, একটা কথা আমার বলতে ইচ্ছে করছে। আঘাত সত্য। কিন্তু প্রেমই বোধ হয় মানুষকে মহৎ করে। যে প্রেম প্রাকৃত, সেই প্রেমই অপ্রাকৃতের রূপ নিয়ে, জীবনের গতিপথ ফিরিয়ে দেয়। কিন্তু অপ্রাকৃত প্রেমের কথা বলতে গিয়ে, বিপ্লবের কথাটা ভুললে চলবে না। বিপ্লব বললেই, বর্তমানের বিপ্লবীদের ভ্রূকুটি দৃষ্টি আমার দিকে ফিরে তাকাবে। মানুষের সব কথা তো মানুষের কাছ থেকেই শুনি আর জানি। বিপ্লব কথাটা মানুষের সৃষ্টি। পৃথিবীতে বিপ্লব যা ঘটেছে, মানুষই ঘটিয়েছেন।

বর্তমান বিপ্লবীদের ভ্রূকুটির কথাটা এই কারণে মনে হল, সেই ষোড়শ শতাব্দীতে নবদ্বীপে যা ঘটেছিল, তাকে বৈপ্লবিক ঘটনা বলে স্বীকার করা হবে কী না। বিপ্লব অবশ্যই রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। কিন্তু বর্তমানে বিপ্লব বলতে বোঝায়,

সশস্ত্র বিপ্লব। ষোড়শ শতাব্দীতে নবদ্বীপে যা ঘটেছিল, তার সঙ্গে অস্ত্রের সম্পর্ক ছিল না। রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিল, সেটা আমি অনেক আগেই দেখেছি। নিমাইয়ের জন্মের আমলেই একটি কথা বিশেষ ভাবে প্রচারিত হয়েছিল, 'বিপ্র রাজা গৌড়ে হইবেক হেন আছে।'…অর্থাৎ গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হবে, এই রকম জানা যাচ্ছে।

বড় সাংঘাতিক কথা! গৌড়ে তখন মহা প্রভাবশালী মুসলমান বাদশাহ রাজ্য শাসন করছে। সে ক্ষেত্রে এ রকম একটা প্রচার সহজ কথা নয়। এর সঙ্গে প্রত্যক্ষ রাজনীতি জড়িত, কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সমস্ত ঘটনাই ঘটছিল চুপচাপ কিছু মানুষের মধ্যে। বাইরে থেকে মনে হচ্ছিল, কিছু কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব, যারা সবাই বাইরে থেকে নবদ্বীপে এসে জমা হয়েছে, তারা কেবল রাত্রে উচ্চস্বরে নাম গান করে। যবন রাজের শাসিত রাজ্যে এটা এক রকমের রাজার বিরুদ্ধাচরণ।

পাষণ্ডী বলা হয়েছে সেই সব হিন্দুদের, যারা বৈষ্ণবদের বিরুদ্ধে। যারা শাক্ত, মনসা বাশুলি ইত্যাদি দেবীর সেবা করে, মদ মাংস খেয়ে, মেয়েদের নিয়ে যৌনাচার করে। বৈষ্ণব সম্প্রদায় ছাড়া, হিন্দু সমাজের তৎকালীন চেহারাটা ইতিহাসের পথ পরিক্রমায় আগেই দেখেছি। এমন কি বিধবা যুবতীও মাংস খায়, ব্যভিচার করে। অর্থাৎ সমাজে নীতিবোধ ও শৃঙ্খলা বলে কিছু ছিল না। এই পাষণ্ডীর দল যবন তোষণ করে অর্থশালী হচ্ছিল, অন্যদিকে প্রমোদে গা ঢেলে দিয়েছিল। এই ছবিটাকে পুরোপুরি মেনে নেওয়া হয়তো সম্ভব নয়। কেন না, বাঙলার সারস্বত আন্দোলনে নবদ্বীপের অবদান চিরকালই ছিল। তবু মনে রাখতে হবে, অনেক পণ্ডিত সাধুচরিত্র ব্যক্তিরাই এক সময় নবদ্বীপ ত্যাগ করে গেছলেন। সার্বভৌম তাঁদের মধ্যে একজন। কারণ যবনরাজ ভীতি।

যবনরাজের পক্ষেও চিন্তার বিষয় ছিল। ইতিপূর্বে রাজা গণেশের আবির্ভাব ঘটেছিল। গৌড়ের পরবর্তী বাদশাহদের কাছে সেটা একটা অভিজ্ঞতা। কিন্তু গণেশের আবির্ভাবের সঙ্গে, নবদ্বীপের বৈষ্ণবদের আন্দোলনের মধ্যে একটা মূলগত তফাৎ আছে। বৈষ্ণবরা কী দেখছিলেন? যত নীচ অন্ত্যজ হিন্দু, তারা হিন্দু সমাজের মধ্যে থাকলেও, কোন সামাজিক অধিকার তাদের ছিল না। বরং ছিল লাঞ্ছিত অপমানিত। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা তাদের ঘৃণা করত। ধর্মে কোথাও তাদের ঠাঁই ছিল না। মন্দিরে প্রবেশাধিকার তো দূরের কথা, মন্দির স্পর্শ করারও অধিকার ছিল না। তাদের ছায়া মাড়ালে ব্রাহ্মণ অভিশাপ দিয়ে আবার গঙ্গা-স্নান করত। এক কথায় নিজের সমাজের কাছে, তারা পাচ্ছিল পশুর মত আচরণ। কেবল ধর্মেই তা সীমাবদ্ধ ছিল না। অর্থনৈতিক দিক দিয়েও, সব কিছু

উচ্চবর্ণের ভোগে ছিল। আর চণ্ডাল বা অন্ত্যজ নীচজাতীয়রা উচ্চবর্ণের সেবা করে, কায়ক্লেশে দিনযাপন করত।

বর্ণাশ্রমের এটা প্রকৃত রূপ নয়। বিকৃত রূপ। আর এই বিকৃত রূপের সৃষ্টি করেছিল ভোগমগ্ন, ভবিষ্যৎ দর্শনে অন্ধ ক্ষমতাশালী উচ্চবর্ণের হিন্দুরা। এর যা অনিবার্য ফল, তা হল, মুসলমান সমাজের প্রতি এই লক্ষ লক্ষ নির্দোষ অন্ত্যজ অচ্ছুত হিন্দুদের আকর্ষণ। তারা দেখেছিল, মুসলমানদের মধ্যে জাতিভেদের এই মর্মান্তিক লাঞ্ছনা অপমান নেই। সবাই একাসনে বসে আহার করে, একসঙ্গে মিলে ঈশ্বরের আরাধনা করে। ছোঁয়াছুঁয়ির বাছ-বিচার নেই। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা নিজের সমাজের কাছে যে অপমান সহ্য করত, সেই তুলনায় মুসলমানরা ধর্মের দিক থেকে উদারপন্থী।

ইসলাম ধর্ম নামে পরিচিত মূলনীতিগুলি কোরাণ এবং কয়েকটি ধর্মশাস্ত্রের দ্বারা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। সেই দিক থেকে পৃথিবীর সমস্ত মুসলমানদের মধ্যেই ধর্মবিশ্বাসে ও আচরণে একটা বিশেষ ঐক্য দেখা যায়। এই ঐক্যই হিন্দু নিম্নজাতীয় জনগণকে আকর্ষণ করেছিল। এখানে কিঞ্চিৎ পূর্ব-ইতিহাসের দিকে চোখ বুলিয়ে নিলে, চিত্রটি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

বাংলাদেশে বৌদ্ধ পাল রাজাদের সময়ে বিস্তর বৌদ্ধের সংখ্যা ছিল। সেন-রাজারা তাঁদের আমলে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ফলে অনেক বৌদ্ধ সমাজের নিম্নস্তরে পতিত হয়। তখন আঁকড়ে ধরবার মত তাদের কাছে ছিল ধর্মঠাকুরের পূজা। এই ধর্মঠাকুরও আসলে বৌদ্ধদেরই দেবতা। 'ধর্মপূজা বিধান' নামে একটি শাস্ত্রগ্রন্থ এই জন্যেই রচিত হয়েছিল। কিন্তু এই ধর্মঠাকুরের পূজায় ব্রাহ্মণরা জোর করে এমন অতিরিক্ত দক্ষিণা আদায় করত, সেটাও ঘোরতর অত্যাচারের সামিল।

এদিকে সেনরাজারা পাঠানদের কাছে পর্যুদস্ত। পাঠানরা রাজা হয়ে বসল। নিম্নবর্ণের হিন্দুরা অনেকেই দলে দলে, ইতিপূর্বেই ইসলামধর্ম গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছিল। সেটা হল, প্রথম যে সব তুর্কীরা বাংলাদেশ জয় করে এখানে বসবাস করছিল, তখন থেকেই ধর্মান্তরের ব্যাপার ঘটছিল। ফলে, দেখা যাচ্ছিল, ধর্মান্তরিত হিন্দুরা, যোগ্যতা অনুসারে রাজ্যে ও সমাজে অনেক উচ্চ স্থানে জায়গা করে নিচ্ছিল। কোন বাধাই ছিল না। বখ্‌তিয়ার খিল্‌জির একজন 'দাস' জাতীয় অনুচর গৌড়ের সম্রাট পর্যন্ত হয়েছিল। এ সব দৃষ্টান্ত, নিম্নবর্ণের হিন্দুদের চোখ এড়ায়নি। শেষ পর্যন্ত তাদের মনে এমন বিশ্বাস উৎপাদন করা হল, ব্রাহ্মণ—

দের অত্যাচার বন্ধ করার জন্যই, দেবতারা মুসলমানের মূর্তিতে ধরায় অবতরণ করেছে।

ইতিহাসের অনিবার্য ধারায় আমি দেখছি এর মধ্যেও রাজনীতি ছিল। পতিত বৌদ্ধদের ধর্মঠাকুরের কথা আগেই বলেছি। নিম্নবর্ণের হিন্দুদের লাঞ্ছনা আর অপমান দেখে, বৈকুণ্ঠে ধর্মঠাকুরের আসন টলে উঠল। কী রকম? এখানেই বুদ্ধিজীবীর চিন্তা জানা গেল :

বৈকুণ্ঠে থাকিয়া ধর্ম মনেতে পাইয়া মর্ম
মায়া রূপে হইল খনকার।
ধর্ম হইলা যবনরূপী শিরে নিল কাল টুপি
হাতে শোভে ত্রিকচ কামান।
যতেক দেবতাগণ সবে হয়ে এক মন
আনন্দেতে পরিলা ইজার
বিষ্ণু হইল পয়গম্বর ব্রহ্মা হইল পাকাম্বর (হজরৎ মহম্মদ)
আদম্ভ হইলা শূলপাণি।

এ ভাবেই গণেশ হলেন গাজী, কার্তিক কাজী, চণ্ডিকা দেবী হায়্যা বিবি, পদ্মাবতী বিবি নূর।

তবে সকলেই স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল, সেটা বললে মিথ্যা বলা হয়। লাঞ্ছিত অপমানিত ক্রুদ্ধের দল স্বেচ্ছায় ধর্মান্তরিত হলেও, রাজানুকূল্যে অনেককে জোর করেই ধর্মান্তরিত করা চলছিল। এই যে দলে দলে হিন্দুরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল, নবদ্বীপের বৈষ্ণবরা এর জন্য পাষণ্ডীদের দায়ী করেছিলেন। পাষণ্ডী মানে হিন্দু ব্রাহ্মণ, যারা সেই সময়ে কেবল মদে মাংসে যৌনাচারে ও সমস্ত নীতিবোধ হারিয়ে উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করছিল। তাদের কাছে নবদ্বীপের সারস্বত অবদানের কোন মূল্যই ছিল না। যাঁদের ছিল, তাঁরা অনেকেই পার্শ্ববর্তী রাজ্য উড়িষ্যায় চলে যাচ্ছিলেন।

বৈষ্ণবদের লক্ষ্য পড়েছিল এইদিকে। এখন এই বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে, বৈষ্ণবদের চিন্তাধারাকে অনেকে হয়তো বৈপ্লবিক আখ্যা দিতে চাইবেন না। কিন্তু সময়ের কথাটা ভুললে চলবে কি? যীশুর উত্থানকে কি বৈপ্লবিক বলা যায় না? সেই সময়ে সমাজে একটা পরিবর্তনের চিন্তা যাঁরা করেছিলেন, তাঁরা হাতে অস্ত্র তুলে নেননি। কিন্তু অদ্বৈতর মুখ দিয়ে নিমাইকে যে কথাটা বলানো হয়েছে তা বৈপ্লবিক নিঃসন্দেহে। পতিতের উদ্ধার চাই। এ পতিতেরা কারা? কেবল

কি হিন্দু? আচণ্ডালে কর মুক্ত। তার মধ্যে যবন, নারী, এমন কি বেশ্যাও আছে।

এ তো বড় সাংঘাতিক কথা! শ্রেণীবিপ্লব তখন অচিন্তনীয়। অতএব সে প্রশ্ন যদি আজকের কোন বিপ্লবী তোলেন, তাহলে ইতিহাসই তাঁর কাছে নাচার। অথচ নবদ্বীপে যাঁরা নতুন ধর্ম ও সমাজ প্রবর্তনের কথা ভাবছিলেন, তাঁদের সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেওয়া যায় না। তাঁদের সামনে রাজভয়, পাষণ্ডীর অনাচার। এই ভয় ও অনাচার থেকে মানুষকে মুক্ত করতে হবে। কিন্তু কী উপায়?

উপায় তো একটিই। এক পতাকার তলে, সকলের এক স্লোগান চাই। অর্থাৎ, সময়ের সঙ্গে তাল রেখে, সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করা। এমন একটা কৌশল ও নীতি দরকার, সকলে যেন একই স্রোতে ভাসে। নেতিবাচক নয়, ইতিবাচক। তার জন্য কী করা দরকার, ইতিপূর্বেই আমি তার কিছু কিছু লক্ষণ দেখেছি। বাইরে থেকে কোন ঘটনাকেই তেমন বিশিষ্ট দেখাচ্ছিল না। একমাত্র যবন হরিদাসের ঘটনা ছাড়া। হরিদাস এই আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট নেতা। তিনি মুসলমান হয়েও বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এ ক্ষেত্রে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণের মূল উদ্দেশ্য, অধর্মের বিরুদ্ধে ধর্মের পথে আশ্রয়।

পরবর্তীকালে নিমাইকে নেতৃত্ব নিতে দেখলেও, আমরা আগেই দেখেছি, শান্তিপুরের আচার্য অদ্বৈতই প্রকৃত নেতা। হরিদাসকে তিনিই প্রথম বৈষ্ণব ধর্ম ব্যাখ্যা করেন, তাঁর হাতে গীতা তুলে দেন। অদ্বৈত বারেবারেই তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদের কাছে 'সংহারিমু' বলছিলেন। অর্থাৎ অত্যাচারীদের সংহার করবেন। কিন্তু সংগঠন ঠিক মত গড়ে তুলতে পারছিলেন না।

পারছিলেন না বললে ভুল হবে। যথার্থ পথ খুঁজে পাচ্ছিলেন না। আবার নিশ্চেষ্ট বসে থাকতেও পারছিলেন না। হরিদাসকে পেয়ে, তাঁকে সেইজন্যই প্রাণের অধিক করে রাখলেন।

হরিদাসকে আমি অনেক আগেই নবদ্বীপে দেখেছি। কিন্তু নিমাইয়ের সঙ্গে তাঁর ঠিক কখন দেখা হয়েছিল, কোন্ সময়টিতে, তা নিয়ে একটু গোলযোগ আছে। একবার দেখেছি, জগন্নাথ মিশ্র যখন গঙ্গাতীরে অন্তর্জলে মারা যাচ্ছেন তখন নিমাই গুরুগৃহে পুঁথি লিখছেন। হরিদাস গিয়ে বললেন, 'কিসের পুঁথি লিখছ। শীগগির গঙ্গার ঘাটে যাও, তোমার বাবা দেহত্যাগ করছেন।'

তারপরে লক্ষ্মীকে বিয়ের সময়েও হরিদাসকে নবদ্বীপে দেখতে পাচ্ছি। স্বয়ং

লক্ষ্মী নিজে হরিদাসকে পরিতোষ করে খাইয়েছে। এ সব কথার সত্যতা যাচাই করা খুবই কঠিন। কারণ, নিমাইয়ের সঙ্গে হরিদাসের যোগাযোগ ও মিলন এক অভূতপূর্ব ঘটনা বলতে হবে। তা ছাড়া, হরিদাস বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করায় কাজীর আদেশে তাঁকে বাইশ বাজারে চাবুক মেরে প্রাণ নেবার ঘটনা ঘটেছিল। প্রাণে মারা যাননি, বেঁচেছিলেন। অর্ধমৃত অবস্থায় কাজীর আদেশে, তাঁকে কবরে না দিয়ে গঙ্গায় ফেলে দেওয়া হয়েছিল।

এ ঘটনাকে অনেকে হোসেন শাহর সময়ের ঘটনা বলে উল্লেখ করেছেন। সব ঐতিহাসিক এ ব্যাপারে একমত নন। তিনি নিমাইয়ের অনেক আগে জন্মেছিলেন। তিনি সম্ভবতঃ আচার্য অদ্বৈতর সমবয়সী বা কিছু কম-বেশী ছিলেন। অদ্বৈত যে তাঁকে বৈষ্ণব ধর্ম দান করেছিলেন, তাও সম্ভবতঃ নিমাইয়ের জন্মের আগে। কোন ঐতিহাসিকই, সেই সঠিক সালটি বলেননি, বাইশ বাজারে চাবুক মারা হয়েছিল কোন্ সালে।

অবশ্য বৃন্দাবনদাস তাঁর 'চৈতন্যভাগবতে' স্পষ্টই উল্লেখ করেছেন, চৈতন্যের জন্মের আগে হরিদাস নির্যাতিত হয়েছিলেন। তা হলে, এ ঘটনা ঘটেছিল সুলতান জালালুদ্দিন ফতেশা'র সময়ে। যিনি নিমাইয়ের জন্মের সময় ও তার পাঁচ-ছ বছর আগে থেকেই রাজত্ব করছিলেন। তার অর্থ এই নয়, ইতিমধ্যে হরিদাস নবদ্বীপে আসেননি। আচার্য অদ্বৈত শান্তিপুর থেকে প্রায়ই নবদ্বীপে শ্রীবাসের বাড়ি আসতেন। হরিদাসও নিশ্চয়ই আসতেন। কিন্তু নিমাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল কী না, সেটা সঠিক বলা সম্ভব নয়।

ঐতিহাসিক প্রয়োজনের দিক থেকে দেখতে গেলে, নিমাইয়ের কাছে হরিদাসের আসার কোন কারণও নেই। নিমাই বৈষ্ণবদের সম্পর্কে বিদ্রূপ করত। নানারকম কূট প্রশ্ন করে তাঁদের বেকায়দায় ফেলত। বৈষ্ণবরা অনেকেই তার উপর বিরক্ত ছিল। বিশেষ করে, লক্ষ্মীকে বিয়ের পরেও নিমাইয়ের কথাবার্তা রীতিমতো অবৈষ্ণবোচিত। এমন লোকের কাছে হরিদাস কেন আসবেন?

এ সাক্ষাৎ ভবিষ্যতে হয়েছিল বলেই মনে হয়। আমাকে সেই দিনটির জন্য অপেক্ষা করতে হবে। রাজনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে, হরিদাস বৈষ্ণব হয়ে একটা প্রচণ্ড আন্দোলনের সৃষ্টি করেছিলেন। প্রমাণ, তাঁর শাস্তি। পাষণ্ডীরা হরিদাসকে বৈষ্ণব হতে দেখে, ভয়ংকর রেগে গেছল। তারা হরিদাসকে যা-তা বলে কটু-কাটব্য করছিল। ধর্ম যে রসাতলে যেতে বসেছে, হরিদাসই তাদের কাছে বড় প্রমাণ। নিমাই পরে এই আন্দোলনের কথা শুনেছিল।

তিন



সম্ভবতঃ ১৫০৮ অথবা ১৫০৯ খৃষ্টাব্দের আগে, নিমাইয়ের সঙ্গে হরিদাসের 'প্রকৃত' সাক্ষাৎ ঘটেনি। প্রকৃত বলতে আমি ভবিষ্যতের সেই অনাগত দিনগুলোর কথা বলছি, যখন সমগ্র নদীয়া নগর নবদ্বীপ এক মহাবিপ্লবের সামিল হয়েছিল। হরিদাসের সঙ্গে নিমাইয়ের সাক্ষাতের বিষয়টি দেখতে হবে, ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা সংগঠনের কারণ হিসাবে।

এই সাংগঠনিক ঘটনাবলী কী ভাবে এগিয়ে চলেছিল, তা দেখবার আগে, পূর্ববঙ্গ থেকে ফিরে আসার পরে, লক্ষ্মী-বিরহকাতর নিমাইকে একবার দেখা যাক। আমি অনেক আগেই গভীর অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ করেছি, ছেলে-বেলায় নিমাইয়ের মৃগী জাতীয় ব্যাধি দেখা দিয়েছিল। অনেকে এ রোগকে বায়ুরোগও বলেছে। নরনারীরা চিরকালই এ ধরনের রোগ দেখলে যা বলে থাকে, তাই বলেছিল। কেউ বলেছিল, 'দানবের অধিষ্ঠান' হয়েছে। কেউ বলেছিল, 'ডাকিনী'তে পেয়েছে। এ ঘটনা উপনয়নের সময়। নিমাইয়ের বয়স তখন ন'বছর। বিশেষজ্ঞদের মতে বায়ুরোগ অলৌকিক কল্পনাকে প্রশ্রয় দেয়।

নিমাই পূর্ববঙ্গ থেকে ফিরে এল। লক্ষ্মী নেই। তার মধ্যে আবার সেই বায়ুরোগের প্রকোপ দেখা দিল। কিন্তু এবারের বায়ুরোগের চেহারা একটু অন্য রকম। আগে যেমন ক্ষণে ক্ষণে মূর্ছা, সর্বাঙ্গ স্তম্ভাকৃতি হয়ে উঠত, লোকে দেখে ভয় পেত, না জানি কি ঘটে যাবে, এবার সে রকম নয়। শান্ত গম্ভীর ভাবে বিভোর। কোন দিকেই লক্ষ নেই। অথচ অধ্যাপনার কাজ চলছে।

সেই চাপল্য নেই, বাচালতা নেই, বৈষ্ণবদের পিছনে লাগা নেই। অবশ্য একটা কথা মনে রাখতে হবে, ছেলেবেলা থেকেই নিমাই এক ভিন্ন চরিত্রের ছেলে। আমি তো আগেই দেখেছি, তার অল্প বয়সের প্রেমের ব্যাপারেও, আধুনিক পণ্ডিত উক্তি করেছেন, বিশেষ প্রতিভাসম্পন্ন বালকের মনে প্রেমের উদ্ভব অল্প বয়সেই হয়। নিমাইয়েরও তা হয়েছিল। যা কিছুই আমি দেখে এসেছি, সব কিছুর মধ্যেই নিমাই চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। আমি বারে

বারেই বলেছি, প্রচলিত যে কোন ব্যবস্থারই বিরোধিতা করা তার অভ্যাস ছিল। এটাকে অভ্যাস বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে দিয়েই এক ভিন্নতর পুরুষ জগতের সামনে নতুন রূপ ধারণ করছিল।

লক্ষ্মীর মৃত্যুর পরে, নিমাই আবার ছাত্র পড়াতে শুরু করল। কোন কোন চরিতকার বলেছেন, এ সময়েও তার বায়ুব্যাধি হল। কিন্তু সত্যিই কি বায়ু-ব্যাধি? না আর কিছু? আমরা দেখতে পাচ্ছি বটে, একজন ভৃত্য নিমাইয়ের মাথায় বিষ্ণুতেল মাখাচ্ছে। নিমাই ছাত্র পড়াচ্ছে। ব্যাপারটা তা হলে কিসের? চরিতকাররা সকলেই নিমাইকে এমন একটা চোখে দেখতেন, তার সব আচরণের মধ্যেই অপ্রাকৃত কিছু বলবার প্রবণতা তাঁদের মন জুড়ে থাকত। মানবমনের কষ্ট যে নিমাইয়েরও থাকতে পারে, এটা তাঁরা ভক্তির প্রাবল্যে হয়তো লক্ষ করতেন না। অথচ আমি দেখছি, নিমাইয়ের মুখচ্ছবির কী করুণ রূপ। এ কি বায়ুব্যাধি, না বিরহের শোক? আমি দেখছি, প্রাকৃতের প্রেম এক অপ্রাকৃতের গভীরে গিয়ে মিশছে। ব্যাধি না, প্রাকৃতের বিরহ যাতনা এক অপ্রাকৃতের সন্ধানে রত। এক প্রেমকে ভুলতে হলে, আর এক প্রেম চাই। এটা মানুষের অবচেতনের বিষয়। সেখানেই তার মুক্তি।

নিমাই ছাত্রদের অনুরোধ করছে কপালে তিলক ধারণ করতে। সন্ধ্যা-বন্দনাদি করতে। এ রকম অনুরোধ নতুন। বিষয়টিকে সামান্য চোখে দেখলে ভুল হবে। শোকাচ্ছন্ন মন, মুক্তির উপায় হিসেবে, একদিকে যখন নতুন প্রেমের আশ্রয় খুঁজছে, তখনই ভবিষ্যতের আন্দোলনের প্রস্তুতিও চলছে। সেই জন্যই ছাত্রদের প্রতি এই নতুন অনুরোধ। আচরণবিধির শিক্ষা। এর থেকেই জন্ম নেবে প্রকৃত শিক্ষা। বর্তমানের বিপ্লবী হলে বলতেন, ডিসিপ্লিন।

এখানে একটা কথা আমাদের বিশেষ জরুরি কারণে মনে রাখতে হবে। ষোড়শ শতাব্দীতে মানুষের বা জনগণের মনস্তাত্ত্বিক ধ্যানধারণা। রাজা গণেশ গৌড়ের সুলতানের কাছ থেকে রাজশক্তি কেড়ে নিয়েছিলেন। তাঁর কোন সংগঠন ছিল না। সুলতানের রাজ্যশাসনের দুর্বলতা, তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র তখন দানা বেঁধে উঠেছিল। তার চেয়েও বড় কথা, গণেশের ছেলে যদু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন, জালালুদ্দিন নামে তখন সিংহাসনে আসীন। গণেশের পক্ষে ছেলেকে সরিয়ে দিয়ে বিভিন্ন সেনাপতি আর অমাত্যবর্গের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে, গৌড়ের সিংহাসন কেড়ে নেওয়ার বিশেষ সুযোগ এসেছিল। তিনি সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু তিনি বংশপরম্পরায় বা পাঠান রাজত্বের অবসান করতে পারেননি। যতদিন

তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছিলেন, নিজের নবগঠিত সৈন্য-সামন্ত দিয়ে লড়াই করতে পেরেছিলেন, ততদিনই তিনি রাজত্ব করেছেন। তার মধ্যে নিজের নামে অঙ্কিত মুদ্রাও সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন। কিন্তু তাঁর পরাজয়ের পরে, আর কেউ এসে তাঁর পাশে দাঁড়ায়নি। বরং তাঁর ছেলে গৌড়ের ধর্মান্তরিত মুসলমান সুলতান হয়ে আবার সিংহাসনে বসেছিল।

রাজা গণেশের রাজনীতি আর নবদ্বীপের বৈষ্ণবদের আন্দোলন দুইয়ের মধ্যে গুণগত তফাত ছিল। গণেশ রাজা হতে চেয়েছিলেন। বৈষ্ণবরা রাজার অত্যাচার, পাষণ্ডীদের অনাচার থেকে, আচণ্ডাল যবন ও লাঞ্ছিতা নারী, সকল জনগণের মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন।

নিমাই ছাত্র পড়িয়ে চলেছে। এক বছর কেটে গেল। মা ব্যস্ত হলেন। ছেলে এখনও পূর্ণ যুবক। প্রথম স্ত্রীকে নিয়ে মাত্র দু বছর সংসার করেছিল। ঘরে একটা শূন্যতা হাহাকার করছে। একটি পুত্রবধূ না হলে, তাঁর মন মানছিল না। তিনি সকলের সঙ্গে আলোচনা শুরু করলেন। নিমাইয়ের উপযুক্ত একটি পাত্রী চাই। ছেলের এই অকূল যৌবন, এভাবে বিপত্নীক অবস্থায় আর কত দিন চলতে পারে।

সন্ধান চলল। সন্ধান মিলল। নবদ্বীপের রাজপণ্ডিত শ্রীসনাতন মিশ্র। ইনি রূপ এবং সনাতন—দুইয়ের কেউ নন। তাঁর কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া। বৈষ্ণব সনাতনের অবস্থা ভাল। কন্যাটিও সুন্দরী রূপসী। শচীদেবী তাকে গঙ্গার ঘাটে দেখেছেন। মেয়েটি তাঁকে দেখলে প্রণাম করে। শচীদেবী আশীর্বাদ করেন। মনে মনে বলেন, এমন রাধিকার মত রূপ। কৃষ্ণের মত পতি হোক।

সেই আশীর্বাদই এবার নিজের গৃহবধূ হিসাবে করতে চাইলেন। তিনি কাশীনাথ পণ্ডিতকে ঘটক হিসাবে রাজপণ্ডিতের কাছে প্রস্তাব দিয়ে পাঠালেন। রাজপণ্ডিত সব শুনে রাজী হলেন। কাশীনাথ এসে শচীকে এই শুভসংবাদ দিলেন। উৎফুল্ল শচীমাতা বিবাহের উদ্যোগে লেগে গেলেন। নিমাইয়ের ছাত্ররা মহানন্দে নৃত্য জুড়ে দিল। বুদ্ধিমন্ত খান বললেন, 'এ বিয়ের যাবতীয় খরচ আমি করব।'

মুকুন্দ সঞ্জয় বলল, 'কেন, আমাদের কিছু করার নেই?'

বুদ্ধিমন্ত খান বললেন, 'তোমরা বামুনেরা কি বিয়ে দেবে? আমি এমন ভাবে এ বিয়ে দেব, লোকে দেখবে যেন রাজকুমারের বিয়ে হচ্ছে। নিতান্ত বামুনের ছেলের বিয়ে হচ্ছে না।'

বিষ্ণুভক্ত বুদ্ধিমন্ত খান অর্থশালী ব্যক্তি। নিমাইকে ভালবাসেন। নিমাইয়ের শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রতি অন্তরে শ্রদ্ধা পোষণ করেন। দিনক্ষণ স্থির হল। কিন্তু

একটা বিষয়ে সবাই নীরব। নিমাই কি এই বিয়েতে সম্মতি দিল? স্পষ্ট করে এ কথা কেউ না বললেও, নিমাইকে হাস্যমুখেই ছাঁদনাতলায় গিয়ে বসতে দেখা গেল। সে বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিয়ে করল। এও বোধ হয় মানুষের একান্ত মানবিক লীলা। নইলে নিমাই বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিয়ে করতে রাজী হবে কেন। সে তখন সম্ভবতঃ আপন অন্তরের গভীরে ডুব দিয়ে দেখেনি। লক্ষ্মী যেখানে অধিষ্ঠিত, বিষ্ণুপ্রিয়া কেমন করে সেখানে স্থান পেতে পারে? অথবা, যদি লক্ষ্মীর শূন্য স্থানই বলি, তা পূর্ণ করার ক্ষমতা কি বিষ্ণুপ্রিয়ার ছিল?

এ বিচারের ভার আমাদের নয়। যা ঘটছে, তাই দেখা যাক। কেউ বলছেন, বিয়ের সময় বিষ্ণুপ্রিয়ার বয়স দশ। জয়ানন্দ চরিতকার বললেন, 'বিষ্ণুপ্রিয়া কন্যা দেখি প্রথম যৌবন।' তিনিই ঠিক দেখেছেন বলে মনে হয়। কবি লোচনের দেখা তো আলাদা। তিনি নদীয়া নাগরী ভজনের প্রচারক। বিয়েতে নাগরীদের তিনি নিয়ে এলেন। নাগরীদের অঙ্গে পাটশাড়ি (রেশম), রেশমী কাঁচুলি, কানড় ছাঁদে খোঁপা বাঁধা। সোনায় রূপোয় মুক্তোয় বেঁধে পিঠে ফেলেছে রাঙা খোপা। বাসর-ঘরের তো কথাই নেই। সুন্দরীরা সব উন্মত্তা, মনের কথা ব্যক্ত করতে পারছে না। অথচ রস-আবেশে গোরার পাশে এলিয়ে পড়ছে। কামে তারপর উন্মত্তা।

লক্ষ্মী আর বিষ্ণুপ্রিয়াতে অনেকে ভুলও করেছেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার জায়গায় লক্ষ্মীকে এনেছেন। লক্ষ্মীর জায়গায় বিষ্ণুপ্রিয়াকে। যেমন কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন, বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিয়ের পরে নিমাই দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছিলেন। অর্থাৎ পূর্ববঙ্গে গিয়েছিলেন। উনি ঠিক বলেননি। এখানে বৃন্দাবনদাসই ঠিক কথা বলেছেন।

নিমাইয়ের চরিতকারদের মধ্যে বৃন্দাবনদাসের কথাটি সবাই বিশেষ ভাবে মনে রাখবেন। কারণ পরবর্তীকালে দেখতে পাব, বৃন্দাবনদাস একটি বিশিষ্ট চরিত্র। নিমাইয়ের জন্মের পরে জন্মালেও, তাঁর জন্মরহস্য একটি অভূতপূর্ব ঘটনা। এই ঘটনার সঙ্গে নানারকম প্রশ্ন জড়িত। কিন্তু যে-প্রশ্ন নিয়ে কেউ মাতামাতি করেননি। বরং নীরবতাই অবলম্বন করেছেন। কেন না, বৃন্দাবনদাসের জন্ম একটি অলৌকিক ঘটনা বলেই সকলের মনে স্থান পেয়েছিল।

অলৌকিকতার প্রশ্ন যখন এল, তখন একটি বিশেষ বিষয়ে আমার এখনই জেনে রাখা দরকার। আমি গণেশের রাজা হওয়ার ঘটনা দেখেছি। সে ঘটনা রাজনীতি নিঃসন্দেহে। কিন্তু যে নেতৃত্ব থাকলে গণেশ ইতিহাসকে একেবারে বিপরীত পথে চালিত করতে পারতেন, জনসাধারণের মধ্যে তাঁর নেতৃত্বের সেই ভাবমূর্তি কি ছিল? বোধ হয় না।

অবিসংবাদী নেতা হতে হলে, তাঁর একটি বিশেষ ভাবমূর্তি জনসাধারণের সামনে থাকা দরকার। সেটা নির্ভর করে, কাল এবং সময়ের উপর। ষোড়শ শতাব্দীর একেবারে শুরুতে, যে ঘটনাকে আমি বিপ্লব আখ্যা দিতে চাইছি, আজকের মানুষ নিশ্চয় তার মধ্যে শ্রেণীবিপ্লবের চেহারা দেখবার প্রত্যাশা করবেন না। আমি ইতিহাসের পথযাত্রায় দেখাতে পাচ্ছি, ধর্মের উপরেই মানুষের আস্থা। ধর্মবোধ নিয়েই যা কিছু ভাল মন্দ ইত্যাদির বিচার।

পটভূমি হল যবন রাজার অত্যাচার। পাষণ্ডীরা অর্থাৎ রাজার কাছে নতি স্বীকার করে, ধর্মকে জলাঞ্জলি দিয়েছে যারা, সমাজের সমস্ত সুস্থ নীতিবোধকে নষ্ট করে দিচ্ছে। উচ্ছৃঙ্খলতায় মেতে গিয়ে কেবল আমোদ-প্রমোদ আর যৌনাচার নিয়ে মেতে আছে। আর এ সবও তারা করছে নানা ধর্মাচরণের মধ্য দিয়েই। শাক্ত এবং শক্তি-পূজা ও সাধনার যে নিষ্ঠা ত্যাগ যোগ, সে সব বাদ দিয়ে, শক্তি-সাধনার নাম করে কেবল 'ম'-কারান্তর আদ্যশ্রাদ্ধ, যে কারণে প্রকৃত পণ্ডিত সাধকরা নবদ্বীপ ত্যাগ করে অনেকে চলে গেছলেন।

আধুনিক যুগের কথা এখানে অচিন্তনীয়। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা হারিয়েছে অনেক কাল আগেই। কিন্তু জনসাধারণের বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-ভাবনা রয়ে গেছে সেই প্রাচীন হিন্দু যুগের উপরেই। সেই যুগে, কী স্বর্গে, কী মর্ত্যে, যিনিই যুগে যুগে ত্রাতা রূপে দেখা দিতেন, তাঁরা সকলেই ছিলেন এক-একজন 'অবতার'। তিনি ইন্দ্র হন, অথবা কৃষ্ণ হন, অধর্মের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে যিনি নেতৃত্ব গ্রহণ করতেন, জনসাধারণ তাঁদের প্রতি অবতারত্ব আরোপ করতেন। যিনি অবতার, তিনিই ত্রাতা। অর্থাৎ তিনিই নেতা। কিন্তু অবতার তাকে হতেই হবে।

পাঁচশো বছর পূর্বে যে সময়ের ঘটনার সামনে আমি দাঁড়িয়ে, সেই সময়ের মানুষের মনের অবস্থাও দেখতে পাচ্ছি। পরাভূত, অপমানিত, লাঞ্ছিত। তাদের বিশ্বাস, কোন অবতারের আবির্ভাব না ঘটলে, এই অসহায় অবস্থা থেকে মুক্তি নেই। আর তাদের হতাশা এতই গভীর, স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে ভাগ্যের হাতে যে ভাবে নিজেদের ছেড়ে দিয়েছে, বোঝা যায়, এটাও তাদের বিশ্বাস, এ যুগে আর কোন অবতারের আবির্ভাবের সম্ভাবনা নেই। যে কারণে আমি আগেই দেখেছি নিম্নবর্ণের হিন্দুরা অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তির জন্ম দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে, আর সেই ধর্মীয় রাজা ও তার অনুগামীদেরই বৈকুণ্ঠ থেকে নেমে আসা দেবতার আসনে বসিয়েছে। ত্রাতা হতে হলে, দেবতাদেরই তা হতে হবে। অর্থাৎ তারাই অবতার। সেই জন্তেই গণেশ কার্তিক পদ্মাবতী দেবদেবীদের

চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেছল। তারাও তৎকালীন শাসকদেরই রূপ নিয়েছিল।

নবদ্বীপের বৈষ্ণবরা এই ঐতিহাসিক সত্যটি উপলব্ধি করেছিলেন। একজন অবতার দরকার। এটি হল আসলে রাজনীতি। অদ্বৈত আচার্য বারে বারেই শ্রীবাসের বাড়িতে ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছেন, সংহারিমু সংহারিমু। আর বেশি বিলম্ব নেই। নিমাইয়ের জন্মের পূর্বে, বৈষ্ণবদের মধ্যে আচার্য অদ্বৈত অগ্রগণ্য। নিমাইও পরে বলেছে, 'ভারতবর্ষে নাহি কেহ আচার্য সমান।' অর্থাৎ তাঁর মত সর্বশাস্ত্র-বিশারদ যোদ্ধা আর কেউ নেই। সেইজন্য অদ্বৈত 'সিংহ' নামে খ্যাত।

পাষণ্ডীদের মধ্যে ব্রাহ্মণরা ছিল, আমি দেখেছি। যারা বৈষ্ণবদের বিরুদ্ধাচরণ করত, সুলতানের দরবারে গিয়ে শাস্তি দেবার কথা ভাবত। যে কারণে অদ্বৈত পাষণ্ডীদের ওপর ঘৃণায়, প্রচণ্ড রাগে, উলঙ্গ হয়ে চিৎকার করে শ্রীবাসের বাড়িতে বলেছেন, 'আমি সকলের চোখের সামনে কৃষ্ণকে দেখাব। কৃষ্ণ নিজে এসে আচণ্ডালাদি সবাইকে উদ্ধার করবেন। আমি তোমাদের সেই কৃষ্ণভক্তি বোঝাব। যদি তা না পারি, তবে নিজেই চতুর্ভুজ হব, হাতে চক্র নেব, পাষণ্ডীদের মুণ্ড কাটব। তবেই কৃষ্ণ হবেন প্রভু, আমি হব তাঁর দাস।'

অদ্বৈত এ কথা বারে বারেই বলতেন! আমরা এ যুগের মানুষ কিছুটা অনুমান করতে পারি, অনাচার অত্যাচারের বিরুদ্ধে মুক্তিকামী মানুষের এ সব কথার মধ্যে যা প্রচ্ছন্ন, তা হল রাজনীতি। কৃষ্ণের মত অবতার চাই। যিনি চক্র হাতে আবির্ভূত হবেন, শত্রু বিনাশ করবেন। এখানে কেবল একটি কথাই মনে রাখা দরকার, আচার্য অদ্বৈত নিজেকে প্রথম সেই অবতার রূপে কল্পনা করেছিলেন! পরে অবশ্য আর করেন নি। কারণ তিনি তাঁর ক্ষমতা, জনসাধারণের সামনে তাঁর যে ভাবমূর্তি, সে সব বিচারে খুবই বিচক্ষণ ছিলেন। তাঁর মনে গভীর উদ্বেগ ও চিন্তা ছিল, কে? কাকে সেই অবতার রূপে সকলের সামনে উপস্থিত করা যায়? সে তো খুব সহজ মানুষ হলে হবে না। নেতৃত্ব দিতে হলে, যে অসীম ক্ষমতা দরকার, মানুষ যাঁকে দেখামাত্র, যাঁর কাজকর্ম আচরণের মধ্যে নিজেরাই তাদের অবতারকে আবিষ্কার করবে, বৈষ্ণবদের কাজ কেবল সেই মানুষটিকে খুঁজে বের করে, তাকে যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত করা। তাঁর মধ্যে এমন গুণ ও ক্ষমতা থাকা দরকার, যাঁর মধ্যে প্রকৃতই কৃষ্ণদর্শন হবে।

অদ্বৈতর কথাগুলো বিশেষ ভাবে লক্ষ করার গভীর প্রয়োজন আছে। প্রাক্-চৈতন্য যুগে, তিনি আশ্বাস দিচ্ছেন, 'কৃষ্ণ দর্শন করাব।' তারপরে বলছেন, 'তিনি একান্তই না এলে, আমিই কৃষ্ণের অবতার হব। কারণ কি? রাজনীতি দুর

করা ও পাষণ্ডী দলনের জন্ত কৃষ্ণের আবির্ভাব চাই। কিন্তু সবচেয়ে বড় লক্ষণীয় তিনি বৃন্দাবনের কৃষ্ণের কথা বলেননি। মথুরা বা কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণকেই তিনি 'অবতারিবারে' আশা করছিলেন, সংকল্প করছিলেন, হুংকার করছিলেন।

এইটি রাজনীতি। নেতা চাই। অর্থাৎ অবতার চাই। আর সে অবতার হবেন কৃষ্ণের অংশ। অথবা স্বয়ং কৃষ্ণ। উদ্দেশ্য আমি আগেই জেনেছি। জীবের উদ্ধার। রাজা গণেশের চিন্তার সঙ্গে আচার্যের চিন্তার এখানেই মূলতঃ তফাত। অদ্বৈতর হুংকারেই একজন অবতারের জন্ম হচ্ছে। শুধু হুংকার নয়, অদ্বৈতর প্রাণে আসলে বড় দুঃখ বড় করুণা। স্বভাবে হৃদয় তাঁর বড়ই করুণ। করুণা না থাকলে, জীবের উদ্ধারের চিন্তা মনে আসবেই বা কেন? অতএব, অদ্বৈত কেবল আচার্য নন, সিংহ নন, তিনি করুণার অবতারও বটে। আমি দেখে আসছি সমস্ত লীলারই তিনি অগ্রদূত হিসাবে কাজ করেছেন।

অগ্রদূতের প্রশ্নই যখন এল, তখন আর একজনের নামও এখনই বলা দরকার তিনি যবন হরিদাস। নিমাইয়ের জন্মের আগে, বৈষ্ণব সমাজে যখন একটা গুরুতর প্রস্তাবনা চলেছে, তখন অদ্বৈত কী করছেন, আমরা দেখলাম। অন্তদিকে তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় হরিদাস গোঁফায় বসে, কৃষ্ণকে অবতীর্ণ করবার জন্য নাম সংকীর্তন করছেন। একজন হিন্দু, একজন মুসলমান। এক অভূতপূর্ব যোগসূত্র! এর সঙ্গে একটি সূক্ষ্ম প্রচারও চলছিল। নবদ্বীপেই যে হেতু কৃষ্ণ-অবতার আবির্ভূত হবেন, সেইজন্যই এই পাণ্ডববর্জিত দেশে, কৃষ্ণের বিভিন্ন পার্ষদগণ বিভিন্ন বৈষ্ণবরূপে জন্ম নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। এরা কেউই মানুষ নন, সকলেই দ্বাপরের কৃষ্ণলীলার অবতার। প্রভুর আজ্ঞায় সকলেই আগে থেকে মানুষ হয়ে জন্মেছেন মাত্র।

এঁরা চেয়েছিলেন কংস, শিশুপালাদি বধে প্রযুক্ত, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্রে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার্থে, এমন কি ভীষ্মবধে সমুদ্যত বিদ্যুৎবর্ষী চক্র হাতে কৃষ্ণকে। সেই সঙ্গে সকল রাজভীতি ও পাষণ্ডী বিনাশ সাধন। ত্রিভঙ্গ মুরলীধর বাঁশের বাঁশি হাতে কৃষ্ণের কথা তখন কেউ বলছেন না। আচার্য অদ্বৈত কৃষ্ণের অবতারকে কখনও রাধিকা রূপে দেখতে চাননি। শ্রীপাদ নিত্যানন্দও তা চাননি। শ্রীবাস চাননি। 'গদাধরও চাননি, যে কারণে তিনি নিমাইয়ের সন্ন্যাস গ্রহণে পর্যন্ত আপত্তি করেছিলেন।

একটা বিষয় তাহলে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। নবদ্বীপে ভক্তরা কৃষ্ণের অবতার সৃষ্টি করেছেন। যে উদ্দেশ্যে করেছেন, তাও পরিষ্কার। সব থেকে বেশি পরিষ্কার, অবতারের পার্ষদগণ কেউ তাঁর মধ্যে শ্রীরাধিকার অবতারকে চাননি। চেয়েছিলেন, পরবর্তীকালে নীলাচলের ভক্তবৃন্দ। ইতিহাস এখানেই

বড় একটি রহস্য করে গেছে। নবদ্বীপের ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রেরণায় যিনি কৃষ্ণের অবতার, নীলাচলের প্রেরণায় তিনিই রাধিকার অবতার।

জীবনের ক্রমবিকাশে, নরলীলায় অবতার পুরুষের জীবনেও ক্রমবিকাশ আছে। কিন্তু এ সব কথা বলবার জন্য বর্তমান প্রসঙ্গ নয়। গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গটি হল, আমি যে নবদ্বীপের কথা বলছি, সেই সময়ে মানুষ নেতাকে অবতার রূপে দেখতে চায়। অতএব, অবতারত্ব আরোপিত না হলে, নেতা হওয়া সম্ভব নয়। সন্দেহ নেই, বাস্তব চিন্তার দ্বারাই আন্দোলনকারীরা অগ্রসর হয়ে চলেছেন।

চার



নিমাই বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিয়ে করল, ১৫০৫ খৃষ্টাব্দে। লক্ষ্মী মারা গেছে ১৫০৩ খৃষ্টাব্দে। দু'বছর একটা ঘোরের মধ্যে নিমাইয়ের কেটেছে। ছাত্ররা মাথায় বিষ্ণুতেল মাখাচ্ছে। আর সে ছাত্রদের পড়াচ্ছে। দু'বছর পরে বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিয়ে করার পরে নিমাইয়ের মানসিক অবস্থাটা কী রকম দেখছি? লক্ষ্মীকে বিয়ে করবার পরে, সে স্পষ্টই বলেছিল, 'গৃহস্থ হলাম, এখন চাই গৃহধর্ম।' অর্থাৎ স্বাভাবিক সংসারধর্ম। সুখী স্বামী। শিক্ষিত অধ্যাপক। অর্থোপার্জনের দিকে ঝোঁক। কিন্তু সর্পাঘাতে স্ত্রীর মৃত্যু, সবই যেন কেমন এলোমেলো করে দিয়েছে। সর্পদংশন করেছে যেন নিমাইকেই।

বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিয়ে করল বটে। সুন্দরী উদ্ভিন্নযৌবনা পতিগতপ্রাণা বিষ্ণুপ্রিয়া ঘরের শোভা বাড়িয়েছে। তার রূপ গুণ, সবই পুরুষের কামনার ধন। কিন্তু নিমাইয়ের সেই গৃহধর্মে যেন আর মন নেই। আগের সেই ঔদ্ধত্য নেই, হাস্য-পরিহাস নেই, সর্বদাই অন্যমনস্ক। কেবল অন্যমনস্ক বললে ভুল হবে। কিছুই ভাল লাগে না। সহ্য করতে পারে না।

শচীদেবীর মন খারাপ হয়ে যায়। এমন সুন্দরী গুণবতী ভক্তিমতী বউ, নিমাই তার দিকে ভাল করে তাকিয়েও দেখে না। তাই তিনি, সুযোগ সময় পেলেই, নিমাইয়ের সামনে বিষ্ণুপ্রিয়াকে এনে বসান। নিমাই ফিরে তাকায় না। শচীদেবী মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করলে, ফল হয় বিপরীত। নিমাই হঠাৎ এমন

হুংকার আর চিৎকার করে ওঠে, বিষ্ণুপ্রিয়া ভয়ে পালিয়ে যায়। শচী মনে মনে প্রমাদ গণেন।

একজন নিমাইচরিত বিশেষজ্ঞ এবং নিশ্চয়ই ভক্ত কি বর্ণনা দিচ্ছেন, বড় বিস্ময়ে দেখি, 'স্তব্ধ নিশীথিনী। বিষ্ণুপ্রিয়াও হয়ত নিদ্রা যাইতে' পারিতেছেন না। নিমাই-বিরহে স্বাস্থ্য না পাইয়া উঠে, পড়ে, বৈসে। এ বিরহ কার জন্য? বিষ্ণুপ্রিয়া শয্যায়। বিষ্ণুপ্রিয়া তো এ বিরহের পাত্রী নহেন। শুধু তাই নয়, স্বামীর এ বিরহে তিনি কোন শান্তিই দিতে পারিতেছেন না। কি দুর্ভাগ্য।... প্রাকৃতে ইহা লক্ষ্মীর জন্য বিরহ। অতিপ্রাকৃতে বা অপ্রাকৃতে ইহা কৃষ্ণের জন্য বিরহ। (কিন্তু সত্যই কি কৃষ্ণ-বিরহ?) লক্ষ্মীর বিরহের কথা গ্রন্থ লেখে না। কোন গ্রন্থই না। সব গ্রন্থই (চরিতকার বর্ণিত) বলে কৃষ্ণ-বিরহ।'

'প্রশ্ন, প্রাকৃতে ইহার অঙ্কুর কোথায়? কোন অপ্রাকৃতই প্রাকৃত ছাড়া হইতে পারে না। কার্যকারণ-শৃঙ্খলে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত একত্রে শৃঙ্খলিত। অপ্রাকৃতের অঙ্কুর প্রথমে প্রাকৃতেই থাকিবে। মানবমনই অপ্রাকৃতের জন্মভূমি। মনের বাহির হইতে কিছু আসিলেও, আসা মাত্র তাহা মনেরি হইয়া গেল। প্রাকৃতে ও অপ্রাকৃতে এ বিরহ যুবক নিমাইয়ের মন হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। অন্য কোথা হইতে ইহা উদ্ভূত হয় নাই। ইহা এমন কিছু অলৌকিক নয়। মনোবিজ্ঞান-সম্মত ইহার সঙ্গত ব্যাখ্যা আছে। প্রথম ভালোবাসার উপর অকস্মাৎ সর্পদংশনরূপ দুর্দৈবের আঘাতপ্রসূত বিরহ নিমাইয়ের জাগ্রত সুষুপ্তি ও নিদ্রায় মনের গভীরতম প্রদেশে এমন নিবিড় ভাবে শিকড় গাড়িয়াছে যে, বিষ্ণুপ্রিয়া আর তাহার মূলোচ্ছেদ করিতে পারিলেন না।'...

এর বেশী উদ্ধৃতি দেবার দরকার নেই। মনে হয়, কথাগুলো চরম সত্য। খাঁটি মনোবিশ্লেষণ। অবশ্য এ বিরহকেই পরে রূপান্তরিত অবস্থায় আমি দেখতে পাবো। বর্তমান মানসিক অবস্থা বর্ণনার পরে, একটা বিষয় কিঞ্চিৎ ধাঁধায় ফেলে দেয়। ১৫০৫ খৃষ্টাব্দে বিয়ের পরে, তিন বছর কি নিমাইয়ের মনের অবস্থা এ রকমই ছিল? বোধ হয় না। মনের মধ্যে একটা ঘোরতর আন্দোলন চলছিল। অন্তরের গভীরে আন্দোলনের অর্থই হল, ভবিষ্যতের নতুন কিছু পরিবর্তনের সূচনা। বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না।

নিমাইয়ের জন্মের পূর্ব থেকেই, শ্রীহট্ট এবং পূর্ববঙ্গের আরও কয়েক স্থান থেকে আগত কিছু ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব একটা পরিবর্তনের জন্য চেষ্টিত ছিলেন। সে অবস্থা এবং পরিবেশটি আমি আগেই দেখেছি। নিমাইও তার জন্মের পর সবই দেখছিল, শুনছিল। কিন্তু বৈষ্ণব ঘরের সন্তান হয়েও, তাকে যেন বিদ্রোহীর

ভূমিকাতেই দেখা যাচ্ছিল। এমনিতেই ছেলেবেলায় অত্যন্ত দুরন্ত ছিল। মনে আছে নিশ্চয়ই, সে বাবার গলার পৈতা খুলে নিয়েছিল। রাস্তার যেখানে সেখানে আবর্জনার মধ্যে বসে পড়ত। মা বকলে, মাকে ভাঙা হাঁড়ির টুকরো ছুঁড়ে মেরে কপাল কেটে গিয়েছিল। কারণ কী? না, সমস্ত প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধেই তার মনে একটা বিদ্রোহ। ছেলেবেলায় সে বৈদ্য মুরারির খাবারের থালায় প্রস্রাব পর্যন্ত করে দিয়েছিল। বেচারী দুপুরে সবে খেতে বসেছিলেন। তাঁর অপরাধ, নিমাই তাঁকে ভেংচি কেটেছিল, মুরারি বৈদ্য তাকে কটুবাক্য বলেছিলেন।

বাল্যের এ সব ঘটনাই আমি জানি। বড় হয়ে লেখাপড়া শেখার পরে, সে বৈষ্ণবদের ধরে ধরে ফাঁকি জিজ্ঞাসা করত। অর্থাৎ বৈষ্ণবদের ধর্মীয় যুক্তি সম্পর্কে কূট প্রশ্ন করে তাঁদের বিপদে ফেলত, আর পরিহাস করত। এ সব কি নিতান্তই অর্থহীন? বোধ হয় না। নিমাইয়ের অবচেতন মনে, বৈষ্ণবদের ধ্যানধারণাকে যাচাই করে, আসলে তার নিজেরই ভবিষ্যতের পথকে একটা সংহত রূপ দিচ্ছিল। যদি বৈষ্ণবদের নিয়ে তার মনে কোন চিন্তাই না থাকবে, তবে তাদের নিয়ে তার মাথাব্যথারও কোন কারণ থাকত না।

নিমাই নবদ্বীপের বৈষ্ণব পরিবেশ সম্পর্কে সবই জ্ঞাত ছিল। সবই দেখছিল, শুনছিল আর তার ভিতরে ভিতরে গভীর ক্রিয়া করছিল। বৈষ্ণবরা তা সম্যক বুঝতে পারছিলেন না, দুঃখ করছিলেন, এমন জ্ঞানী গুণী রূপবান যুবক, বৈষ্ণবের ঘরে জন্ম নিয়েও, বৈষ্ণবদের প্রতি তার কোন আস্থা দেখা যাচ্ছে না। কী দুঃখের কথা!

কৃষ্ণ সম্পর্কেও যদুবংশ একসময়ে খুবই নিরাশ হয়েছিল। জরাসন্ধর ভয়ে তাঁরা যখন অত্যন্ত কাতর, হতাশ, তখন কৃষ্ণকেই তাঁরা একটা বিহিত ব্যবস্থার কথা বলেছিলেন। বিশেষ করে, কংস বধের পরে, মথুরা প্রতি মুহূর্তেই জরাসন্ধের আক্রমণের আশংকা করছিল। যদুবংশের সবাই স্থির করেছিলেন, নিরুপায় হয়ে তাঁদের যা কিছু সম্বল আছে, সব নিয়ে কোথাও চলে যাবেন। কিন্তু ব্রজের বালকটি নিজেকে ভিতরে ভিতরে প্রস্তুত করছিলেন। তাঁর ছিল তীক্ষ্ণ দূর-দৃষ্টি, রাজনীতি সম্পর্কে জ্ঞান ছিল অসাধারণ। তিনিও জানতেন, মথুরা আক্রান্ত হতে পারে। জরাসন্ধ যদুবংশকে ছারেখারে দিতে পারে। সেইজন্য, প্রথম ধাপ আন্দোলনের কৌশল হিসাবে, মথুরা পরিত্যাগ করা স্থির করেছিলেন। জানতেন, যে লোকবল ও অস্ত্রবল ছিল, তা নিয়ে জরাসন্ধের মুখোমুখি হওয়া সেই সময় সম্ভব ছিল না। সেই কারণেই সমস্ত যদুবংশ নিয়ে তিনি সুদূর

দ্বারকায় চলে গেছলেন। উদ্দেশ্য, সরে গিয়ে, এমন এক স্থানে থাকতে হবে, যেখানে যুদ্ধের প্রস্তুতি পর্ব চালাতে পারবেন।

যাই হোক, এটিই ইতিহাসের আর এক পথের সন্ধান দেয়। আপাততঃ আমার তা দরকার নেই। আমা'র বলবার উদ্দেশ্য, ভবিষ্যতের নেতাকে অনেক সময়েই চিনে ওঠা যায় না। হয়তো এক্ষেত্রে আধুনিক পৃথিবীর অনেক নেতার নাম করা যায়, যাঁদের নিয়ে আজকাল আমরা সর্বদাই আলোচনা করি। কিন্তু বিপ্লব-গর্বী কোন মানুষের মনে কী ভাবে আঘাত লাগবে, বলা যায় না। অতএব তাঁদের প্রসঙ্গ না তোলাই সঙ্গত। তবে ষোড়শ শতাব্দীর একেবারে গোড়াতেই, নবদ্বীপে যা ঘটছিল, তা একটি সংগঠিত আন্দোলন, এবং সেই আন্দোলন এক বিপ্লবেরই সৃষ্টি করেছিল।

নিমাইকে দেখলাম, বিষ্ণুপ্রিয়াকে আবার বিয়ে করল। বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতি তার মনোভাবেরও একটা পরিচয় অনেকটা নিবিড় করেই পেয়েছি। লক্ষ্মীর বিরহই তখনও তার সারা অন্তর জুড়ে। বিয়ে করলেও, ১৫০৫ খৃষ্টাব্দ থেকে, তিন বছরের মধ্যে নতুন কিছু ঘটতে দেখা গেল না। অন্ততঃ নিমাইয়ের ক্ষেত্রে সে যেমন ছাত্র পড়াচ্ছিল, তাই পড়িয়ে যাচ্ছিল। তার সঙ্গে বায়ুব্যাধিটি আছেই। তবে প্রকোপটা তেমন প্রকট নয়। কিন্তু বাইরে থেকে বড় শান্ত। টীকা ব্যাকরণের সঙ্গে বেদ ব্যাখ্যা করে। বৈষ্ণবদের সম্পর্কে কোন তেমন উচ্চবাচ্য নেই। বরং নির্বিকারই বলতে হবে।

ব্রাহ্মণ যবনে মৈত্রী—অর্থাৎ বৈষ্ণবদের সঙ্গে হরিদাসের কৃষ্ণ ভক্তি প্রচার। এ সব নিয়ে আন্দোলন একেবারে চাপা পড়েনি। তবে, যে কোন কারণেই হোক, বৈষ্ণবদের প্রতি পাষণ্ডীরা কিছুদিন নির্বিকার ছিল। কারণটা আসলে বৈষ্ণবদের নিজেদের মধ্যে একটা ব্যাকুলতা। তাঁরা যেন পথ খুঁজে পাচ্ছিলেন না। কৃষ্ণের অবতারকে তাঁরা খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। এই সন্ধানের আকুলতায় তাঁরা শ্রীবাসের বাড়িতে মিলিত হয়ে, আবার উচ্চস্বরে কৃষ্ণকে ডাকতে লাগলেন। নবদ্বীপের পাষণ্ডীরাও আবার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। এরা রাত্রে এত উচ্চস্বরে চিৎকার করে কেন? এরা দাস প্রভু ভেদ করে না। সবাইকে হরি বলে। মেগে খেতে বলে। এ তো অনাচার।

অতএব এ লোকগুলির ঘর দরজা ভেঙে ফেলে দাও। কারণ, এই 'বাসনা'গুলিই রাজ্যের সর্বনাশ করবে। এদের জাতিভেদহীন অনাচারে দেশে দুর্ভিক্ষ হবে। আর তা যদি হয়, ধানের দাম যদি বাড়ে, তবে এগুলিকে দেশ থেকে মেরে তাড়াতে হবে।

এ সবই হচ্ছে আন্দোলনের এক অংশ বিশেষ। একদিকে এরা ক্রিয়াশীল

না হলে, প্রতিক্রিয়াশীলরা নিজেদের মদমত্ত আনন্দে দিনযাপন করতে পারে। তা সম্ভব হচ্ছে না। আন্দোলনকারীরা বুঝতে পেরেছিলেন, নিরন্তর আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু তাঁদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। নগরের পথে পথে তাঁরা মিছিল নিয়ে বেরোতে পারছেন না। পরিবেশ অত্যন্ত প্রতিকূল। পাষণ্ডীরা সুলতানের কাছে লাগানি করে। এদের শায়েস্তা করার জন্য সব সময় হুমকি দেয়। একজন নেতা না হলে, কে তাঁদের পরিচালনা করবে? সেই অবতাররূপী নেতার জন্যই তাঁদের আকুলতা।

পাঁচ



নিমাই বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিয়ের পর তিন বছর কাটতে চলল। ১৫০৫ খৃষ্টাব্দ অতিক্রম করে ১৫০৮ খৃষ্টাব্দ এসে পড়ল। চারিদিকে দেখা যাচ্ছে, পাষণ্ডীরা বৈষ্ণবদের ওপর অত্যাচার করছে। বৈষ্ণবদের নিন্দা করছে। নিমাই সবই শুনছে দেখছে। আমি গভীর অভিনিবেশে দেখছি, আপাত শান্ত নিমাইয়ের অন্তরে প্রবল একটা আন্দোলন চলছে। বাইরে তার কোন প্রকাশ নেই। এই অবস্থায় সে মাকে বলল, 'মা আমি গয়া যাব বাবার উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করতে।'

নিমাইয়ের কথা শুনে শচীদেবীর মনে স্বামী-শোক উথলে উঠল। তিনি বললেন, 'গয়া যদি যাবি বাবা, তবে আমার নামেও একটা পিণ্ড দিয়ে আসিস।'

মৃত্যুর আগেই, ছেলেকে নিজের নামে পিণ্ডদান করতে বললেন। এ হল স্বামী-শোক, নিজের মৃত্যু-কামনা। এ কথা বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে আশ্বিন মাসে শচীদেবী এই কথা বললেন, কিন্তু বড় মর্মান্তিক তাঁর যন্ত্রণা। নিমাই বেঁচে থাকতে তিনি ছেলের হাতের পিণ্ড পাননি। কারণ নিমাইয়ের তিরোভাবের পরেও তিনি বেঁচে ছিলেন।

যাই হোক, নিমাইয়ের এ গয়া-গমনও একটি বিশেষ ঘটনা। চারদিকে পাষণ্ডীদের অত্যাচার, নিন্দাবাদ। নিমাই সবই দেখছে শুনছে। কিন্তু সে অশান্ত নয়। একটি বিশেষ ভাবনা নিয়েই তো গয়া গমন করল। একলা নয়, সঙ্গে আরও কয়েকজন গেলেন।

এখানে সকলের কাছে আমার একটি বিশেষ নিবেদন রাখছি। আমি সকলের ক্ষেত্রে 'আপনি' সম্বোধনার্থে সম্মানজ্ঞাপক ক্রিয়াদি ব্যবহার করছি। নিমাইয়ের বেলায় তা করছি না। তার কারণ, নিমাইকে যে ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি তার সঙ্গে একটা আলাদা সম্পর্ক যেন গড়ে উঠেছে। সে অতি নিকটের, বড় আপন। এটা অশ্রদ্ধা নয়। প্রিয় সে যদি মহাসম্মানীয় হয়, তবু তাকে আপন জ্ঞানে তুমি বলতে ইচ্ছে করে। এর মধ্যেই শ্রদ্ধা ভক্তি সম্মান সব কিছু মিলেমিশে আছে। বাহ্যিক সম্মানের থেকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ভালবাসা অনেক বড়। সেই কারণেই অন্যদের সম্পর্কে যে সম্মানজ্ঞাপক ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছি, নিমাই সম্পর্কে তা করিনি।

নিমাই গয়া যাচ্ছে। ঠিক তার আগেই হরিদাস নবদ্বীপে এলেন। নিমাইয়ের সঙ্গে দেখা হল না। কিন্তু হরিদাসের এই নবদ্বীপ আসা, নিমাইয়ের গয়ায় যাওয়া, এ সবের মধ্যে কি কোন যোগসূত্র আছে?

বোধ হয় আছে। আচার্য অদ্বৈতের কোন নির্দেশ ছিল কী না, জানা যায় না। তবে তিনিও তখন নবদ্বীপে। নিমাই কি কারুর কাছে এমন কিছু বলে গেছল, ভবিষ্যতের কথা ভেবেই আমি একবার গয়া ঘুরে আসি। আমি ইতিহাসের পাতায় নানা সন্ধানেও তা জানতে পারছি না। বৃন্দাবনদাস বলছেন, নিমাই মনে মনে এই রকম ভেবেছিল, সে পরভাবে আত্মপ্রকাশ করবে। তার আগে একবার গয়া ঘুরে আসবে। বৃন্দাবনদাসের এ কথার মধ্যে একটা সত্য থাকলেও থাকতে পারে। অন্তত নিমাইয়ের আচরণে বা কোন কথায়, এ রকম একটা ইঙ্গিত হয়তো ছিল। বৃন্দাবনবাস পরে তা তার মা এবং নিত্যানন্দের কাছে শুনে লিখেছেন।

নিমাই গয়া গেল। হরিদাস নবদ্বীপে এলেন তার প্রাক্কালেই। অদ্বৈত নিজেও তখন নবদ্বীপে। অবতারত্বের কারণ ও ব্যাখ্যা আগেই করেছি। যবন হরিদাসকে ইতিমধ্যেই লীলার সহচর ব্রহ্মার অবতার বলা হয়েছে। নিমাই বলল, 'ঘুরে আসি।' হরিদাস অদ্বৈতর সঙ্গে এসে মিলিত হলেন। বললেন, 'অনেকদিন বৈষ্ণব দর্শন হয়নি, তাই এলাম।'

অদ্বৈত তাঁকে প্রাণের অধিক করে রাখলেন। কিন্তু এই কি হরিদাসের নবদ্বীপে প্রথম আগমন? ইতিপূর্বে দেখা যাচ্ছে, বুঢ়ন গ্রামে হরিদাস অবতীর্ণ হন। সেখান থেকে গঙ্গাতীরে ফুলিয়ার শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। সেই ঘটনা, আর এই আগমনের মধ্যে অনেক সময়ের ব্যবধান। এতদিন হরিদাস কোথায় ছিলেন?

নিমাইয়ের বাবার মৃত্যুর সময়ে এবং লক্ষ্মীকে বিয়ের সময়ে কেউ কেউ

হরিদাসকে নবদ্বীপে দেখেছেন। কিন্তু নিমাইয়ের সঙ্গে তাঁর মিলনের কথা কেউই তেমন করে বলেননি। তবে এ কথা ঠিক, নিমাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের আগে, হরিদাস নবদ্বীপে এসেছিলেন। আসাই স্বাভাবিক। কারণ সেখানে বৈষ্ণবদের একটি সমাজ ছিল। তা হলে ১৫০৮ খৃষ্টাব্দে নিমাইয়ের গয়া যাবার ঠিক আগেই, প্রথম তিনি নবদ্বীপে আসেননি। ফুলিয়া শান্তিপুর নবদ্বীপ, এসব জায়গাতেই তাঁর যাতায়াত ছিল। কিন্তু একেবারে প্রথম দিকে, হরিদাসের বৈষ্ণব রূপে আবির্ভাব কাহিনী এখানে বলে নেওয়া দরকার। তখন তিনি নবদ্বীপে আসেননি।

বূঢ়ন গ্রামে হরিদাসের আবির্ভাবের কথা থাকলেও, তাঁর জন্মস্থান ছিল কলাগাছি। চৈতন্যচরিতকার জয়ানন্দ হরিদাসের বাবা-মায়ের নামও লিখেছেন। 'উজ্জ্বলা মায়ের নাম, বাপ মনোহর।' মুসলমানের নাম হিসেবে, একটু চমক লাগে। কিন্তু লাগবার কোন কারণ নেই এই জন্য, মুসলমান হলেই যে নামটা নিতান্ত মুসলমানী হবে, তার কোন নিশ্চয়তা ছিল না। তাছাড়া, ইসলাম, ধর্ম গ্রহণ করলেই যে নামও বদলাতে হবে, সেরকম কোন কঠোর বিধিনিষেধ তৎকালে ছিল না। থাকলে, উজ্জ্বলা আর মনোহর নাম থাকত না। হরিদাস নাম কি তিনি নিজেই নিয়েছিলেন? এ বিষয়ে ইতিহাস নীরব। ইতিহাসের পাতার ধূলি সরিয়ে আমিও যথার্থ কিছু জানতে পারছি না। চৈতন্যচরিতকারেরা নানা অলৌকিক ঘটনার কথা ব্যক্ত করেছেন। হরিদাসের বৈষ্ণব রূপে আবির্ভাবের আগেই, তাঁর সম্পর্কে অলৌকিকত্ব আরোপ করা হয়েছে। অপ্রয়োজনে নয়, প্রয়োজনেই। সে বিষয়ে আমি আগেই জানতে পেরেছি। অবতারত্ব মানেই অলৌকিক ঘটনা। এ বিষয়টিকে যে যে-ভাবে গ্রহণ করতে চায়, চিন্তা ভাবনা শিক্ষার দিক থেকে, তার সে স্বাধীনতা নিশ্চয়ই আছে। তবে সব কিছুর ক্রমপরিণতি যে একটি সংগঠিত আন্দোলনের দিকে এগিয়ে চলেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

হরিদাসকে কে কৃষ্ণনামে আকর্ষণ করলেন? বৈষ্ণবদের প্রতিই বা কেন তাঁর আকর্ষণ? এ কি তাঁর নিজস্ব কোন উপলব্ধি? অসম্ভব নয়। মানুষের প্রতি অবিচার যাঁর হৃদয়ে আঘাত করে, তিনি মুক্তির কথাও চিন্তা করেন। বূঢ়ন গ্রাম থেকেই আসুন, আর ভাটকলাগাছি গ্রামেই জন্মান, এমনও হতে পারে, কৃষ্ণ বিষয়ে হরিদাস নিজেই উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। অথবা তার আগে, কোথাও কৃষ্ণ নামের মহিমা ও তাঁর অবতারত্ব বিষয়ে কিছু শুনে থাকবেন। দেশে রাজার অত্যাচার, তার সুযোগে, নানা অনাচারের স্রোত তাঁকেও বিচলিত করেছিল।

হরিদাস গৃহত্যাগ করেছিলেন। গৃহত্যাগ করেই সোজা তিনি শান্তিপুরে আসেন-

নি। বেনাপোলের বনের মধ্যে কিছুকাল ছিলেন। আসলে বেনাপোল একটিগ্রামের নাম। বনাঞ্চল তার সংলগ্ন। দেখছি, গৃহত্যাগ করে বেনাপোলের জঙ্গলে যখন তিনি আস্তানা নিয়েছেন, তখন থেকেই একজন কৃষ্ণভক্ত। বনের মধ্যে কুটির করে, সেখানে তুলসী গাছের সেবা করেন। রাত্রে ও দিনে তিন লক্ষ নাম সংকীর্তন করেন। বনের বাইরে যেতেই হয়। দরজায় দরজায় ভিক্ষা করেন। তবে তাঁর মত লোক যে কেবল ব্রাহ্মণের দরজায় দরজায় ভিক্ষে করতেন, এমন মনে হয় না।

হরিদাস পরবর্তী কালে ব্রহ্মার অবতার। অর্থাৎ বৈষ্ণবদের আচণ্ডাল মুক্তি আন্দোলনের একজন বড় নেতা। নিজে মুসলমান। আচণ্ডালে মুক্তি যাঁদের সাধনা, তাঁরা কেবল ব্রাহ্মণের দ্বারস্থ হবেন, এমন মনে হয় না। তবে প্রতি ঘরে ঘরে গিয়ে কৃষ্ণনাম নিয়ে ভিক্ষে করতেন, এটাই স্বাভাবিক বলে মনে হয়। তাঁর তখন যুবা বয়স। দেখতেও সুপুরুষ ছিলেন। তাঁর ভক্তিভাব দেখে, লোকের মনের উপর তাঁর প্রভাবের বিস্তার ঘটছিল।

কিছু দিনের মধ্যেই, ব্যাপারটা, বেনাপোল গ্রামের জমিদার বা তালুকদার যাই হোক, রামচন্দ্র খানের কানে উঠল। সে লোকপরম্পরায় বিষয়টি যাচিয়ে দেখল। প্রথমে অবাক হল, এ রকম একটা লোককে সবাই শ্রদ্ধা ভক্তি করে। রামচন্দ্র খান ভাবত, গ্রামের লোক তাকেই সব থেকে বেশী মান্য করবে। কিন্তু কে একটা যবন, কৃষ্ণনাম নিয়ে বেড়াচ্ছে, তার প্রতি লোকের এত শ্রদ্ধা কিসের? সে ঈর্ষা বোধ করল। রেগেও গেল। হরিদাসকে জব্দ করার নানান উপায় ভাবতে লাগল। এমন ভাবে তাকে জনসমক্ষে অপমান করতে হবে, যাতে সে এখান থেকে পালায়। হরিভক্তিও চটে যায়।

রামচন্দ্র বেশ্যাদের ডেকে আনল। একটি সুন্দরী যুবতী বেশ্যাকে বেছে নিয়ে বলল, 'তুমি এর বৈরাগ্যধর্ম নাশ কর। তুমিই উপযুক্ত পাত্রী।'

বেশ্যাটির নিজের রূপ সম্পর্কে নিশ্চয়ই অহংকার ছিল। হয়তো রামচন্দ্র খানের মত পুরুষদের মন জয় করে তার ধারণা হয়েছিল, যে কোন পুরুষের মনই সে জয় করতে পারবে। সে খানকে কথা দিল, 'তিন দিনের মধ্যেই আমি এই বৈরাগীর মনোহরণ করব।'

খান বলল, 'আমার পাইক তোমার সঙ্গে যাক। তোমার সঙ্গে যখনই সে রত হবে, পাইক তাকে ধরে আনবে।'

বেশ্যা বলল, 'প্রথম দিনটা যাক। একবার সঙ্গ হোক। দ্বিতীয় দিনে সঙ্গকালে তোমার পাইক যাবে।'

খান রাজী হল। রূপসী বারাঙ্গনা রাত্রে নানা ভাবে সেজেগুজে হরিদাসের কুটিরে গেল। নানা হাস্যে লাস্যে ঘরের সামনে গিয়ে তুলসীতলায় আগে নমস্কার করল। বোঝাতে চাইল, সেও একজন ভক্তিমতী। তারপরে হরিদাসকে নমস্কার করে, তার দরজায় বসল। গায়ের কাপড় খুলে, অঙ্গের যৌবন দেখাল। বলল, 'ঠাকুর, তোমার এই পরম সুন্দর প্রথম যৌবন দেখে, কোন নারী স্থির থাকতে পারে না। আমি সেই জন্যই এসেছি, তোমার সঙ্গে সঙ্গমের সুখ চাই। তা নইলে প্রাণে মরব।'

হরিদাস বললেন, 'তোমার কথাই থাকবে। তুমি বস। যতক্ষণ আমার নাম সংকীর্তন শেষ না হয়, ততক্ষণ শোন। তারপরে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করব।'

গণিকা মনে মনে আশা নিয়ে বসে রইল। কিন্তু নাম গান শেষ হতে হতেই রাত পোহাল। সকাল হয়ে গেছে দেখে, গণিকা সুন্দরী আর বসে থাকতে পারল না। তাড়াতাড়ি রামচন্দ্র খানের কাছে গিয়ে ঘটনা বলল, কিন্তু একটু মিথ্যে বলল। বলল, 'ঠাকুর অঙ্গীকার করেছে, আজ রাত্রে তার সঙ্গে আমার অবশ্যই মিলন হবে।'

রমণী আবার রাত্রে হরিদাসের কুটিরে গেল। আজ সে সর্বাঙ্গ উদাস করে দেখিয়ে নানা ছলাকলা করল। হরিদাস বললেন, 'কাল তোমার অঙ্গীকার রক্ষা করা সম্ভব হয়নি, আমার অপরাধ নিও না। আজ নিশ্চয়ই তোমার অঙ্গীকার রাখব। তুমি নামসংকীর্তন শোন। নাম নেওয়া পূর্ণ হলেই তোমার মনস্কামনাও পূর্ণ করব।'

বেশ্যাও ছলনা করে তুলসীতলায় নমস্কার করে দরজায় বসে নাম শুনতে লাগল। শুনতে শুনতে নিজেও হরিধ্বনি দিয়ে উঠল। আবার সেই রাত্রি শেষ। বেশ্যা অধীর হয়ে উঠল। এ অধীরতা সাধারণ বেশ্যার অধীরতা নয়। তার এমন রূপ যৌবন, সব কিছু বস্ত্রের আড়াল থেকে উদ্ঘাটন করে দেখাচ্ছে, রমণের জন্যে ব্যাকুলতা প্রকাশ করছে, অথচ এ মানুষের কোন বিকার নেই। উপরন্তু বলে, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করব। নামকীর্তন শেষ হোক। বিরক্ত হয় না, রাগ করে না, তাড়িয়ে দেয় না। বরং বসতে বলে। আর বসে হরিদাসের নাম শুনতে শুনতে, তার নিজের চিত্তেই যে কোন্ এক অজানা মুহূর্তে পরিবর্তন শুরু হয়ে গেছে, সে নিজেও বুঝতে পারছে না। ভিতরে কেবল একটা অধীরতা অস্থিরতা অনুভব করছে।

রাত্রিশেষে, প্রভাতে হরিদাস বললেন, 'এক মাসে কোটি নাম যজ্ঞ করব, এই দীক্ষা করেছি। শেষ হয়ে এলো। ভেবেছিলাম আজ রাত্রেই নামকীর্তন শেষ হবে। কিন্তু হল না। কাল শেষ হবে, আমার ব্রতও শেষ হবে। তখন তোমার

সঙ্গে আমার সঙ্গ হবে।

বারাঙ্গনা ফিরে গিয়ে রামচন্দ্র খানকে সব কথা বলল। বলল, 'আজ রাত্রে নিশ্চয়ই সঙ্গ হবে।'

সে আবার রাত্রে গেল। কিন্তু তার মনে যে আন্দোলন শুরু হয়েছে, সে কথা নিজেই বুঝতে পারছে না। যেমন আসে, তেমনি এলো। তুলসীতলায় প্রণাম করে, হরিদাসকে নমস্কার করে দরজায় বসল। হরিদাস বললেন, 'আজ আমার নাম পূর্ণ হবে। তোমার অভিলাষও পূর্ণ হবে।

হরিদাস নামকীর্তন করছেন। গণিকা সুন্দরী থাকতে পারছে না। তার বুকেও উচ্ছ্বাস। সেও হরি হরি বলতে আরম্ভ করল। রাত্রি শেষ হল। গণিকা আর গণিকা নেই। সেও ঠাকুরের সঙ্গে নামকীর্তন করছে। করতে করতে হরিদাসের পায়ে লুটিয়ে পড়ল। বলল, 'আমি তো তোমার কাছে নাম শুনতে আসিনি। আমি কুলটা মাত্র। রামচন্দ্র খানের কথায় তোমাকে ভোলাতে এসেছিলাম। এখন নিজেই নামে ভুলেছি। কিন্তু ঠাকুর, আমি তো আর কুলটাবৃত্তি করতে পারব না। তুমি আমার সে প্রবৃত্তি শেষ করে দিয়েছ। এখন আমার মুক্তি কিসে, তাই বল।'

হরিদাস এখানে অন্তর্যামীর ভূমিকা নিয়েছেন। যেন তিনি সবই জানতেন। কেবল এই রমণীকে উদ্ধারের জন্যই তিনি থেকে গেলেন। নইলে আগেই চলে যেতেন। এ সব ক্ষেত্রে এটাই রীতি। ভুল কিছু হয়নি। তবে এটা নিশ্চয়, বনের কুটিরে সহসা সুন্দরী রমণীর আবির্ভাব, নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোন ষড়যন্ত্র আছে। হরিদাস এখানেই বিশিষ্ট। বেশ্যা কুলটা বলে তাকে নিরাশ করলেন না। কারণ, আচণ্ডালে মুক্তি যাঁর সাধনা, তাঁর কাছে বেশ্যা অগ্রাহ্য হতে পারে না। তিনি বললেন, 'মুক্তির উপায় একমাত্র নামকীর্তন। যদি পারো, তাই কর। আর সব ত্যাগ কর।'

বেশ্যা তাই করল। কুলটাবৃত্তি ত্যাগ করে, ঘরের যা কিছু, সব লোককে দান করে দিল। নিজের রূপ নষ্ট করার জন্য, মাথা মুড়িয়ে ফেলল। তারও সংকল্প, তিন লক্ষ নামকীর্তন—প্রতিদিন। সেই বেশ্যাই পরবর্তীকালে হল বৈষ্ণবী 'পরম মহান্তী।' অর্থাৎ মহৎ অন্তঃকরণবতী। সাধারণ মানুষ সহজে কিছু গ্রহণ করে না। তারা প্রথমে অবাক হল। ক্রমে ক্রমে রমণীর ত্যাগ ও নাম-কীর্তন শুনে সবাই চমৎকৃত। বড় বড় বৈষ্ণবরাও তার দর্শনে আসতে লাগল।

হরিদাস বেনাপোলে বসে রইলেন না। তাঁর যাত্রা বহুদূর। বেশ্যাকে উদ্ধার

করে, তিনি এটাই প্রমাণ করলেন, মুক্তির দরজা সকলের জন্যই খোলা। তিনি সেখান থেকে এমন কয়েকটি স্থানে গেলেন, যেখানে ব্রাহ্মণরা বৈষ্ণবদের প্রতি বিরূপ। এই বিরূপতা দূর করতে না পারলে, ভবিষ্যতের আন্দোলনের পথ সুগম করা যাবে না। সেখান থেকে তিনি গেলেন বন্দেপুর গ্রামে। হিরণ্য গোবর্ধনের পুরোহিত বলরাম আচার্যের ঘরে কিছুদিন থাকলেন।

এ সব থেকে বোঝা যায়, কোথায় প্রকৃত বৈষ্ণব আছেন, হরিদাস তা জানতেন। এখানে বৈষ্ণব অর্থে, যারা নতুন একটা পরিবর্তনের কথা ভাবছিলেন। বন্দেপুর কোথায়? হিরণ্য গোবর্ধন কি সপ্তগ্রামের অধিবাসী? কেননা, দেখা যাচ্ছে, মজুমদার উপাধি-ধারী এই ব্রাহ্মণ গৌড়ের বাদশাহের বিশেষ অনুগৃহীত। বারো লক্ষ মুদ্রা তাঁর আয়। এখানেও হরিদাস নামের মহিমা প্রচার করলেন। হিরণ্য দাস অবশ্য বিরোধিতাই করেছে। পরে পরম ভক্ত হয়েছে।

এখান থেকেই হরিদাস প্রথম গেলেন ফুলিয়ার শান্তিপুরে, আচার্য অদ্বৈতর কাছে। আসলে, এখানে আসাই তাঁর বড় উদ্দেশ্য ছিল। কেননা, তিনি জানতেন, আচার্য অদ্বৈতই তখন ভবিষ্যৎ বিপ্লবের নেতৃত্ব করছেন। নিমাইয়ের সে সময়ে জন্ম হয়নি। নিমাই পরে এ সব ঘটনা শুনেছে।

আচার্য অদ্বৈতও সম্ভবতঃ এই যবন হরিদাসের কীর্তি-কাহিনী শুনেছিলেন। তিনি তাঁর সাক্ষাতের অপেক্ষায় ছিলেন। হরিদাসের সঙ্গে সাক্ষাৎমাত্র, ব্রাহ্মণ আচার্য হরিদাসকে আলিঙ্গন করলেন, সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করলেন। কেন না, তাঁদের উদ্দেশ্য এক। অদ্বৈত দেখলেন, হরিদাস কেবল নামকীর্তন করেন। তিনি তাঁকে ভগবত গীতার ব্যাখ্যা শোনালেন।

শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যের ঘরেই হরিদাসের ভিক্ষা। তিনিই হরিদাসকে সেবা করছেন। আর হরিদাস গঙ্গাতীরে ঘুরে ঘুরে কেবল নামকীর্তন করেন। এখান থেকেই মুলুকপতির হুকুমে তাঁকে গ্রেপ্তার করে, বাইশ বাজারে চাবুক মারতে নিয়ে যাওয়া হয়। এক বাজারে নয়, বাইশ বাজারে ঘুরে ঘুরে চাবুক মারা সাংঘাতিক কথা। কাজীর হুকুম, মেরে এর প্রাণ লহ।

সাধারণের সঙ্গে অসাধারণের এখানেই তফাত। বাইশ বাজারের প্রচণ্ড প্রহারেও হরিদাস মরলেন না। মুলুকপতি অবাক! অবশ্য হরিদাস নাকি এমন লীলা দেখিয়েছিলেন, তিনি মৃত্যুই বরণ করেছেন। তখন তাঁর মৃতদেহ মুলুকপতির কাছে নিয়ে গেলে, তিনি হরিদাসকে কবর দিতে বললেন। কাজী প্রতিবাদ করে বললেন, 'এ লোককে কবর দিলে এর পুণ্যিই হবে। যবন হয়ে

হিন্দু ধর্মাচরণ করে। একে গঙ্গায় ফেলে দেওয়া হোক।'

হরিদাসকে গঙ্গায় ফেলে দেওয়া হয়েছিল। যা-ই ঘটুক. হরিদাসকেই বলতে হবে এ আন্দোলনের প্রথম শহীদ। বাইশ বাজারে বেত্রাঘাতের ঘটনা হোসেন শাহের সময়ের ঘটনা নয়। হরিদাস যখন শান্তিপুরে গেছলেন, সে সময়েই তিনি গোঁফায় বসে নামকীর্তন করেছিলেন। অদ্বৈতও তখন শান্তিপুব আর নবদ্বীপ যাতায়াত করছিলেন আন্দোলনকে সংগঠিত করার জন্য। নিমাইয়ের জন্ম তখন আসন্ন। গৌড়ে রাজত্ব করছিলেন ফতেশা।

হরিদাস ইতিমধ্যে অদ্বৈতর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য নবদ্বীপে নিশ্চয়ই এসেছেন। হয়তো তিনি নিমাইকে দেখেছেন। নিমাইও নিশ্চয় ছেলেবেলায় হরিদাসকে দেখেছে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে যে 'মহামিলন' ঘটেছিল, সেটি পরের ঘটনা। নিমাই হরিদাসের প্রতি নির্মম অত্যাচারের কথাও আগেই শুনেছে। সে ঘটনা তার অবচেতনে যে ক্রিয়া করছিল, তখন কিছুই জানা যায় নি। নিমাই কোন কথাই ভোলবার পাত্র নয়।

নিমাইয়ের গয়া-গমন একটি অসামান্য ঘটনা। সবই যেন একটি বিশেষ প্রয়োজনে ঘটছে। অথচ বাইরে থেকে মনে হচ্ছে, সবই নিতান্ত ঘটনাপরম্পরা মাত্র। কিন্তু সমস্ত ঘটনাগুলি পর পর দেখলে, মনে হয় যেন, একটি বিশেষ লক্ষ্যের দিকে সকলের যাত্রা। নিত্যানন্দ এখনও এসে পৌছোননি। হরিদাস এলেন অদ্বৈত নবদ্বীপ ত্যাগ করলেন না। নিত্যানন্দ তখন বৃন্দাবনে। তাঁর আসার এখনও সময় হয়নি। তাঁর জীবন সম্পর্কে আলোচনার আগে, একটি কথাই এইখানে জেনে রাখা দরকার। মাধবেন্দ্র পুরীর সঙ্গে নিত্যানন্দের তখন গভীর ভাব। কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারেন না। আর এই মাধবেন্দ্র পুরীই হলেন আচার্য অদ্বৈতর গুরু। নবদ্বীপের বৈষ্ণবদের সঙ্গে মাধবেন্দ্র পুরীই বাইরের থেকে যোগসূত্র রক্ষা করছিলেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। নিত্যানন্দ প্রথমেই বৈষ্ণব ছিলেন না। অনেক পথে ঘুরে, মাধবেন্দ্র পুরীর সঙ্গে তাঁর মিলন হয়েছিল। পরবর্তীকালে সেই মিলনই নিত্যানন্দকে নবদ্বীপে আসবার প্রেরণা যুগিয়েছিল। কারণ বাইরে থাকলেও মাধবেন্দ্র পুরী নবদ্বীপে কী ঘটতে চলেছে, সবই জানতেন। জানাই স্বাভাবিক। কেন না, অদ্বৈত তাঁর শিষ্য। অদ্বৈত যা করছিলেন, অর্থাৎ কৃষ্ণের অবতার সন্ধান করে, আন্দোলন সংগঠিত করছিলেন, তার মধ্যে মাধবেন্দ্র পুরীর প্রেরণা ছিল। এ হল গুরু শিষ্য কথা।

ছয়



ইতিহাসের পথ ধরে এবার নিমাইয়ের গয়া গমনের ঘটনা দেখি। অবশ্য আমি আগেই জেনেছি, নিমাইয়ের গয়া গমনের উদ্দেশ্য, পিতাকে পিণ্ড দান। কথাটা অনেক দিন পরে নিমাইয়ের মনে এসেছে। পিতা মারা গেছেন তেরো বছর আগে। ইতিমধ্যে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। নিজে দুবার বিয়ে করেছে। পূর্ববঙ্গ ঘুরে এসে, নতুন করে অধ্যাপনা চলছিল। বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিয়ে করার তিন বছর পরে মনে হল, গয়ায় গিয়ে পিতার পিণ্ডদান করে আসবে।

গয়া যাবার পথে কিছু ছোটখাটো ঘটনা ঘটল। একলা যায়নি। সঙ্গে সঞ্জয় মুকুন্দ এঁরা ছিলেন। পথিমধ্যে নিমাইয়ের জ্বর হল। পথে আর বৈদ্য কোথায়! নিমাই তো আর সে নিমাই নেই। বলল, ব্রাহ্মণের পাদোদক পান করলেই সর্ব জ্বর নাশ হবে। সে বিপ্রের পাদোদক পান করল। এ সবই কি একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য? সকলেই নিমাইয়ের ভক্তি দেখে সুখী। নিমাই সবাইকে নিজের প্রতি আকর্ষণ করছে।

গয়ায় গিয়ে পিতার পিণ্ডদান করল। চক্রবেড়ের ভিতর গেল পাদপদ্ম দর্শন করতে। কেমন একটা ভাবের ঘোর। যা কিছু দেখছে, যা কিছু শুনছে, একটা আনন্দ আচ্ছন্নতার মধ্যে নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলছে। এই সময়ে, 'দৈবযোগে' ঈশ্বরপুরী গয়ায় এসে উপস্থিত! এই সেই ঈশ্বরপুরী, যিনি নিজেকে 'শূদ্রাধম' বলেছিলেন, নিমাই যার কাছে বিতর্কে পরাজিত হয়েছিল। সেই ঈশ্বরপুরী 'দৈবযোগে' গয়ায় এলেন! কেন এলেন, কী কারণে এলেন, তার কোন ব্যাখ্যা নেই। একটা ব্যাখ্যা স্বয়ং ঈশ্বরপুরী করেছেন, 'যেন আজ সুখ-স্বপ্ন দেখলাম। তোমার সাক্ষাতে সেই ফল পেলাম।'

নিমাই ঈশ্বরপুরীর কাছে তর্কে পরাজিত হয়েছিল। কিন্তু তখন তার বেশি কিছু আর ঘটেনি। এবার দর্শন মাত্র নিমাই শ্রদ্ধাভরে তাঁকে নমস্কার করল। তিনি নিমাইকে আলিঙ্গন করলেন। ঈশ্বরপুরীর স্বপ্ন কি প্রকৃত স্বপ্ন? না কি তাঁর এই সময়ে গয়ায় আসা একটি পূর্ব-পরিকল্পিত ঘটনা? সম্ভবতঃ তাই। ঈশ্বরপুরী

না এলে, নিমাইয়ের অবতারত্ব প্রকাশের প্রথম প্রয়োজন মিটতে পারে না।

কেমন অবতার? কৃষ্ণের অবতার। কৃষ্ণের অবতার যে হবে, তার মধ্যে কৃষ্ণভক্তি চাই। তাকে এমন একটা উচ্চমার্গে উঠতে হবে, যখন তার অবতারত্ব সম্পর্কে আর কোন সন্দেহের অবকাশ না থাকে। অর্থাৎ, নেতা হতে হলে তাকে সকলের সামনে, নেতৃত্বের উপযুক্ত বলে গ্রাহ্য হতে হবে।

সময় ষোড়শ শতাব্দীর একেবারে শুরু। বারেবারেই এ কথাটা বলতে হচ্ছে, জনসাধারণের মনের অবস্থাটা সময়ের নিরিখে বিচার করবার জন্ত। অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন পুরুষ ছাড়া, কেউ অবতার হতে পারেন না। অলৌকিক শক্তি জন্মায় কেমন করে? যাঁর মধ্যে সেই শক্তি আছে, যে শক্তি দ্বারা ঈশ্বরের ইচ্ছাকে প্রকাশ করতে পারেন। তার জন্য দরকার ত্যাগ, ভক্তি, ধ্যানযোগ।

নিমাই এতদিন এক রকম ছিল। তার বায়ুব্যাধি আমি দেখেছি। তার অন্তরের গভীরে যে আন্দোলন চলছিল, তার যথার্থ স্বরূপটি পূর্ণরূপে দেখতে পাইনি। লক্ষ্মীর জন্য বিরহের প্রাকৃত রূপের সঙ্গে অপ্রাকৃতের মেশামিশির একটা আচ্ছন্নতা আমরা দেখেছি। বিষ্ণুপ্রিয়া যা পারেনি সেই বিরহ ভোলাবার জন্য, আর এক প্রেম চাই। সেই প্রেমানুভূতি না হলে, নিমাইয়ের নিজের অন্তরে শান্তি ছিল না।

আন্দোলনের স্বরূপটি কেমন, তা আমি জেনেছি। স্ত্রী শূদ্র চণ্ডালাদি সকলের মুক্তি। এ মুক্তি তো কতকগুলি নিতান্ত পূজাপাটের মধ্যে দিয়ে হতে পারে না। বৃহত্তর কিছু চাই। যেখানে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করা যাবে। নিতাইয়ের অবচেতনে আন্দোলনের স্বরূপটি ঘুমিয়ে আছে। তার আত্মপ্রকাশ অর্থাৎ নেতৃত্বের ভিতর দিয়েই, সেই আন্দোলনের স্বরূপটি ফুটে উঠবে।

নিমাইয়ের অন্তরের অবস্থার মধ্যেই, অলৌকিক শক্তি বিরাজ করছিল। অথচ 'সংসার অনিত্য' এ বোধও তার হৃদয়ে শিকড় গেড়েছে। ঈশ্বরপুরীর ভক্তিবাদের কাছে পরাজয়, সেটিও হৃদয়ে গাঁথা ছিল। কিন্তু অলৌকিক শক্তিই বা কী? আমরা বর্তমান সময়ে, অনেক অনেক রকম অলৌকিক কলাকৌশল দেখে থাকি। এ যুগের ভাষায় তা অনেকটা ম্যাজিকের মত। ইন্দ্রজাল। এখানে সে অলৌকিকত্বের কথা বলা হচ্ছে না। এ অলৌকিকত্ব হৃদয়ের গভীর অনুভূতি। তীব্র আকাঙ্ক্ষা, প্রেমাস্পদকে পাবার প্রগাঢ় ইচ্ছা। যা আর সবই ভুলিয়ে দেয়। অন্তরের হাহাকার। এ অর্থে, একে অলৌকিক আখ্যা না দিয়ে, বাস্তবেই হৃদয়ের এক ধ্যানমগ্ন উচ্চ ভাবদশা বলা যায়। কবিতা সৃষ্টির

মত। কবি তাঁর ধ্যানমগ্নতায় যা দেখতে পান, সকলে তা দেখতে পায় না। কবি তাঁর লীলা করেন, আমরা তার সুধারস পান করি। আমিও তখন লীলার অংশীদার। কিন্তু কবির ধ্যানমগ্নতার সকল দর্শন আমারও ঘটবে, এমনটি না হওয়াই সম্ভব। তা হলে সকলেই কবি হতে পারতাম!

নিমাইয়ের অন্তরে সেই হাহাকার বর্তমান। অবচেতনে একটি ব্যাকুলতা। ঈশ্বরপুরীর কৃষ্ণভক্তি। লক্ষ্মীর বিরহ। মনে সেই উচ্চ ভাবদশা উপস্থিত। এখন সেই দর্শনের সময় আসন্ন। এই অবস্থায় গয়া আগমন। দৈবযোগে, ঈশ্বরপুরীও গয়ায় এসেছে। নিমাইয়ের প্রথম মনে পড়ল, ছ'বছর আগে, ঈশ্বরপুরীর কাছে তার সেই পরাজয়ের কথা। সে ঈশ্বরপুরীকে বলল, 'তোমাকে যখন থেকে নবদ্বীপে দেখেছি, সেই থেকে আমার চিত্তে আর কিছুই চিন্তা নেই। তোমার কথা আমার সর্বদাই মনে হয়েছে। তুমি আমাকে কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃত রস পান করাও, এই দান চাই।'

ঈশ্বরপুরী বললেন, 'আমি তো দেখি, তুমি নিজেই ঈশ্বরের অংশ। তোমাকে দেখেও সুখ।'

নিমাই বলল, 'আমার এত বড় ভাগ্য!'

তারপরে শ্রাদ্ধাদি মিটিয়ে, ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে রান্না করে আহার করল। নিজ হাতে ঈশ্বরপুরীর গায়ে দিব্য গন্ধ বস্তু মাখিয়ে দিল, আর বারে বারে বলতে লাগল, 'তোমাকে পেয়ে মনে হচ্ছে, আমি কৃষ্ণধন পাব। তুমি আমাকে দয়া কর। তুমি আমাকে মন্ত্রদীক্ষা দাও। আমি তোমার মন্ত্র সার করব।'

ঈশ্বরপুরী অন্যথা করলেন না। নিমাইকে মন্ত্রদান করলেন। দশাক্ষরে মন্ত্রের গ্রহণ হল। লীলারও শুরু হল। মন্ত্র গ্রহণের পরেই, যে গাম্ভীর্য, আচ্ছন্নতা নিমাইয়ের ছিল, তার মধ্যে একটা অস্থিরতা দেখা দিল। সে গয়াতেই কিছু-দিন বাস করল। বাড়ি যাবার নাম করে না। তার ভাবাবেশ দেখা দিল। সঞ্জয় মুকুন্দকে বলল, 'তোমরা সবাই ফিরে যাও। আমি আর সংসারে ফিরে যেতে চাই না। আমি মথুরায় যাব। সেখানেই আমার প্রাণনাথ আছেন।'

কিন্তু নিমাই মথুরায় গেলে, সবই যে পণ্ড হয়ে যাবে। তার জন্য যে নবদ্বীপে সকলে অধীর অপেক্ষায় আছেন। মথুরায় যাওয়া চলে না। তার জন্য দৈববাণী হল। দৈববাণী বাইরের নয়: অন্তরের নির্দেশ। দৈববাণী সেখান থেকেই শোনা গেল, 'লোক নিস্তারিতে তুমি এসেছ। মথুরায় নয়, তুমি নবদ্বীপে ফিরে চল।'

নিমাই নবদ্বীপে ফিরে চলল। কেউ কেউ দৈববাণীর কথা আদৌ বলেননি।

সঙ্গর মুকুন্দ গদাধরের কান্নাকাটিতে সে নবদ্বীপে ফিরে এলো। গয়ায় গেছল পিতার পিণ্ডদানের উদ্দেশ্যে। মন্ত্রদীক্ষা ঘটে গেল যেন অকস্মাৎ। গয়ায় গেছল আশ্বিন মাসে। নবদ্বীপে ফিরে এলো মাঘ মাসে। মতান্তরে পৌষ মাসে। মাঘ মাসের কথাটাই বোধ হয় সত্য। কেউ বলছেন ঈশ্বরপুরীর কাছে মন্ত্রদীক্ষা গয়ায় হয়নি। গয়া থেকে ফেরবার পথে, নিমাই সপার্ষদ রাজগীর গেছল। সেখানেই মন্ত্রদীক্ষা হয়েছিল।

কবি লোচন অবশ্য নদীয়া নাগরী ভাবের কোন ব্যত্যয় করেননি। নিমাই-য়ের গয়া-গমনের চিত্রও তিনি দেখলেন, নিমাইকে পথে যেতে দেখে, 'কুলবধূ ধায় সব কুল ত্যাগ করি।'…এখানে আবার ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে সাক্ষাতের বর্ণনাও আলাদা। গয়া যাবার পথেই নাকি ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে নিমাইয়ের দেখা হয়েছিল। আর পথেই নিমাই কৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষা চাইল। আর পুরী 'গোপীনাথ মহামন্ত্র' নিমাইকে দান করলেন। আর এক চরিতকার বললেন, 'গোপালমন্ত্র দশাক্ষর' দান করলেন। কিন্তু গোপাল আর গোপীনাথ একটা বাৎসল্য, আর একটা মাধুর্য। দুইয়ের মধ্যে তফাত আছে। নিমাইয়ের মধ্যে প্রথমে কোন্ ভাবটি ভাবাবেশ সৃষ্টি করল? দেখা গেল, কখনও সে কৃষ্ণকে ডাকছে। আবার কখনও রাধাকে ডাকছে। ক্ষণে কৃষ্ণ, ক্ষণে রাধা। প্রাকৃতে এ হল লক্ষ্মীর জন্য বিরহ। অপ্রাকৃতে তা কৃষ্ণ হয়ে রাধার জন্য বিরহ, রাধা হয়ে কৃষ্ণের জন্যে বিরহ। প্রাকৃত থেকেই অপ্রাকৃতে এটি রূপান্তরিত হয়েছে। ছেলেবেলা থেকে, নিমাই এতকাল বৈষ্ণবদের কাছে যা শুনে এসেছে, আর নিজের অন্তরের যে হাহাকার থেকে মুক্তি খুঁজছিল, তার একটি বিশেষ বাণী হঠাৎ তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, 'পেয়েও জীবনকানাইকে হারালাম'।

নিমাইয়ের ভাবাবেশ সবাই লক্ষ করছিলেন। কিন্তু এ কথাটি সকলের কাছে রহস্যজনক মনে হল। কে সে জীবনকানাই—যাকে পেয়েও সে হারিয়েছে? সবাই জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপারটা বুঝতে চাইলেন। নিমাই বলল, 'তমালের মত এক শ্যামল সুন্দর বালক, নবগুঞ্জার সঙ্গে মনোহর কুণ্ডল। তার মাথার উপরে বিচিত্র ময়ূরপুচ্ছের শোভা। ঝলমল মণির দিকে চোখ রাখা যায় না। হাতে তার মোহন বাঁশি। তাকে আমি দেখলাম, গয়া থেকে ফেরবার পথে কানাইয়ের নাট্যশালা গ্রামে। সে হাসতে হাসতে আমার কাছে এলো। আমাকে একবার আলিঙ্গন করেই পালিয়ে গেল।'

এ কথা থেকেই স্পষ্ট হয়ে গেল, 'পেয়েও জীবনকানাইকে হারালাম।' অনুভব করছি, আমার আধুনিক যুক্তিগ্রাহ্য মন সন্দিগ্ধ হয়ে উঠছে। আমার সময় এবং

সাধারণ মানুষের বিশ্বাস ধ্যানধারণার কথা আগেই বলেছি। নিমাইয়ের মানসিক অবস্থা আমি দেখেছি। সে যা দেখেছিল, তা সম্পূর্ণ সত্য। সে মিথ্যা দেখেনি, মিথ্যা বলেওনি। এ দেখা নিমাইয়ের পক্ষে এতটাই সত্য, যে অবতারত্ব আরোপের কথা বৈষ্ণবরা চিন্তা করেছিলেন, তার সময়কে অতিক্রম করে, নিমাইয়ের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত, 'পেয়েও জীবনকানাইকে হারালাম' বলে কেঁদেই কেটেছে। বাস্তববাদী যুক্তিশীল মনে প্রশ্ন উঠবে, নিমাইয়ের সঙ্গে সঞ্জয় মুকুন্দ গদাধর, যাঁরা ছিলেন, তাঁরা কেউ কিছু দেখতে পেলেন না, নিমাই কী করে দেখল।

আমার এ প্রশ্নের জবাবও আগেই পেয়েছি। কবির মনের উচ্চ ভাবদশায়, তার যা দৃষ্টিগোচর হয়, অন্যের তা হয় না। রামকৃষ্ণদেবের তুলনা দিলেও, আধুনিক বাস্তববাদী মনে একই প্রশ্ন জাগবে। সেই জন্যই, কবিকল্পনার তুলনা। কবির মগ্ন চৈতন্যে যে দর্শন ঘটে, তিনি তা নিয়ে লীলা করেন। লীলা হল তাঁর প্রকাশকবিতা। আমরা তারই রসাস্বাদন করি। কিন্তু আমাদের সে-দর্শন ঘটে না। নিমাইয়ের দীর্ঘকালের অবচেতনে যে লীলা চলছিল, লক্ষ্মীর বিরহে তা এক অন্য দশায় উপস্থিত হয়। সেটি হল, অন্তরের এক হাহাকার। সেই হাহাকার নিয়েই গয়াযাত্রা। ঈশ্বরপুরীর সাক্ষাৎ, কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা। এ অবস্থায় নিমাই যা দেখতে পারে, তা যে সকলেই দেখবে, তা নয়। সংসারে মায়াবদ্ধ জীবের সকলের সবকিছু যদি দর্শন ঘটত, তা হলে সকলেই যুগপুরুষ হত। কিন্তু ইতিহাস তা বলে না।

এ ক্ষেত্রেও তাই ঘটল। যা নিমাইয়ের পক্ষে অতি সত্য, তা সর্বসাধারণের জন্য নয়। প্রাকৃত থেকে অপ্রাকৃতে রূপান্তরিত ঘটনা। আবার, একবার যখন অপ্রাকৃত একজনের গোচরীভূত হয়, তা আর প্রাকৃতের দৃষ্টিগোচর হয় না। লক্ষ্মীর বিরহ ঘুচল। অন্য এক প্রেমের আকর্ষণ নিমাইকে টেনে নিয়ে চলল। ছ'বছর আগের নিমাই আর এ নিমাইয়ে অনেক প্রভেদ। তার জীবনের গতি পরিবর্তিত হচ্ছে, একদিকে যেমন এই অপ্রাকৃত দর্শন ঘটছে, তার মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে, তেমনিই লোকচক্ষে সে এক বিশিষ্টতাও অর্জন করছে। সেই বিশিষ্টতাই সবাইকে বিস্মিত করছে।

প্রথমেই দেখা গেল, নিমাই বড় বিনীত ব্যবহার করছে। এটা তার স্বভাবের একেবারে বিপরীত। প্রচলিত যে কোন প্রথার বিরুদ্ধে যে উদ্ধত ব্যবহার করেছে, সে অত্যন্ত বিনীত হয়ে উঠেছে। আগামী আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুতের এটা একটা নতুন পথ। আবার তার সঙ্গে এটাও সত্য, নিমাইয়ের মধ্যে প্রকৃতই পরিবর্তন ঘটেছে। এই দুইয়ের মধ্যে কোনটাই মিথ্যা নয়। ঈশ্বরপুরীর ভূমিকাটি

অবশ্যই মনে রাখতে হবে। শূদ্রাধম দিলেন তাকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা। তারপরেই ব্যবহারের পরিবর্তন। কেননা, কৃষ্ণদর্শন ঘটেছে। ঘটা মানেই, আর এক প্রেমের দরজা খুলে গেল। মনে বড় কষ্ট, তাঁকে কেমন করে আবার দেখতে পাব। অন্য দিকে, বিদ্রূপের ও ঔদ্ধত্যের দ্বারা সকলের মন জয় করা যায় না। একে যদি কেউ আন্দোলনের কৌশল মনে করি ক্ষতি নেই। বরং সেটাই একদিক থেকে সত্য।

নিমাইয়ের এই পরিবর্তনের কথা, শ্রীমান পণ্ডিত গিয়ে প্রথম শ্রীবাসের বাড়িতে বৈষ্ণবদের জানালেন। সকলেই অবাক হলেন। আশ্বাসের কথা বটে। যে উদ্ধত যুবক পণ্ডিতের ফাঁকি জিজ্ঞাসার ভয়ে বৈষ্ণবরা পালিয়ে যেতেন, তাঁদের কাছে এ ঘটনা অত্যন্ত আকস্মিক এবং অভাবনীয়। অবশ্য, অনেকে লক্ষই করেননি, ঈশ্বরপুরী প্রণীত কৃষ্ণামৃত গ্রন্থের আলোচনার উপলক্ষেই নিমাইয়ের মধ্যে সামান্য বিনয় ভাব দেখা দিয়েছিল। এ ঘটনা গয়া যাবার আগে। আমার মনে আছে।

নিমাই কেবল বিনীত নয়, এই প্রথম জানা গেল, তার মধ্যে কৃষ্ণভক্তিরও উদয় হয়েছে। এ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ। এ যেন বহুকালের প্রতীক্ষিত এক বিশাল পরিকল্পনা সার্থক হতে চলেছে। নিমাই শ্রীমান পণ্ডিতকে বলল, 'আগামীকাল তুমি আর সদাশিব সদলে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর বাড়ি যাবে। তোমাদের সঙ্গে নির্জনে দেখা করে আমার মনের দুঃখের কথা বলব।'

এ কথার অর্থ কি? নিমাই নবদ্বীপের প্রধান ও বিশিষ্ট বৈষ্ণবদের সঙ্গে মিলিত হবার চেষ্টা করছে। নতুন ঘটনা! তাঁরা নিজেদের মধ্যে দুঃখ করে বলতেন, বৈষ্ণব ঘরের এমন অধ্যাপক পণ্ডিত, এমন দিব্য শরীরে কৃষ্ণরসের ছিটেফোঁটাও নেই। বিস্ময় কাল-বশ হয়ে রইল।

সেই নিমাই শ্রীমানকে এ কথা বলল। তিনি গিয়ে যখন সকল প্রধান বৈষ্ণবদের এ সংবাদ দিলেন, তখন তাঁদের কাছে এ কথা মহা অসম্ভব মনে হল। অথচ এ নিমাইকেই তাঁরা এত কাল চেয়ে এসেছেন। তখন বিপরীত ফল দেখেছেন। স্বাভাবিক। সময় না এলে, কিছুই হয় না। স্বীকার করতেই হবে। তাঁরা চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের সেই দূরদৃষ্টি ছিল না, কখন সেই নেতার আবির্ভাব হবে। কেউ কেউ হয়তো জানতেন। তাঁদের মধ্যে সম্ভবতঃ অদ্বৈত, হরিদাস এবং ঈশ্বরপুরী। অবশ্য আমরা দেখতে পাইনি, নিমাই গয়া গমনের পরে, বিশেষ কোন বৈঠক এই তিনজনের মধ্যে হয়েছিল কি না। হয়তো হয়নি। ঈশ্বরপুরী এমনিতেই 'দৈবযোগে' গয়ায় উপস্থিত হয়েছিলেন।

নিমাইয়ের এ পরিবর্তন যখন তার বন্ধু-বান্ধব আর বৈষ্ণবদের কাছেই অদ্ভুত

অসম্ভব বলে মনে হল, তখন বৈষ্ণববিদ্বেষী পাষণ্ডীরা কী পর্যন্ত বলতে পারে, সেটা অনুমান করা যায়। এটাও নিমাইয়ের আগের স্বভাবের বিপরীত। এ ঘটনা গয়া থেকে ফেরার পরে, ১৫০৯ খৃষ্টাব্দের মাঘ মাসে।

আরও একটা পরিবর্তন নিমাইয়ের মধ্যে দেখা গেল। বায়ুব্যাধির বৃদ্ধি। এ বায়ুব্যাধি, আগের বায়ুব্যাধির মত নয়। শ্রীমান পণ্ডিতই সকলের আগে দেখলেন, নিমাই মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে। মাঝে মাঝে 'হা কৃষ্ণ!' বলে ডাকছে। দেখা গেল, তার বাহ্যজ্ঞান লোপ পাচ্ছে, মূর্ছা যাচ্ছে ঘন ঘন। নিমাইয়ের পরিবর্তনে শ্রীবাস সব থেকে খুশি। তার বাড়িতেই বৈষ্ণবরা মিলিত হয়। পাষণ্ডীরা তার ঘরবাড়ি ভেঙে ফেলবার ষড়যন্ত্র করছে। এখন নিমাই যদি এসে যোগ দেয়, তবে কেবল দলপুষ্ট হয় না, দশজনের একজন নিমাইয়ের বৈষ্ণব সমাজে যোগদান অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথাও।

একটা কথা অবিশ্যি আমার মনে রাখা দরকার। আমি ইতিহাসের যাত্রার প্রথম পাদেই দেখেছি, শুনেছি, অদ্বৈত আচার্যকে সিংহ বলা হয়েছে। তিনি বা অন্যান্যরাও অনেকে মনে করতেন, অদ্বৈতই অবতার হবেন। অর্থাৎ আসল নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন। তিনি 'সংহারিমু' বলে ক্রোধে আত্মহারা হতেন। অর্থাৎ যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজটি ইতিপূর্বেই তৈরি হয়েছিল, পাষণ্ডীদের এবং যবনরাজ অত্যাচারে যাঁরা জর্জরিত ছিলেন, তাঁদের মনোভাব আদৌ অহিংস ছিল না। ১৫০৫ খৃষ্টাব্দেও, আমি তাই দেখছি। পাষণ্ডীদের অনাচারে অত্যাচারে, তাঁদের মনোভাব রীতিমত প্রতিহিংসামূলক।

নিমাই তো শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর বাড়িতে এল। বৈষ্ণব প্রধান অপ্রধান সকলেই বিশেষ কৌতূহলী। নিমাইকে অভ্যর্থনা করল। নিমাই অতি সুনম্র বিনয়ে, পরম আদরে সবাইকে সম্ভাষণ করল। নিমাইয়ের এ রূপ, এ বাচনভঙ্গি, সবই আলাদা, অপরূপ। এমন বিনয় কেউ দেখেননি। সকলের সঙ্গেই নিমাই কথা বলল যেন একটা ভাবের ঘোরে। তার মধ্যে কৃষ্ণনাম শোনার আকাঙ্ক্ষাই বেশি। শুনতে শুনতে ভাবাবেশে আবিষ্ট, হঠাৎ আবার মূর্ছা। বাহ্য দৃষ্টির কোন প্রকাশ নেই। বৈষ্ণবরা ভক্তির শ্লোক পাঠ করতে লাগলেন। নিমাই তা শুনে, আবার বলতে লাগল, 'কৃষ্ণ কোথায় গেল?' কৃষ্ণ বিরহ আর বায়ুব্যাধি, দুই-ই একসঙ্গে দেখা গেল।

বৈষ্ণবরা নিজেদের মধ্যে নানা রকম আলোচনা করতে লাগলেন। তাঁরা নিমাইয়ের কৃষ্ণের অবতার রূপ সম্পর্কে তখনও নিশ্চিত নন। কিন্তু কেউ বললেন,

'নিমাইয়ের মধ্যে হয়তো ঈশ্বর প্রকাশিত হলেন।'

কেউ বললেন, 'এ হয়তো কৃষ্ণেরই কোন রহস্য। ক্রমে ক্রমে জানা যাবে।'

কেউ বললেন, 'ঈশ্বরপুরীর সঙ্গই এর কারণ।' কিন্তু সকলে মনের আসল কথাটি বললেন, 'নিমাইয়ের মধ্যে কৃষ্ণ সত্য হোক, সত্য হোক তাঁর প্রসাদ।'

একজন বৈষ্ণব বিশেষ করে হুংকার দিয়ে উঠলেন, 'নিমাই পণ্ডিত ভাল হলে, পাষণ্ডীদের মুণ্ডু ছিঁড়ে ফেলতে পারি।'

ইনি বোধ হয় পাষণ্ডীদের দ্বারা বেশি অত্যাচারিত হয়েছিলেন। কিন্তু এটিই মূল কথা। নিমাই দলে এলে, পাষণ্ডীদের মুণ্ডু অনায়াসে ছেঁড়া যায়। কিন্তু নিমাইয়ের সুস্থ হওয়া দরকার। মূর্ছা রোগ থেকে নিমাইকে সকলেই সুস্থ দেখতে চান।

দেখতে চাইলেই হয় না। সেই মহাক্ষণটি উপস্থিত না হলে, কোন কিছুই ঘটতে পারে না। নিমাইয়ের এই বর্তমান অবস্থা, এটিও তো বৃথা নয়। সকলের মনে বিশেষ আনন্দ, নিমাই বিনীত হয়েছে। সবাইকে পরম আদরে সম্ভাষণ করছে। কৃষ্ণ বিরহে ভূতলে পড়ছে। অবতারত্ব আরোপ করার আগে, এই পরিবর্তন অবশ্যই দরকার। এ পরিবর্তন সকলের চোখে দেখা দরকার। নিমাই একমাত্র সেই পুরুষ, যার দর্শন ঘটেছে। তার মধ্যে আগে সবাই অপ্রাকৃত লক্ষণসমূহ দেখুক।

নিমাইকে সকলেই আশীর্বাদ করতে লাগলেন। কেন? সত্য হোক, সত্য হোক সেই প্রতীক্ষা, যার মধ্যে কৃষ্ণ আপন লীলা করবেন। ভক্তিপক্ষে শাস্ত্র ব্যাখ্যা, অদ্বৈত নিমাইয়ের জন্মের আগে থেকেই করে আসছেন। শ্রীবাস ও তার তিন ভাই কীর্তন করে আগেই পাষণ্ডীদের ঘৃণার পাত্র হয়েছেন। পাষণ্ডীদের জিঘাংসা ক্রমাগত বাড়ছিল। যবন রাজার কাছে লাগানিও করছিল। সামনে বিপদ দুইটি। যবনরাজ ভীতি, পাষণ্ডীদের অনাচার অত্যাচার বাক্যজালা। আচণ্ডাল স্ত্রীশূদ্রাদির ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে তার মুক্তি। নেতা চাই।

নিমাই শুক্লাম্বরের বাড়ি থেকে ফিরে এল। সকলেই তার কৃষ্ণভক্তি দেখল, বা নিমাই নিজেই দেখিয়ে এল। দেখিয়ে আসা কথাটাই সত্য। কেননা, এর প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তার আবেশের ভাব কিছুতেই যাচ্ছে না। গৃহস্থ জীবনেও কোন আকর্ষণ নেই। বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতিও কোন আকর্ষণ নেই, তাও আমি দেখেছি। এমন কি, মূর্ছার সময়ে নানা আচরণের মধ্যে, বিষ্ণুপ্রিয়াকে মারতে

পর্যন্ত ধাবিত হতে দেখা যায়। কিন্তু সুস্থাবস্থায় সজ্ঞানে তা কখনও করে না। এ অবস্থা হল তার মনোরাজ্যের দ্বিতীয় স্তর। তার মগ্ন চৈতন্যে এই দ্বিতীয় স্তরের লীলা চলছে। যেন কোন আঘাত অভাব তার মনকে উন্মাদ করে তুলছে। এ সবই, নতুন পথের দিকদর্শন করছে, যদিও সেই ভবিষ্যৎ আপাততঃ অন্ধকার। কেবল বিদ্যুৎ ঝলকের মত, হঠাৎ যেন সবাইকে চমকে দিচ্ছে। এ অবস্থাকে বলা যায়, নিমাই নিজেকেই আবিষ্কার করছে।

বৈষ্ণবদের সঙ্গে সাক্ষাতের পরে নিমাই তার শিক্ষকগুরু গঙ্গাদাস পণ্ডিতের সঙ্গে দেখা করতে গেল। এটাও নিয়ম: তীর্থ থেকে ফিরে, গুরু প্রণাম করা। নিমাই গুরুকে প্রণাম করল। গুরুও জানতেন, নিমাই মহাপণ্ডিত। তিনি সম্ভ্রমের সঙ্গে শিষ্যকে আলিঙ্গন করলেন। বললেন, 'সুখী হলাম। গয়ায় পিণ্ড দিয়ে তুমি পিতৃমাতৃকুল উদ্ধার করেছ, এখন আবার ছাত্রদের পড়াতে আরম্ভ কর। ছাত্ররা তোমার কাছে পাঠ নেবার জন্য খুবই উন্মুখ হয়ে আছে। তারা তোমার কাছে ছাড়া কারুর কাছে পড়বে না।'

নিমাই অধ্যাপক হিসেবেও ছাত্রদের প্রিয়। স্বাভাবিক। উদীয়মান প্রতিভাবান অধ্যাপক। মুরারি, মুকুন্দ গদাধরের প্রতিদ্বন্দ্বী, জয়ী, ব্যাকরণের স্বাধীন টীকাকার। ন্যায় স্মৃতি কাব্য অলংকার সবই পড়েছে। পূর্ববঙ্গে ছাত্র পড়িয়ে তাদের উপাধি দিয়ে এসেছে। গঙ্গাদাস সেই নিমাইকেই দেখতে চাইলেন।

নিমাই গুরুর কথা রাখতে প্রথম দিন ছাত্রদের পড়াতে বসল। কিন্তু এই প্রথম দেখা গেল, ছাত্রদের পড়াতে বসে সে কেবল কৃষ্ণতত্ত্ব ব্যাখ্যা করছে। তাও আবার প্রচলিত ব্যাখ্যা নয়। কৃষ্ণ নাম নিয়ে, অন্য এক ধারার ব্যাখ্যা করল। এর আগেও সে কৃষ্ণতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছে। তার সঙ্গে এ ব্যাখ্যার মিল নেই। ছাত্ররাও তা বুঝতে পারল। এর মধ্যে শাস্ত্রীয় তত্ত্ব তর্ক বিচার নেই।

ছাত্ররা দেখতে লাগল, নিমাই পণ্ডিত পড়াতে বসে আবিষ্ট হয়ে কৃষ্ণতত্ত্বের এক বিচিত্র ব্যাখ্যা করছে। যার মধ্যে পাণ্ডিত্যের থেকেও, নাম-মহিমায় সকলকে ভক্তিরসে ঐক্যবদ্ধ করার কথা বলা হচ্ছে। আবিষ্টভাব কেটে গেলেই, লজ্জিত হেসে ছাত্রদের জিজ্ঞেস করে, 'আজ আমি কী সূত্র ব্যাখ্যা করলাম?'

ছাত্ররা বলল, 'কিছুই বুঝতে পারলাম না।'

নিমাই মনে মনে বুঝতে পারছে, তার ব্যাখ্যা ছাত্রদের গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না। তার মূল তত্ত্ব ব্যাখ্যা তাদের কাছে অভিনব। প্রচলিত ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল ভেদ ভেঙে দিয়ে, কৃষ্ণ-ভজনে ব্রাহ্মণ-চণ্ডালের সমান অধিকার ঘোষণা করে, এক সাম্যবাদী-

নতুন সমাজ বিন্যাসের ইঙ্গিতই সে দিচ্ছিল। ছাত্ররা ভাবী নেতার তত্ত্ব গ্রহণ করতে পারছিল না। তারা বুঝতে পারল না, ভবিষ্যতের নেতা, অসার শাস্ত্রীয় তর্ক-বিচারকে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর মনে করছে। সে তাদের ভিন্ন শিক্ষায়, ভিন্ন দীক্ষা দিতে চাইছে।

শচীদেবী জানতেন, ছেলে তাঁর ভারি কুঁদুলে। শিক্ষা দিতে গিয়ে, কোথায় কার সঙ্গে কী ঝগড়া করবে, কে জানে। পড়িয়ে ফিরে এলে, জিজ্ঞেস করেন, 'আজ কী পুঁথি পড়ালে?'

নিমাইয়ের জবাব, 'আজ কৃষ্ণনাম পড়ালাম।'

নিমাই মাকেই বিপ্লববাদের কথা প্রথম বলল, 'মা, চণ্ডাল যদি কৃষ্ণনাম করে, তবে সে চণ্ডাল নয়। ব্রাহ্মণ যদি অসৎ পথে চলে, সে ব্রাহ্মণ নয়।'

শচীদেবী চমকে উঠলেন। এ তো প্রচলিত হিন্দু মতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ! ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল ভেদ ভেঙে দিয়ে, সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করে সাম্য ব্যবস্থা, এ এক রকম অসম্ভব কথা। কেউ বুঝল না, এ হল অভ্যুত্থান কালে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সব থেকে বড় বিশেষত্ব।

নিমাই ছাত্রদের শাস্ত্রের অসারতার কথা বলতে গিয়ে, নবদ্বীপের অধ্যাপকদের গালি দিল, 'এরা কৃষ্ণের মায়াতেই, কৃষ্ণের ভক্তি ছেড়ে অন্য পথে যাচ্ছে। কৃষ্ণের ভজন ছাড়া, কোন শাস্ত্রের ব্যাখ্যা নেই। কৃষ্ণভক্তি ছাড়া ব্যাখ্যা কেবল অধমরাই করে। এরা সব গাধার মত শাস্ত্র ঘাড়ে বয়ে নিয়ে চলেছে। গভীরে ঢুকতে পারেনি। কী হবে এ লেখাপড়া? কী হয়েছে দেশ ও সমাজের অবস্থা? সব তো ছারেখারে যাচ্ছে। এ শিক্ষার মূল্য কী?'

পাঁচশো বছর আগের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা শুনে, আমি আধুনিক কালের মানুষ, নিজেও একবার ভেবে দেখতে পারি বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার কথা। আমিও বর্তমান সময়ে শুনছি, যারা আজ দেশের সর্বাঙ্গীণ পরিবর্তন করতে চায়, অর্থাৎ যে বিপ্লবের কথা তারা বলছে, বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থায় তাদেরও কোন বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা নেই। এই শিক্ষা-ব্যবস্থাকে তারা সমূলে উচ্ছেদ করতে চায়। এটাই হল, সর্বযুগের সত্য। বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান ও যুগ-পরিবর্তনের মুহূর্তে, সমস্ত কিছুর ক্ষয়িষ্ণুতা তাদের চোখে পড়ে। যুগ-প্লাবনের কর্ণধারেরা সকল দেশে, সকল যুগে এ রকমই মনে করে থাকেন। তুলনা অনেক দেওয়া যায়। তার দরকার নেই।

নিমাইও তা বুঝেছিল। যে কারণে,ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ায়, নবদ্বীপের মত জায়গায় দাঁড়িয়ে সে ঘোষণা করল, এ সব শাস্ত্রীয় বিচার তত্ত্ব তর্ক শিক্ষা নিতান্তই

অসার। নতুন শিক্ষা পদ্ধতির কথা সে আপাততঃ বলল না, কিন্তু সকলকে একটি নামের তত্ত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে, আগে সমাজ পরিবর্তনের প্রয়োজনের কথা বলল। অত্যাচার অনাচারের মাঝখানে, নিয়ম-মাফিক শাস্ত্র ঘাঁটাঘাঁটি আর পুরনো শিক্ষা পদ্ধতি ত্যাগ করতে বলল।

ছাত্রদের পক্ষে এ রকম কথা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। তারা নবদ্বীপে এসেছে নিতান্তই শাস্ত্র পাঠ করে উপাধি নিতে। পেশা হিসেবে পাণ্ডিত্য করে জীবিকা অর্জন তাদের লক্ষ। নিমাইয়ের কথা তারা বুঝবে কেমন করে। বুঝলেও তা গ্রহণ করার মত মনের অবস্থাও তাদের নেই। তারা নিমাইয়ের অধ্যাপক গঙ্গাদাস পণ্ডিতের কাছে গিয়ে বলল, 'কৃষ্ণতত্ত্ব ব্যাখ্যা তো আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না। এখন আমরা কি করব?'

গঙ্গাদাস ছাত্রদের বললেন, 'নিমাইকে নিয়ে বিকেলে আমার কাছে এস।'

ছাত্ররা নিমাইকে গঙ্গাদাসের কথা বলে, তাকে গুরুর বাড়িতে নিয়ে এল। গঙ্গাদাস নিমাইয়ের পাণ্ডিত্যের অনেক প্রশংসা করে বললেন, 'এদের ভাল করে শাস্ত্র শিক্ষা দাও। তুমি মস্ত পণ্ডিত, ব্যাকরণের যোগ্য টীকাকার, তুমি আমার মাথা খাও, তোমার পাণ্ডিত্য এদের দেখাও।'

গঙ্গাদাস পণ্ডিতের কথার মধ্যে অন্তরে একটু খোঁচাও ছিল। সে তার অভিনব কৃষ্ণতত্ত্বমূলক শাস্ত্র ব্যাখ্যাকে ভুল বলে স্বীকার করল না। কিন্তু তার সেই অহংকার আবার জেগে উঠল, বলল, 'আমি যে সূত্র ব্যাখ্যা খণ্ডন করি, নবদ্বীপে তা কে স্থাপন করবে? যাই আজ নগরে বসে পড়াই, দেখি কেউ কোন দোষ ধরতে পারে কী না।'

সেই দম্ভ, সেই তেজ। কৃষ্ণপ্রেম বা বায়ুরোগ মুহূর্তে যেন কেটে গেল। গঙ্গার ঘাটে গিয়ে, সেই দিনই রাত্রের চার দণ্ড পর্যন্ত ছাত্রদের পড়াল, সন্ধিকার্য, শব্দজ্ঞান। অর্থাৎ ব্যাকরণ আর ন্যায়শাস্ত্র। ছাত্ররা তা অবাক! হয়তো রাত্রিই পোহাত। কিন্তু হঠাৎ একটা ঘটনা ঘটে গেল। গঙ্গার ঘাটের অদূরেই, নিমাইয়ের বাবার বন্ধু রত্নগর্ভ আচার্য ভাগবত পাঠ করছিলেন। নিমাইয়ের কানে এল কৃষ্ণনাম। শোনা মাত্রেই মূর্ছা। রত্নগর্ভ ছুটে এলেন। নিমাইয়ের মূর্ছা কেটে গেলে, আবার তাঁকে সেই বিশেষ শ্লোক পাঠ করতে বলল। কাছে ছিলেন গদাধর, তিনি বারণ করলেন, 'আর পড়বেন না।'

নিমাইয়ের বাহ্য জ্ঞান ফিরে এলে জিজ্ঞেস করল, 'আমি কি কোন চাঞ্চল্য প্রকাশ করেছি?'

কেউ তা বললেন না।

তা হলে দেখা যাচ্ছে, নিমাই ব্যাকরণ, ন্যায়শাস্ত্র বিধিমত ব্যাখ্যা করতে ভুলে যায়নি। ভাগবত শুনে সে মূর্ছা যায়। মূর্ছাকালের বিষয় তার কিছুই মনে থাকে না। প্রথমে আবেশ হয়, তারপরে মূর্ছা। বাইরে থেকে এ রকম ভাবের প্রেরণা এলে, সে তার স্বাভাবিক অবস্থায় থাকতে পারে না। কৃষ্ণপ্রেম আর বায়ুরোগ মিলে মিশে যায়। চৈতন্য-চরিতকারদের মধ্যে কবিরাজ গোস্বামী নিমাইয়ের এই বায়ুব্যাধিকে তার স্বেচ্ছাকৃত 'ছলনা' বলে উল্লেখ করেছেন। 'ছলনা' এক্ষেত্রে মিথ্যাচারিতার কথা বলা হয়নি। আসলে বলতে চাওয়া হয়েছে, এটি নিমাইয়ের ভগবান কৃষ্ণের সঙ্গে একাকার হয়ে যাওয়া।

এ বিষয়ে নিমাই নিজেও বোঝাবার চেষ্টা করেছে, এটি তার বায়ুব্যাধি। কৃষ্ণ নাম শুনলে তার চেতনা থাকে না। এক রকমের ভক্তির উচ্ছ্বাসে অচৈতন্য হয়ে পড়ে। তার পরেই বায়ুব্যাধিটি এসে বাহ্যজ্ঞান লোপ করে দেয়। কিন্তু প্রাকৃতের মানুষটিকে অনেকেই অপ্রাকৃতের রূপে দেখেছে। ঈশ্বর-বুদ্ধিকে অতিরিক্ত আরোপ করা হয়েছে। মানুষ-বুদ্ধি কাজ করেনি।

পরের দিন ভোরে নিমাই গঙ্গাস্নান করে আবার ছাত্র পড়াতে বসল। ছাত্ররা বলল, 'ধাতু সংজ্ঞা করুন।'

এটি ব্যাকরণের কথা। নিমাই তার দার্শনিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে বলল, 'সর্বাঙ্গে ধাতুরূপ কৃষ্ণরূপে পে বসে আছেন।' দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখাল, 'যে জীবিতকে মান্যজ্ঞানে নমস্কার করি, তার ধাতু (প্রাণ) ছেড়ে গেলে, তাকে ছুঁলে স্নান করি। বাবার কোলে যে ছেলে মহাসুখে থাকে, তার ধাতু (প্রাণ) গেলে, সেই ছেলে বাবার মুখে আগুন দেয়।'

ধাতুর ব্যাখ্যা নতুন এবং অভিনব! ধাতুকে একেবারে কৃষ্ণের সর্বব্যাপী শক্তির উৎস হিসেবে দেখাল। ছাত্ররা বলল, 'এ ব্যাখ্যার কোন ভুল নেই। কিন্তু টোলের অধ্যাপকেরা ধাতুর সংজ্ঞা অন্য রকম বোঝায়।'

নিমাই বলল, 'তারা গর্দভ। তারা এর মর্ম বোঝে না, জানে না।'

ছাত্ররা এতে খুশি হয় না। তারা বিশ্বের চরমতত্ত্ব জানতে আসেনি। নিমাইয়ের বাসনাগত কৃষ্ণ নামের যে ভবিষ্যৎ আন্দোলন, তাও তারা চায় না। তারা চায় প্রচলিত শিক্ষা, উপাধি, এ বিষয় আমি আগেই জেনেছি। তারা দেখছে, নিমাই পণ্ডিতের কেবল কৃষ্ণ ব্যাখ্যা, মূর্ছা, কম্প, অশ্রু। দশদিন পড়েও তাদের কোন লাভ হল না। নিমাইও তা বুঝতে পারছিল। বুঝতে পেরে

তার কষ্ট হচ্ছিল, সে ছাত্রদের নিজের পথে আনতে পারছে না। তখন বড় দুঃখে তাদের বলল, 'আজই শিক্ষা শেষ, আর কোনও পাঠ আমার কাছে নেই। তোমাদের যাঁর কাছে ইচ্ছে, তাঁর কাছে গিয়ে পড়াশোনা কর, আমি নির্ভয় দিচ্ছি। আশীর্বাদ করি, আমি যদি একদিনের জন্যও কৃষ্ণদাস হয়ে থাকি তবে তোমাদের মনের অভিলাষও পূর্ণ হবে। তোমরা আমার জন্ম জন্মের বান্ধব।'

সম্পূর্ণ সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় সুন্দর কথা। আরও বলল, 'তোমরা সকলে একসঙ্গে মিলে কৃষ্ণনাম নিও এই আমার অনুরোধ।'

বলতে বলতে বলতে নিমাইয়ের চোখে জল এল। সে পুঁথিতে ডোর বেঁধে বন্ধ করল। এ ব্যাপারটিও অসামান্য। নানা বিষয়ে পণ্ডিত, সম্মানিত অধ্যাপক, ব্যাকরণের মৌলিক টীকাকার, বিদ্যাবিলাসে যার ছিল ভারি দম্ভ, সে আজ কাঁদতে কাঁদতে পুঁথিতে ডোর বাঁধল। অর্থাৎ চোখের জলের মধ্যে, অধ্যাপক জীবন ত্যাগ করল। এ দৃশ্য বড় করুণ! কিন্তু ছাত্ররা কি তা বুঝতে পারল?

পারল না। গয়া থেকে ফিরে, নিমাই চার মাস ছাত্র পড়িয়েছে। আসলে কৃষ্ণতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছে। উদ্দেশ্য হল, 'তোমরা সবাই একসঙ্গে কৃষ্ণ নাম কর।' সে ভবিষ্যতের যে ইতিহাসের নায়ক হতে যাচ্ছে, এটা তার ইঙ্গিত। সকলে এক নাম নাও, এক ঠাঁই হও। কিন্তু তরুণ ছাত্ররা কেউ তার কথায় ভরসা পেল না। সাড়া দিল না। তারা প্রচলিত পথেই যেতে চাইল। কিন্তু টুলো ছাত্ররা সাড়া না দিলেও, যাঁরা তখন অত্যাচার অনাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করতে চাইছিলেন, সেই বৈষ্ণব সমাজ সাড়া দিয়েছিলেন। তার সঙ্গে ছিল, 'মূর্খ নীচ দরিদ্র আচণ্ডাল' বিরাট জনসংঘ।

হিন্দু সমাজের অস্থিমজ্জায় গতানুগতিকতা, তারই প্রতিফলন দেখা গেল ছাত্রদের মধ্যেও। নতুন কিছু করবার দুঃসাহস তাদের মধ্যেও দেখা গেল না।

ইতিহাস কোনো কালের মানুষের কাছে ব্যাখ্যা দেয় না। মার্জনা চায় না। আমার চোখের সামনে কি বর্তমান তরুণদের ছবি ভেসে উঠছে? নানান দলের দলীয় রাজনীতি ছেড়ে, কেউ কি মৌলিক পরিবর্তনের পথে আসছে? বরং সত্তর দশকে যাঁদের নেতৃত্বে সেই আশা জেগেছিল, তাকে অনেকটাই দমন করা হয়েছে। কিছু মৌলিক পরিবর্তনকামী তরুণ এবং তাদের কোন কোন নেতা শহীদ হয়েছেন। বাকি সবই তো গতানুগতিক পথেই চলেছে। কেবল কিছু কথার এদিক ওদিক।

বর্তমানের কথা থাক। নিমাইয়ের চোখের জলে অধ্যাপনা জীবন শেষ হতে দেখলাম।

সাত



এ ঘটনা ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের ঘটনা। বৃন্দাবনদাস তখনও জন্মলাভ করেননি। কিন্তু তিনি মায়ের মুখে শুনেই এ সব কথা লিখেছেন। নিমাই অধ্যাপনা ছাড়ায়, শচীদেবী ভয় পেলেন। বৈষ্ণবরা দেখছেন কৃষ্ণপ্রেমের আবেশ। শচীদেবী ভাবছেন, ছেলের ব্যাধি বুঝি সারবার নয়। তিনি লোক ডেকে নিমাইকে দেখাতে লাগলেন।

এ সব ব্যাপারে, অতীত আর বর্তমানের মানুষ, সবাই এক রকম। উপদেশ দিতে পারলে, কেউ ছাড়ে না। তা যদি আবার হয় অসুখের ব্যাপার। তখন সবাই চিকিৎসক হয়ে ওঠে। কেউ বলল, সেই আগের বায়ু এসে ভর করেছে। দু' পা বেঁধে ঘরে বন্ধ করে রাখ। কেউ বলল, ডাবের জল খাওয়াও। কেউ বলল, শিবাঘৃত প্রয়োগ কর। কেউ বলল, আকতেল মাথায় দিয়ে স্নান করাও। এদিকে নিমাই পাষণ্ডী অর্থাৎ বৈষ্ণব বিদ্বেষী ব্রাহ্মণদের দেখলেই তেড়ে যায়। লোকে হেসে পালায়। শচীদেবী শ্রীবাসকে এবং অন্যান্য বৈষ্ণবদের গিয়ে ডেকে এনে দেখালেন। তাঁরা বললেন, এ বায়ুব্যাধি নয়, এ মহাভক্তি যোগ। আসলে শচীদেবীর অন্তরে অন্য এক আশঙ্কা। ছেলে বিশ্বরূপের সন্ন্যাসের কথাই তাঁর মনে পড়ছিল। প্রাণে যে তাঁর দাগা ছিল।

নিমাই কৃষ্ণবিরহে লক্ষ্মী-বিরহ ভুলতে চাইছে। সেইজন্যই কৃষ্ণবিরহে উন্মাদ। বায়ুব্যাধিই কি কৃষ্ণবিরহ? অথবা কৃষ্ণবিরহই বায়ুব্যাধি? এর বিচার তো হয়ে গেছে। পূর্ববঙ্গ থেকে ফিরে, লক্ষ্মীর সর্পদংশনে মৃত্যুর সংবাদের পরেই, বায়ুব্যাধি দেখা দিয়েছিল। এখন তার বাড়াবাড়ি। কেননা, এর সঙ্গে এখন কৃষ্ণবিরহ এসে মিশেছে। কিন্তু এ বিষয়টিকে কেবল তত্ত্ব দিয়ে বোঝাতে গেলে ভুল হবে। তত্ত্ব দিয়েই কেবল জীবন ব্যাখ্যা চলে না, জীবন থেকেই তত্ত্বের উদ্ভব। সব কিছুর থেকে বড় হল জীবন। তা যদি হয়, তবে ভবিষ্যৎ আন্দোলনের নেতার পক্ষে এটা অতি সত্য, যে তার জীবন থেকেই কৃষ্ণের উদ্ভব হয়েছে। উদ্ভব হয়েছে বলেই, তাকে অন্যের সঙ্গে তুলনা করা যাচ্ছে না। তাকে অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে।

ইতিহাসের অনেক বড় প্রতিভার মধ্যেই দেখা গেছে, সাধারণ মানুষের মত অবস্থা তাদের থাকে না। উত্তেজনা মাত্রই অসুস্থতা। প্রতিভার মধ্যেও সর্বদাই একটা উত্তেজনা অথবা অতি শান্ত, অস্বাভাবিক ভাব দেখা যায়। বায়ুব্যাধির সময়, নিমাইয়ের মনের গভীরে প্রবল উত্তেজনা বর্তমান। গভীর আন্দোলন হৃদয়-অভ্যন্তরে বায়ু বা মৃগী রোগ, কোন কোন প্রতিভাবানদের মধ্যেও দেখা যায়। এতে অবাক হবার কিছু নেই।

নিমাই এবার সম্পূর্ণ ভিন্ন পথের কথা ভাবছে, যা সে এতকাল করেনি। অধ্যাপনা ছেড়ে এবার সে বৈষ্ণবদের সঙ্গে মিলে, কীর্তনের কথা ভাবছে। দিন ও সময় স্থির করা হয়নি। ভাবাবেশও চলছে। লোকে দেখছে, নিমাই সর্বদাই কৃষ্ণবিরহে ব্যাকুল। কিন্তু অন্তরে লীলা প্রকাশের প্রস্তুতি চলছে।

নিমাই গয়া যাবার আগেই অদ্বৈত নবদ্বীপে এসেছেন। হরিদাসও রয়েছেন। নিত্যানন্দ আসছেন। নিমাইয়ের এই ভাবাবেশ গয়া থেকে আসার পর প্রথম স্তর। অদ্বৈতই বৈষ্ণব সমাজের নেতৃত্ব করছেন। বৈষ্ণবরা তাঁর কাছে গিয়ে, নিমাইয়ের বৈষ্ণব হওয়ার বিচিত্র বিষয় জ্ঞাপন করলেন।

অদ্বৈত বললেন, 'নিমাইয়ের দাদা বিশ্বরূপকে আমি গীতার ব্যাখ্যা করে শোনাতাম। তখন তাকে দেখেছি। সুন্দর গোরা ল্যাংটা ছেলে। তাকে আমি আশীর্বাদ করেছি। সে বড় পণ্ডিত হয়েছে। তার তো কৃষ্ণে ভক্তি হবেই। বড় সুখী হলাম এ সংবাদ শুনে। তবে যদি নিমাই সত্যই কৃষ্ণভক্তি পেয়ে থাকে, তবে আমার কাছে তাকে আসতেই হবে।'

অদ্বৈতর কথায় বোঝা গেল, তিনি এখনই নিমাইয়ের উপর অবতারত্ব আরোপ করছেন না। নিমাইয়ের কৃষ্ণভক্তি সম্পর্কেও কিছুটা সন্দিহান। তাছাড়া, বৈষ্ণব সমাজের নেতৃত্বের গর্ব এখনও তাঁর মনে চেপে আছে। সেই জন্যই বললেন, নিমাইয়ের কৃষ্ণভক্তি জন্মে থাকলে, তাঁর কাছেই আসতে হবে।

নিমাইকে দেখছি, সে বিনীত হয়েই ছিল, এখন লোকের সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করছে। বিনয়ের নতুন পরাকাষ্ঠা দেখা গেল। নবদ্বীপের ঘাটে নিত্য-নৈমিত্তিক দৃশ্য হল, প্রাতে স্নান, ব্রাহ্মণদের পূজা আহ্নিক। নিমাইও যায়। সবাইকে সে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানায়। সবাই তাকে আশীর্বাদ করেন। নিমাই কখনও কারুর পায়ে পড়ে। কখনও কারুর ভেজা কাপড়টি নিজের হাতে নিয়ে নিংড়ে দেয়। কারুর বস্ত্র উত্তরীয় হাতের সামনে তুলে দেয়। কারুকে দেয় কুশ গঙ্গামাটি। কারুর ফুলের সাজি বহন করে পৌঁছে দিয়ে আসে।

বিশেষতঃ বৈষ্ণবদের প্রতিই তার এই শ্রদ্ধা। সবাই অবাক হয়ে ভাবেন, ঐ কি সেই নিমাই? সেই দাম্ভিক, ফাঁকি-জিজ্ঞাসু, বিদ্রূপপরায়ণ যুবক! গঙ্গার ঘাটে হাজার হাজার লোক নিমাইয়ের এই আচরণ দেখছে! মানুষের মনে কি কোন দাগই কাটছে না? নিশ্চয়ই কাটছে। সবাই এক নতুন চরিত্র দেখছে।

বৈষ্ণবরা আশীর্বাদ করে বললেন, 'সর্বশাস্ত্র জেনে যেমন জগৎ জয় করেছ, তেমনি কৃষ্ণশক্তি দিয়ে তুমি পাষণ্ডী সংহার কর।'

আশীর্বাদের মধ্যে অস্পষ্টতা কিছু নেই। কৃষ্ণ ভজে পাষণ্ডী সংহার কর। হিংসাত্মক প্রেরণা, আদৌ কোন অহিংস কথা নেই। বোঝা যায় পাষণ্ডীরা কি পরিমাণ বেড়ে উঠেছিল। কৃষ্ণের নাম নিয়ে পাষণ্ডী সংহারের একজন নেতা চাই, আশীর্বাদের মধ্যে এ কথাটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

তাঁরা নিমাইকে আশীর্বাদ করতে গিয়ে আরও বললেন, 'এই নবদ্বীপে যত অধ্যাপক আছে, কেউ কৃষ্ণভক্তি শেখায় না, বরং যাঁরা কৃষ্ণভক্তি ব্যাখ্যা করেন, তাঁদের নিন্দা করেন। আমাদের তারা তৃণজ্ঞান করে। এখন দেখছি, কৃষ্ণ তোমাকে এই পথে প্রবিষ্ট করাচ্ছেন। তোমার দ্বারাই পাষণ্ডীর ক্ষয় হবে।'

নিমাই কি তা বুঝতে পারছিল না? আমি তো যেন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, নিমাই প্রতিটি ধাপে ধাপে, একটি বিশেষ পথে এগিয়ে চলেছে। কৃষ্ণভক্তি তাকে আবিষ্ট করেছে, কৃষ্ণ নামে সে মূর্ছা যাচ্ছে। কোনটাই গোপনে নয়। লোকচক্ষুর সামনেই সে নিজের এই ক্রমবিকাশ দেখাচ্ছে। এর মধ্যে, অন্তরালে আরও কারুর হাত আছে কি না, আমি দেখতে পাচ্ছি না। দৈবযোগে ঈশ্বরপুরীর গয়াগমন দেখেছি, সেখানেই কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা। ফিরে আসবার পথে কানাইয়ের নাট্যশালা-গ্রাম, নিমাইয়ের কৃষ্ণদর্শন, বিরহ, ব্যাকুলতা, অধ্যাপনা ত্যাগ। ছাত্রদের সবাইকে একসঙ্গে কৃষ্ণ নাম নিয়ে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস। সব মিলিয়ে, এক নতুন চরিত্রের আবির্ভাব ঘটছে।

নিমাই বৈষ্ণবদের কাছে বিনীত, সুনম্র ব্যবহারে, আচরণে, তাঁদের সেবায় নিজের চরিত্রের আর একদিকও দেখিয়ে দিচ্ছে। লোকেও দেখছে। অর্থাৎ জনসাধারণ। বৈষ্ণব প্রধানদের আশীর্বাদের জবাবে সে বলল, 'আপনাদের কথা সত্য হবে। পাষণ্ডীরা কী ছার করবে, আপনারা সুখে কৃষ্ণনাম করুন, আপনারাই জগৎ উদ্ধার করবেন, আপনারাই কৃষ্ণের অবতার সৃষ্টি করবেন। আমাকে আপনাদের সেবক বলে জানবেন।'

এ কথার অর্থ স্পষ্ট। প্রচ্ছন্ন বটে, কিন্তু পরিষ্কার বোঝা গেল, নিমাই নিজেই

সেই অবতার হবে। অন্যথায় সে এ আশ্বাস দিত না, 'পাষণ্ডীরা কোন্ ছার করবে, আপনারা সুখে কৃষ্ণনাম করুন। আপনারাই কৃষ্ণের অবতার সৃষ্টি করবেন। আমি আপনাদের সেবক।' এ হল নেতার কথা।

এ যেন স্বাধীন দেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত নেতার কথা। অনুচরদের যে কথা সে বলল, এর থেকে সাহসী উদার কথা কোন্ নেতাই বা বলতে পারেন! স্পষ্টতই সে বলে দিল, আমি পাষণ্ডী সংহার করব। তোমরাই আমাকে কৃষ্ণের অবতার করাবে। তবে আমি নেতা হলেও, তোমাদের সেবক বলেই জানবে। এখানে একজন বিশিষ্ট নিমাই চরিত্র ব্যাখ্যাকার আধুনিক পণ্ডিতের একটি উদ্ধৃতি সামনে তুলে দিচ্ছি। প্রকৃতপক্ষে আমি তাঁকে অনুসরণ করেই, তাঁর প্রণীত ইতিহাসের পথ ধরেই নবদ্বীপে এসে উপস্থিত হয়েছি। তিনি বলছেন: নিমাই যেদিন বৈষ্ণব প্রধানদের আশীর্বাদের জবাবে একথা বলল, তখন: '১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দের সম্ভবতঃ মে মাসের কোন এক উজ্জ্বল প্রভাতে, গঙ্গার ওপারে তরুবীথির উপর দিয়া রক্তিমচ্ছটায় সূর্য যখন সব গরিমায় উদিত হইয়া বাঙালীকে ডাকিতেছিল, জাগ, জাগ, আমি আসিয়াছি, আমি আসিয়াছি—তখন নবদ্বীপে গঙ্গার ঘাটে নিমাই সেই জবাকুসুমসঙ্কাশং মহাদ্যুতির দিকে চাহিয়া, পাষণ্ডীপর্যুদস্ত, যবনরাজ-ভীতসন্ত্রস্ত বাঙালী বৈষ্ণব সমাজের নেতৃত্ব মনে মনে গ্রহণ করিয়া বাড়ি ফিরিলেন।'···

নিমাইয়ের মনের আসল কথাটা এর মধ্য দিয়ে সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট। নিমাই একদিকে বিনীত, শান্ত, সেবক, অন্যদিকে নিজের পরিকল্পনাও সে বলে চলেছে, 'আমিই সে আমিই সে। পাষণ্ডী সংহার করব আমি।'

'আমিই সে' (মুঞি সেই মুঞি সেই) কথাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রথম বোঝা যাচ্ছে, পাষণ্ডী সংহারের জন্য নিজেকে কৃষ্ণের অবতার বলে উপলব্ধি করার চেষ্টা করছে। অধ্যাপনা ছেড়েছে। কিন্তু চুপচাপ বসে থাকবার পাত্র সে নয়। অবশ্য সময় বিশেষে, বিশেষতঃ বাইরে থেকে কোন রকম কৃষ্ণনাম বা ভাগবত পাঠ শুনলে, এখনও তার সেই মূর্ছা হচ্ছে। তথাপি সে ক্রমেই, যথাযথ পায়ে এগিয়ে চলেছে।

নিমাই অদ্বৈতর মনের কথা শুনেছিল। অদ্বৈত বলেছিলেন, যেই কৃষ্ণভক্তি পেয়ে থাকুক, তাকে আমার কাছে আসতেই হবে। নিমাই এবার গদাধরকে সঙ্গে নিয়ে অদ্বৈতর সঙ্গে দেখা করতে গেল। অদ্বৈত তখন মহামত্ত সিংহ, হুংকার করছেন, ক্রুদ্ধ মহারুদ্র অবতার বিশেষ। কিন্তু এই মহারুদ্র অবতার নিমাইকে

দেখা মাত্র বিস্ময়কর আচরণকরলেন। তিনি পাদ্য অর্ঘ্য আচমনী নিয়ে নিমাইয়ের চরণে দিলেন। দিলেন, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ,দীপ আর নমস্কার করে উচ্চারণ করলেন, 'নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।'

আশ্চর্য, অভূতপূর্ব ব্যাপার। ঘটনা এমন আচমকা ঘটে যাবে, কেউ ভাবতেই পারেননি। ব্যাপার দেখে, গদাধর তো জিভ কেটে, অতি কুন্ঠিত হয়ে, অদ্বৈতকে চুপিচুপি বললেন, 'করছেন কি ? বালককে এ সব করা ঠিক নয়।'

অদ্বৈত হেসে বললেন, 'গদাধর, আর কতদিন একে বালক বলে জানবে ?'

গদাধরের চিন্তার সঙ্গে অদ্বৈতর চিন্তা ও দূরদৃষ্টির এখানেই মৌলিক পার্থক্য। অদ্বৈত ভবিষ্যৎদ্রষ্টা। নিমাই ঠিক কুন্ঠিত নয়। সে দু হাত জোড় করে, অদ্বৈতর পায়ের ধুলো নিল। বিনীত নম্র হয়ে বলল, 'আপনি আমাকে অনুগ্রহ করুন, আমাকে আপনার হৃদয়ের মনোমত রূপেই জানবেন। আপনাকে দর্শন করে ধন্য হলাম, আপনার কৃপায় আমি কৃষ্ণনাম করি।'

অদ্বৈত বললেন, 'বিশ্বম্ভর, তুমি আমার সকলের থেকে বড়। বৈষ্ণবদের ইচ্ছে, তোমার সঙ্গে কৃষ্ণকীর্তন করে।'

বুদ্ধিমান ব্যক্তি, শেষের কথাটি নিমাইকে এমন ভাবে বললেন, যেন নতুন নির্দেশ দিচ্ছেন,তুমি বৈষ্ণবদের সঙ্গে কৃষ্ণকীর্তন কর। নিমাই তা স্বীকার করে নিল।

অদ্বৈত যা চেয়েছিলেন, তার প্রথম দফা ফলে গেল। নিমাই তাঁর কাছে এল। তাঁর যা করবার তা করলেন। কিন্তু মনের দ্বিধা একেবারে ঘুচে যায়নি। তিনি নিমাইকে পরীক্ষা করবার জন্য, শান্তিপুরে চলে গেলেন। সঙ্গে হরিদাসকেও নিলেন। অদ্বৈত ভূতপূর্ব নেতা, পরবর্তী নেতাকে বিনা পরীক্ষায় কেবল ধূপ দীপ দিয়ে আরতি করে ছেড়ে দেননি। এটি হল তাঁর প্রেরণামূলক একটি পরীক্ষা মাত্র। কিন্তু তিনি চান, নিমাই কিছুকাল কীর্তন উপলক্ষ্যে বৈষ্ণবদের সঙ্গে মেলামেশা করুক। বৈষ্ণবরাও নিমাইকে দেখুন, নিমাইও তাঁদের দেখুক।

এ ঘটনাও ১৫০৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসের ঘটনা হওয়াই স্বাভাবিক। শ্রীবাস নিমাইকে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'অদ্বৈত আচার্য কি তোমার ভক্ত নাকি ?'

নিমাই বলল, 'ভারতবর্ষে আচার্যের সমকক্ষ কেউ নেই।'

সুন্দর জবাব। নিমাইয়ের প্রকৃত জবাব। কিন্তু কৃষ্ণ নাম শুনলেই সেই কম্প আর মূর্ছা, বাহ্যজ্ঞান লোপ। এ সব দেখে সকলের মনেই এখন সন্দেহ, 'এ পুরুষ অংশ-অবতার।' কেউ বলল, 'এ শরীরে কৃষ্ণের বিহার'। বৈষ্ণব গৃহিণী আর মহিলারা তো স্থির করেই ফেললেন, 'কৃষ্ণ জন্ম নিলেন নিজেই।'...

কিন্তু নিমাইয়ের সেই যে 'তমাল শ্যামল এক বালক সুন্দর' হাতে মোহন বাঁশি নিয়ে দেখা দিয়েছিলেন, আলিঙ্গন করেছিলেন, তাঁর প্রতি বিরহের মধ্যে, নিমাইয়ের রাধিকা-ভাব দেখা যাচ্ছিল। 'পেয়েও তাঁকে হারালাম' এই কথাতে তা আরও স্পষ্ট। অথচ নবদ্বীপের বৈষ্ণবরা কেউ তাঁকে রাধিকার অবতার করতে চাননি, দেখতেও চাননি। অতএব, নিমাইয়ের রাধিকা-ভাব স্থায়ী হতে পারে না। অদ্বৈত তো চেয়েছেন চক্রধারী কৃষ্ণকে। চক্রের প্রয়োজনই বেশি। পাষণ্ডী ও যবনরাজ ভীতির জন্য চক্র চাই। ইতিহাসই আমাকে দেখাবে, রাধাভাবের বিকাশ নবদ্বীপে যথার্থ হয়নি।

অদ্বৈত শান্তিপুরে আছেন। তাঁর অনুপস্থিতিতেই, নবদ্বীপের বৈষ্ণবরা অনুরোধ করলেন, 'আমরা সবাই তোমার অনুপাল্য, তুমি সকলের নায়ক হয়ে কীর্তন কর। পাষণ্ডীদের অপমানকর কথার জ্বালা আর সহ্য হয় না, তোমার প্রেম-নামে আমাদের শীতল কর।'

বৈষ্ণবদের থেকে, পাষণ্ডীদের অপমান অত্যাচারই নিমাইকে অবতার হতে বাধ্য করেছে। বৈষ্ণবরা অদ্বৈতর অপেক্ষা না করেই, নিমাইকে 'নেতা' নির্বাচন করতে চাইছেন। নিমাই আবেশের ভাবে থাকলেও, প্রথম কীর্তন নিজের বাড়িতেই শুরু করল। সারারাত্রি কীর্তন চলল। এ ঘটনাও ঐতিহাসিক, নিমাই নিজের বাড়িতে সংকীর্তনের জন্ম দিল।

এদিকে অদ্বৈত অনুপস্থিতি। নিত্যানন্দ রওনা হয়েছেন বৃন্দাবন থেকে, এখনও এসে পৌছাননি। নিমাইয়ের বাড়িতে কয়েকদিন সংকীর্তন হল। তারপরে আবার যথারীতি শ্রীবাসের বাড়িতেই তার অনুষ্ঠান চলল। খুব জাঁক করেই কীর্তন চলল। নিমাই সঙ্গে থাকার জন্যই কীর্তন বেশি প্রকটিত। সারারাত্রি ধরে কীর্তন চলল। এটা কি ইচ্ছাকৃত ব্যাপার? যাতে সকলেই জানতে পারে, আবার পাষণ্ডীরাও রেগে উঠবে?

বোধ হয় তাই। কিন্তু ফলটা ভাল হল না। পাষণ্ডীরা সত্যিই রেগে গেল। ঘুমোতে পারে না। তাদের কথায় কিছু যুক্তিও আছে। সারারাত্রি চিৎকার করার মানে কি? মনে মনে নাম করা যায় না? এ কি জ্ঞানযোগের লক্ষণ? চিৎকার করে ডাকলেই কি কৃষ্ণ আসবেন?

না, তা আসবেন না। এটা হল প্রচারের মাধ্যম। লোকে জানুক। কিন্তু ক্রমে প্রকাশ পেল, রাজার দুই নৌকা ভরতি সৈন্য শ্রীবাসকে ধরতে আসছে। তার বাড়িঘর ভেঙে ফেলবে। কথাটা কত দূর সত্য, বোঝা না গেলেও, নবদ্বীপের সবাই

ভয় পেল। পাষণ্ডী ব্রাহ্মণরাও ভীত। মুখে যতই বড়াই করুক আর ষড়যন্ত্র করুক, এদের মনে সাহসেরও অভাব। কোন পাষণ্ডী আবার বলল, 'আমাদের কী দায়। শ্রীবাসকে ধরে নিয়ে যাবে, যাক।'

নিমাইয়ের কীর্তন প্রকাশের প্রথম ফল, রাজ-নৌকা বৈষ্ণবদের ধরতে আসছে। বৈষ্ণবরাও কেউ বড় একটা সাহসী নন। সকলেই গোবিন্দকে স্মরণ করছেন। যবনরাজভীতি সকলের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করেছে। শ্রীবাস রীতিমত ভয় পেয়েছেন। নিমাই বুঝতে পারছে, সকলেই ভয় পেয়েছে। সে-ই একমাত্র নির্ভীক পুরুষ। কিন্তু তার ভাবাবেগের দরুন, বৈষ্ণবরাও তার প্রতি তেমন নির্ভর করতে ভরসা পাচ্ছে না। স্বাভাবিক, কারণ অবতারের প্রকাশ ক্রমশঃ ঘটে, হঠাৎ ঘটে না। এটা তাঁরা বুঝতে পারেননি।

নিমাই এবার তার অবতারত্ব প্রকাশ করবার উদ্যোগ করল। বৈষ্ণবরা ভয়ে কেউ বেরোল না। নিমাই একলাই নগরের পথে পথে ঘুরে বেড়ায়, সকৌতুক হাসে। গঙ্গার ধারে গিয়ে দাঁড়ায়। পাষণ্ডীরা মনে মনে অবাক মানে। রাজার নৌকা আসছে শুনেও নির্ভয়ে এ রকম ঘুরে বেড়াচ্ছে? পাষণ্ডীদের মধ্যে কেউ বলল, 'এ সব নিমাইয়ের চাল। সবই পালাবার ফন্দি-ফিকির।'

নিমাইয়ের ভাবাবেশ যায়নি। কিন্তু তার মধ্যে একটা পরিবর্তন আসছে। গঙ্গার ধারে গরু চরতে দেখে, তাদের দৌড়াদৌড়ি, নদীর জলপান ইত্যাদি দেখে, হঠাৎ তার চোখের সামনে যমুনা-পুলিনে, গঙ্গা-পুলিনে মেশামিশি হয়ে গেল। সে ভাবাবেশে উন্মত্ত হয়ে হুংকার দিল, 'আমিই সে, আমিই সে।'

অর্থাৎ বৈষ্ণবরা যাঁকে চাইছেন, আমিই সে। অদ্বৈত শান্তিপুরে থেকে আমাকে পরীক্ষা করছেন, সম্পূর্ণ বিশ্বাস করছেন না, কিন্তু আমিই সে!

এই আবেশের ভাবেই, নিমাই গঙ্গার ধার থেকে সোজা গেল শ্রীবাসের বাড়িতে। শ্রীবাস তখন দরজা বন্ধ করে 'নৃসিংহ' পূজা করছিলেন। নিমাই গিয়ে দরজায় লাথি মেরে বলল, 'কী করিস শ্রীবাস তুই, কার পূজা করিস? যার পূজা করিস, তাকে দেখ। দরজা খোল।'

এ আবার নতুন নিমাই। সেই বিনীত নম্র সেবকটি না। শ্রীবাস দরজা খুলে দেখলেন, নিমাই বীরাসনে বসে আছে। একেবারে চতুর্ভুজ—শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর। শ্রীবাসকে বলল, 'আমাকে ডেকেছিস, আমি এসেছি। অদ্বৈত গিয়ে বসে আছে শান্তিপুরে। এ ভাল নয়। আমি দুষ্টের বিনাশ করব। তুই আমার স্তব কর।'

শ্রীবাস স্তব্ধ। এ কি দর্শন ঘটছে! এ যে স্বয়ং কৃষ্ণ! এ হল মানসিক অবস্থার

একটা বিমূঢ় বিস্ময় আবেশ। ভয়ের মধ্যে অতি দুঃসাহসীকে নতুন রূপে দেখা। একজনের অবতারত্বে প্রকাশ, আর একজনের নতুন প্রাণ-সঞ্চারের আশ্বাসের দর্শন! শ্রীবাস যা দেখলেন, তিনি সত্যই দেখলেন। তিনি স্তব পাঠ করলেন। নিমাই বলল, 'যদি রাজার নৌকা আসে, আমিই নৌকায় উঠে রাজার গোচরে যাব।'

তারপরেই নিমাইয়ের ভাবাবেশ কেটে গেল। ভাবাবেশ কেটে গেলেই সে লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হয়। যাবার সময় শ্রীবাসকে বলে গেল, 'সাবধান, এ সব কথা কাউকে বলো না। যা দেখলে, নিজের মনেই রেখ।'

যাবার আগে, শ্রীবাসের ভাইঝি নারায়ণীকে কৃষ্ণনাম নিতে বলে গেল। নারায়ণী কাঁদতে কাঁদতে কৃষ্ণনাম নিল। এই নারায়ণী লক্ষ্মীর সমবয়সী। যুবতী। ইনিই চৈতন্যভাগবতের স্রষ্টা বৃন্দাবনদাসের মা। এঁর কথা ইতিহাস আমাকে মনে রাখতে বাধ্য করবে। একটি বিশেষ ঘটনার জন্যই নারায়ণী বিশিষ্টা।

নিমাইয়ের আবেশের ভাব তার মনের বাইরে কার্যকারিতার সত্য ঘটনা-বাস্তব অবস্থা। একে সে নেতৃত্বের কাজে প্রয়োগ করা উচিত মনে করল। অদ্বৈতর পরীক্ষায়ও সে উত্তীর্ণ হল। পরে তা অদ্বৈত জানতে পারবেন। কিন্তু নিমাই তার আবেশের বাস্তব অবস্থাকে নেতৃত্বের কাজে লাগানোটা স্থির করে ফেলল। শ্রীবাসকে সে এক রূপ দেখাল। এবার নতুন নতুন রূপের পালা।

এদিকে বৈষ্ণব ধরতে রাজার নৌকা এসে এখনও পৌঁছল না। অথচ কখন এসে পৌঁছায়, সে ভয়ও রয়েছে। শ্রীবাসের ভয় নিমাই দূর করেছে। এবার অন্যদের ভয়ও দূর করা দরকার। একদিন তার অক্রূরের আবেশ হল। অক্রূরের ভাবে ভাবিত হয়ে বলল, 'মথুরায় চল নন্দ রামকৃষ্ণ নিয়ে।'...মথুরার কথা বলার উদ্দেশ্যই, কৃষ্ণের অন্য এক রূপ। কংস-নিধনকারী। মথুরার নামে সকলের মনের ভয় দূর করাই উদ্দেশ্য।

তারপরেই একদিন বরাহভাবের শ্লোক শুনে, নিমাই মুহূর্তে গর্জে উঠে চলল মুরারির বাড়িতে। সেখানে সে শূকর মূর্তি ধারণ করল। চারটি খুর প্রকাশ করল। দাঁতে করে গাড়ু তুলে নিল। মুরারি স্তব্ধ। তিনি দেখলেন বরাহ অবতার তাঁর সামনে। বরাহ অবতার দেখাবার বিশেষ উদ্দেশ্যও আছে। কৃষ্ণ পূর্বে বরাহ মূর্তিতে পৃথিবী উদ্ধার করেছিলেন। আসল কথা 'উদ্ধার' করা। আমিই সে,—এই ঘোষণার মধ্যেই, বরাহ রূপে উদ্ধার করবার অভিপ্রায় প্রকাশ। মুরারিকে বলল, 'আমার স্তুতি কর।'

মুরারি যা দেখলেন, সত্যই দেখলেন। জীবের উদ্ধারকর্তা বরাহ মূর্তি দেখে,

তিনি তাঁর স্তব করলেন। সকলের সব কিছু দর্শন হয় না, আগেই বলেছি। যে যার মানসিক অবস্থা-বৈগুণ্যে দর্শন পায়। মুরারি বরাহ-মূর্তির স্তব করতে করতে মনে সাহস ও বল পেলেন। নিমাইয়ের উদ্দেশ্য সাধিত হল। বিনা উদ্দেশ্যে সে শ্রীবাসকে নৃসিংহ মূর্তি ও মুরারিকে বরাহ মূর্তি দেখায়নি।

বৈষ্ণবদের পাষণ্ডী ভয় কেটে গেল। রাজভয়ও মন থেকে উধাও। তাঁরা ঘর ছেড়ে হাটে ঘাটে মাঠে বেরিয়ে এবার উচ্চস্বরে কীর্তন শুরু করলেন।

আট

এই সময় নিত্যানন্দ এসে উপস্থিত হলেন। চৈতন্যভাগবতের লেখক বৃন্দাবনদাস পরবর্তীকালে নিত্যানন্দের মুখ থেকে সব শুনে, তাঁর কথা লিখেছেন। নিত্যানন্দ যে সময়ে এলেন, বৃন্দাবনদাসের তখনও জন্ম হয়নি। কথাটা বিশেষ কারণেই বলতে হল। এখনও সময়টা ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দ। আষাঢ়ী পূর্ণিমার আগের দিন নিত্যানন্দ এলেন। সম্ভবতঃ জুন মাসের শেষ, জুলাইয়ের প্রথম দিকেই। শ্রীবাসের বিধবা ভ্রাতৃজায়া নারায়ণী বৃন্দাবনদাসের গর্ভধারিণী। ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে বৃন্দাবনদাসের জন্ম হয়েছিল। এ বিষয়ে পরে বলা যাবে।

নিত্যানন্দ এলেন। এঁর বিষয়ে ইতিহাসের পাতায় নতুন পাঠ আমাকে নিতে হবে। আর একবার আদি বৃত্তান্ত দেখে নেওয়া যাক। ইনি যখন নবদ্বীপে এলেন, বয়স বত্রিশ। নিমাইয়ের বয়স চব্বিশ চলছে। সে নিত্যানন্দের থেকে আট বছরের ছোট।

রাঢ় অঞ্চলের একচাকা নামে এক গ্রাম আছে। নিত্যানন্দের জন্ম এই গ্রামে। বাবার নাম হাড়াই ওঝা, মায়ের নাম পদ্মাবতী। এঁরা রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। পরিবারটি যথার্থ বৈষ্ণব ছিল কি না, এ বিষয়ে জোর করে কিছু বলা যায় না। চৈতন্যচরিতকারেরা অবশ্য সকলে তাই লিখে গেছেন। তাঁরা লিখতেই পারেন, কারণ নিত্যানন্দ পরবর্তীকালে বৈষ্ণব হয়েছিলেন। হাড়াই পণ্ডিতকে কেন ওঝা বলা হত? ওঝা বললেই আমাদের চোখের সামনে বিশেষ এক বৃত্তিধারী লোকদের কথা মনে হতে পারে। কিন্তু ওঝা মানেই ঝাড় ফুঁক করত তা নয়। বৈদ্যদেরও অনেকে ওঝা বলে। হাড়াই পণ্ডিত কি চিকিৎসা শাস্ত্র জানতেন?

এ বিষয়ে নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না। তবে হাড়াই পণ্ডিতকে 'ওঝা' বলতেই কেমন একটা প্রশ্ন জাগে। রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ—অথচ লোকের কাছে তাঁর পরিচয় হাড়াই ওঝা। এই নামেই তাঁকে সবাই চিনত।

নিত্যানন্দ এঁর একমাত্র ছেলে নন। আরও সন্তানাদি ছিল। তাঁদের বিষয়ে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। নিত্যানন্দের সঙ্গে ভবিষ্যতে মাধবেন্দ্র পুরীর সাক্ষাৎ হবে, এ কথা কেউ জানতেন না। নিমাইয়ের সঙ্গে লীলা করবেন, এটাও সকলেরই অজানা ছিল। যদিও ভক্তরা কেউ তা ভাবতেন না। কারণ নিমাইয়ের অবতার রূপে আবির্ভাবের পরেই, নিত্যানন্দ এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দেওয়ায়, সকলেই উভয়ের মধ্যে অবতারত্ব আরোপ করেছেন। নিত্যানন্দকে বলরামের অবতার বলা হয়েছে। কৃষ্ণ-বলরাম, এই উভয়ের সখ্যতাই, নিমাই ও নিত্যানন্দের মধ্যে বৈষ্ণবরা আবিষ্কার করেছেন।

স্বাভাবিক। অবতারত্ব আরোপ না করলে, উভয়ে কেমন করেই বা জীবের উদ্ধারে একত্র হতে পারেন। কিন্তু নিত্যানন্দ প্রথমাবধিই বৈষ্ণব ছিলেন, এ রকম ধরে নেওয়া ঠিক হবে না। তাঁর বারো বছর বয়সের সময়, বাড়িতে এক সন্ন্যাসী এসেছিলেন। এই সন্ন্যাসীর নিত্যানন্দকে ভাল লাগে। ভাল লাগবার কারণ বোধ হয়, বারো বছরের বালকটির মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্যের লক্ষণ দেখা গেছল। বৈশিষ্ট্যটা যে কী, তা সঠিক বোঝা মুশকিল। বৈষ্ণবরা বলেছেন, তাঁর কৃষ্ণভক্তি দেখে, সন্ন্যাসী মোহিত হয়েছিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসী নিজে আদৌ বৈষ্ণব ছিলেন কী না, তা বলা হয়নি।

তবে নিত্যানন্দও বালকদের মধ্যে জনপ্রিয় ছিলেন। নিমাইয়ের মত চপলমতি, চঞ্চল ছিলেন না। সন্ন্যাসী নিত্যানন্দকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে গেছলেন। নিত্যানন্দ বারো বছর বয়সেই গৃহত্যাগ করেন। কুড়ি বছর সারা ভারতের নানা তীর্থ পর্যটন করেন। এই তীর্থ পর্যটনের সময়, নিত্যানন্দ নানা উপাসক সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন, তাঁদের ধর্মের কথা শুনেছেন। তিনি বৌদ্ধদের কাছেও গেছলেন। এ বৌদ্ধ কারা? কোন্ শ্রেণীর? কারণ, নিত্যানন্দের সময়ে, বৌদ্ধরা নানা ভাগে বিভক্ত। তাঁর সঙ্গে কি বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের সাক্ষাৎ হয়েছিল? তাঁকে 'অবধূত' বলা হত কেন? বৈষ্ণবদের মধ্যে 'অবধূত' হওয়াটা একেবারেই সম্ভব নয়। অবধূতের সঙ্গে শাক্ত শক্তিতন্ত্রেরই যোগ থাকার কথা। তিনি কি তন্ত্রসাধনা করেছিলেন?

নিত্যানন্দের বৌদ্ধ আলয়ে যাবার কথা শুনে, এবং 'অবধূত' আখ্যা শুনে এটাই

বিশ্বাস হয়, তিনি কোন না কোন ভাবে তন্ত্রাচারের সঙ্গে লিপ্ত হয়েছিলেন। যিনি একই সঙ্গে ভোগ ও ত্যাগের অনুসরণ করেন, অথচ কোনটিতেই আসক্ত হন না, তিনি অবধূত। সব রকমের প্রকৃতি বিকারকে যিনি উপেক্ষা করতে পারেন, তিনিই অবধূত।

অবধূত কত রকমের আছেন, সেটাও দেখা যাক। শৈবাবধূত, কৌলাবধূত, গৃহস্থাবধূত, দিগম্বরাবধূত, পরমহংসাবধূত। অনেকেই জানে, দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। নিত্যানন্দ কোন্ শ্রেণীর অবধূত ছিলেন? গৃহস্থাবধূতকে বাদ দিলে, বাকি সকল অবধূতই অগম্যাগমন ও মদ্যপান করতে পারেন। তাঁদের কিছুই নিষিদ্ধ নয়। ভোগ ও ত্যাগের কথায়, তন্ত্রের ভোগ-মোক্ষের কথাই মনে আসে। নিত্যানন্দ তখন গৃহস্থও হননি।

যাই হোক, নিত্যানন্দ বিশ বছর পর্যটনের মধ্যে যা-ই করুন, তাঁর এই অবধূত পরিচয়টি ভুললে চলবে না। আবার মাধবেন্দ্র পুরীর সঙ্গে তাঁর মিলনকেও অস্বীকার করা যায় না। কারণ মাধবেন্দ্র পুরীই তাঁর নবদ্বীপে আসার যোগসূত্র। এই মাধবেন্দ্র পুরী অদ্বৈতর গুরু। মাধবেন্দ্র নিত্যানন্দকে বন্ধুর মত দেখতেন। নিত্যানন্দ তাঁকে গুরুর ন্যায় দেখতেন। মাধবেন্দ্রর বান্ধব বা শিষ্য, নিত্যানন্দ নবদ্বীপে এলে যে বৈষ্ণবদের বিশেষ অভ্যর্থনা লাভ করবেন, এটাই স্বাভাবিক।

নিত্যানন্দ বৃন্দাবনে থাকতেই, নিমাইয়ের অবতার রূপ প্রকাশের খবর পেয়ে চলে এলেন। কিন্তু সোজা নিমাইয়ের বাড়িতে গিয়ে উঠলেন না। উঠলেন নন্দন আচার্যের বাড়িতে। নবদ্বীপের এ সময়টা বিশেষ সংকটের কাল। বৈষ্ণবরা ভীত। নিমাই নানা ভাবাবেশে অবতার রূপ দর্শন করিয়ে তাঁদের ভয় ভাঙছে। এ সময়ে এমন আর একজনের দরকার, যিনি বৈষ্ণবদের চিরাচরিত আচরণে অভ্যস্ত নন। যিনি সাহসী, শক্তিশালী এবং প্রচণ্ডতা প্রকাশ করতে পারেন, এমন একজনের দরকার। যবনরাজ ও পাষণ্ডীরা বৈষ্ণবদের পিষে মারবার চেষ্টা করছে। নিমাইয়ের একজন উপযুক্ত সহচর চাই। সে যেন তাঁরই অপেক্ষা করছে। নিত্যানন্দের আগমনের কথা শুনে, নিমাই কয়েকজনকে বলল, 'চল, তাঁকে দেখে আসি।'

নিমাই এল নন্দন আচার্যের বাড়ি। নিত্যানন্দকে দেখেই মনে হল, একটা উজ্জ্বল প্রভা। 'যেন কোটি সূর্যসম'। চোখে মুখে আবেশের লক্ষণ, কেবলই হাসেন। যেন বিশেষ ধ্যানে আছেন। দুজন দুজনকে দেখে মুগ্ধ। কেউ কারুর দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারে না।

নিমাই বলল, 'কাল পূর্ণিমা, ব্যাসের পূজা হবে। তুমি কোথায় পূজা করবে?'

নিত্যানন্দ স্থির করেই রেখেছিলেন, শ্রীবাসকে দেখিয়ে বললেন, 'এঁর গৃহে।'

শ্রীবাস বললেন, 'সব ঘরই আমার।'

নিমাই নিত্যানন্দকে নিয়ে তখনই শ্রীবাসের বাড়িতে এল। তার আবেশ হল। লাফ দিয়ে খাটের ওপর বসে মহামত্ত হয়ে বলল, 'মদ আন মদ আন, বারুণী দাও বারুণী দাও।'

সকলেই অবাক! কী করবে বুঝতে পারে না। মদ বারুণী চায় নিমাই? মদ কি তাঁরা আনলেন? না, আমরা শুনলাম, তাঁরা ঘট ভরে গঙ্গাজল নিয়ে এলেন। নিমাই তাই যেন মদের মত পান করল। তারপরেই নিত্যানন্দের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, 'ঝটিতি আমার হল আর মুষল দাও।'

নিত্যানন্দ হাত বাড়িয়ে দিলেন। নিমাই হাত পেতে নিলেন। কেউ কিছু দেখল না। আবার কেউ সত্য সত্যই দেখল, নিত্যানন্দ নিমাইকে হল আর মুষল দিল। সর্বকালেই এই সব কেউ দেখতে পায়, কেউ পায় না। সকলের মনের অবস্থা সমান নয়। সকলের দেখার চোখও এক রকম নয়। আর নিমাইয়ের আবেশ কেটে যেতেই, আবার সেই লজ্জিত জিজ্ঞাসা, 'কী চাঞ্চল্য করলাম?'

নিমাই বাড়ি ফিরে গেল। নিত্যানন্দেরও আশ্চর্য ভাবান্তর হল। অবধূত মহা হুংকার দিয়ে, তাঁর এতকালের দণ্ড কমণ্ডলু আছড়ে ভেঙে ফেললেন। পরের দিন নিমাই নিত্যানন্দের সঙ্গে গঙ্গাস্নানে গেল। নিত্যানন্দ নিমাইকে কুমীর মনে করে ধরতে গেল। অবধূত, খেয়ালী মানুষ, সর্বসংস্কারমুক্ত। এটি তারই এক অভিব্যক্তি। তারপরে ব্যাস পূজা।

নিত্যানন্দ বিধিমতে মন্ত্র পড়েন না, ব্যাসদেবকে মালা দিয়ে নমস্কারও করেন না। লক্ষণীয়, ব্যাসদেব, বেদকে চারি ভাগে বিভক্ত করেছিলেন, সেই জন্যই তিনি বেদব্যাস। বৌদ্ধ ও হিন্দু তান্ত্রিকেরা তাঁদের সাধনাকে আবার বেদবিহীন বলেছেন। নিত্যানন্দের মধ্যেও তা দেখা গেল। নিমাই পর্যন্ত নিত্যানন্দকে বলল, 'ব্যাসদেবকে মালা দিয়ে পূজা কর।'

নিত্যানন্দ সে কথা শুনলেন না। মালা পরিয়ে দিলেন নিমাইয়ের গলায়। মুহূর্তেই নিমাইয়েরও আবেশ হল। সে নিত্যানন্দকে ষড়ভুজ মূর্তি দেখাল। হাতে তার শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম এবং হল ও মুষল। সেই মূর্তি দেখে নিত্যানন্দ মূর্ছা গেলেন। এটা শুধু নিত্যানন্দই দেখলেন।

নিমাই তার পার্ষদ অবতার রূপে, নিত্যানন্দকেই প্রথম বলরামের অবতার করে, নিজের কৃষ্ণ-অবতারের সঙ্গতি রক্ষা করল। কিন্তু বলরাম কেন? এর কি

বিশেষ কোন অর্থ আছে? পুরাণের বলরাম সর্বদাই মদ্যপানে আরক্ত ঘূর্ণিত চোখ। নিত্যানন্দের বর্ণনায়ও একজন চরিতকার লিখছেন, 'ঘূর্ণিত লোচন বারুণী মদে মত্ত।' নিত্যানন্দ অবধূত। তাঁর কাছে বারুণী পান অন্যায় না হতেও পারে। নিত্যানন্দ যদি বারুণী (মদ) পানও করেন, তাতেই বা কী আসে যায়। নিমাইয়ের উদ্দেশ্য তো আচণ্ডালের মুক্তি। নিত্যানন্দের মধ্যে নেতৃত্বের শক্তি আছে। অবধূত হলেও মাধবেন্দ্র পুরীরও তিনি শিষ্য এবং বান্ধব। তা ছাড়া তিনি নবদ্বীপে ছুটে এসেছেন, প্রয়োজন বুঝেই। মাধবেন্দ্র পুরীর কথায় আসতে পারেন, অথবা নিজের ইচ্ছায়ও আসতে পারেন।

একদিক থেকে দেখতে গেলে, একজন সর্বসংস্কারমুক্ত অবধূতের পক্ষে এ রকম আন্দোলনে সামিল হওয়া সম্ভব। যিনি কোন আচারই মানেন না, তাঁর লজ্জা ঘৃণা ভয়ও থাকতে নেই। এটাই মন্ত্রের সত্য। আরও একটা বিষয় লক্ষণীয়, নিত্যানন্দ প্রথমে উঠেছিলেন নন্দন আচার্যের গৃহে। তারপরই চলে এলেন শ্রীবাসের গৃহে। কেবল কি এই কারণেই, শ্রীবাস বৈষ্ণব সমাজের এক-জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, বা তাঁর বাড়িতেই কীর্তন হয়ে থাকে? না কি নিত্যানন্দের কাছে আর কোন আকর্ষণ ছিল? কিন্তু ব্যবস্থাটা করল নাকি নিমাই। একদিক থেকে দেখতে গেলে ব্যাপারটা তাই। নন্দন আচার্যের গৃহে গিয়ে দেখা করে নিমাই-ই নিত্যানন্দকে শ্রীবাসের বাড়িতে ডেকে নিয়ে এল। নিত্যানন্দ শ্রীবাসকে পিতা এবং মালিনীকে মাতা জ্ঞানে সেই গৃহে থাকলেন। শ্রীবাসের ভ্রাতৃজায়া যুবতী বিধবা নারায়ণীও এই গৃহে আছেন।

এ বিষয়ে আমি এখন কিছু মন্তব্য করব না। তবে ঘটনাটি লক্ষ করবার মত। যাই হোক, এদিকে নিত্যানন্দকে দেখে, নবদ্বীপবাসী কেউ কেউ নিমাইয়ের দাদা বিশ্বরূপের চেহারার সঙ্গে মিল খুঁজে পেল। বিশ্বরূপ ষোল বছর বয়সে সন্ন্যাস নিয়ে গৃহত্যাগ করেছিলেন। নিমাই নিত্যানন্দকে মা শচী-দেবীর কাছে নিয়ে গেল। পরিচয় করিয়ে দিল। শচীদেবী আবেগের সঙ্গে বললেন, 'হা পুত্তির পুত মোর নিমাই নিতাই, যত্নহস্তে ধরিয়া কর তুমি বিভা।' কথাটার মানে কী? নিত্যানন্দকে তিনি বিয়ে করতে অনুরোধ করলেন?

নিমাই মাকে বলল, 'মা, এঁকে তুমি নিজের ছেলে বলে জানবে, সেই ভাবেই পালন করবে।'

নিত্যানন্দও বললেন, 'মা, আমাকে তোমার ছেলে বলেই জানবে।'

নিমাই এবার অন্যদিকে দৃষ্টি ফেরাল। সে রামাই পণ্ডিতকে ডেকে বলল,

'শান্তিপুরে যাও, অদ্বৈত আচার্যকে নিত্যানন্দ আগমনের সংবাদ দাও। যা কিছু দেখলে, সবই তাঁকে বলবে। আরও বলবে, আমার পূজার জন্ম তিনি যেন সস্ত্রীক এখানে চলে আসেন।'

নিমাইয়ের মনে আছে, অদ্বৈত বলেছিলেন, 'যে যা কিছুই হোক তাঁর কাছে সবাইকে আসতে হবে।' নিমাই গেছল। অদ্বৈত জল তুলসী তার পায়ে দিয়ে গেছলেন। তাতেই কি সব শেষ হবে? অদ্বৈতর অহংকারের শেষ করতে হবে না? নেতৃত্ব যে তার হাতে পরিপূর্ণ, তা দেখাতে হবে না? এখন আবেশ ঐশ্বর্যে সে পূর্ণ অবতার। সুতরাং সে অদ্বৈতর প্রার্থিত সেই নেতা। এবার এসে পরীক্ষা করুন।

রামাই পণ্ডিত শান্তিপুরে গিয়ে অদ্বৈতকে সব খবর দিয়ে বললেন, 'যাঁর জন্ম অপেক্ষা করেছেন, এত পূজা উপবাস করেছেন, স্তব ধ্যান করেছেন, তিনি আত্মপ্রকাশ করেছেন।'

অদ্বৈত দেরি না করে সস্ত্রীক নবদ্বীপে চলে এলেন। নিমাইকে দূর থেকে দেখেই সস্ত্রীক নমস্কার করতে করতে, স্তব পাঠ করতে করতে এগিয়ে এলেন। এক অভূতপূর্ব জ্যোতির্ময় দ্যুতি ছাড়া আর কিছুই দেখকে পাচ্ছেন না। গীতার বিশ্বরূপ দর্শনের সেই জ্যোতির্ময়। বললেন, 'আমার কোন শক্তি নেই, সব তোমার করুণা। তুমি ছাড়া কে জীবের উদ্ধার করবে?' বলে আবার স্তব পাঠ করলেন, 'নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় জগদ্ধিতায়।'

মুহূর্তেই নিমাই অবতার আবেশে। সে অদ্বৈতর মাথায় নিজের পা তুলে দিল। সাংঘাতিক ব্যাপার! কিন্তু যত সাংঘাতিকই হোক, অদ্বৈতর মাথায় পা তুলে না দিলে, সে যে স্বয়ং কৃষ্ণ, তা নিজেও বিশ্বাস করবে কেমন করে? অন্যেরাই বা বিশ্বাস করবে কেন? সবাই দেখুক, নিমাই কে। তারপরে সে অদ্বৈতকে নৃত্য করতে বলল। অদ্বৈত নাচতে লাগলেন। দুরন্ত দুর্দান্ত নাচ! ক্ষণে বিশাল, ক্ষণে মধুর। ক্ষণে ওঠে, ক্ষণে পড়ে। ঘন ঘন শ্বাস, মূর্ছা যান। আবার ধেয়ে যান নিমাইয়ের পাশে। কেবল নিত্যানন্দ ভ্রূকুটি করে হাসেন।

নিমাই নিজের গলার মালা অদ্বৈতর গলায় পরিয়ে দিয়ে বলল, 'কী বর চাও তুমি?'

অদ্বৈত বললেন, 'বরের অধিক, তোমার অবতার রূপ দেখলাম, আর কি বর চাইব। এবার তুমি স্ত্রী শূদ্র আদি মূর্খদের, ভক্তিরসে প্লাবিত কর। আচণ্ডাল নাচুক তোমার গান গেয়ে।'

নিমাই বলল, 'করি সত্য তোমার অঙ্গীকার।'

আন্দোলনের নতুন সূত্রপাত হল। এ আন্দোলন আকাশ থেকে নবদ্বীপের মাটিতে পড়েনি। ইতিহাসের প্রয়োজনেই তিলে তিলে গড়ে উঠেছে, ইতিহাসের পথেই আমি তা দেখতে পেয়েছি। অদ্বৈতর মাথায় পা তুলে দেবার পরে আর কারুর মনে কিছুমাত্র সন্দেহ রইল না, নিমাই কৃষ্ণের অবতার।

নিমাইয়ের মনেও এই অবতারবোধ দৃঢ় হল। নিমাই এবার দলবৃদ্ধির দিকে নজর দিল। সংগঠনকে জোরদার করতে হলে, বৈষ্ণব সমাজের কলেবর বাড়ানো দরকার। তার সেই ক্ষমতার পরিচয় আমি আগেও কিছু দেখেছি। সে নবদ্বীপের তাম্বুলি মালাকার ইত্যাদিদের পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে ঘুরে বেড়াত। সে কোন কালেই ঘরকুনো অধ্যাপকটি ছিল না। বিভিন্ন রুচির লোককে একত্র করে সংঘবদ্ধ করার অদ্ভুত কৌশল ও আকর্ষণী শক্তি তার ছিল। এটাই তার নেতৃত্বের বিশেষত্ব। তা ছাড়া আমরা আগে থেকেই দেখে আসছি, সে তার অবতারত্ব সংঘ গঠনের কাজে প্রয়োগ করতে শুরু করেছে।

বৈষ্ণবদেরও ভয় কেটে যাচ্ছে। স্বয়ং অবতার উপস্থিত, আর কিসের ভয়? এ সময়ে নিমাইয়ের সূক্ষ্ম পরিহাস করাও লক্ষণীয়। এটি প্রমাণ করে, তার মনের সম্পূর্ণ সুস্থতা। শচীদেবী বললেন, 'আমার বিষ্ণু-ঘরের দুই মূর্তি বলরাম আর কৃষ্ণ কাড়াকাড়ি করে নৈবেদ্যের সন্দেশ দুধ খাচ্ছে এই স্বপ্ন দেখলাম।'

নিমাই পরিহাস করে বলল, 'আমি দেখি বারে বারে নৈবেদ্যের সাজে আধা-আধি থাকে না। কিন্তু সেটা কার লজ্জায়? তোমার বধূকে আমার একটু সন্দেহ ছিল, এখন সে সন্দেহ ঘুচল।'

অর্থাৎ স্বয়ং লক্ষ্মীনারায়ণই তোমার ঘরে লীলা করছে। লক্ষ্মীটি আত্মগোপন করে থাকে। বিষ্ণুপ্রিয়ার অন্তরে হাসির উচ্ছ্বাস দেখা গেল। এ বড় মধুর পরিহাস।

নয়



একদিকে ভাবাবেশে নানা অবতার মূর্তির প্রকাশ। অন্যদিকে রাত্রে শ্রীবাস অথবা চন্দ্রশেখরের বাড়িতে ঘোর কীর্তন শুরু হল। এবার ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে কীর্তন শুরু হল। পাষণ্ডীরা বা কৌতূহলী দর্শকেরা কিছুই দেখতে পায় না। বিশেষ করে পাষণ্ডীরা। দুটি শক্তি, যবনরাজ ভীতি আর পাষণ্ডী অনাচার, আন্দোলনের পাশাপাশি চলেছে।

পাষণ্ডীরা বলল, নিমাইয়ের অধঃপতন হয়েছে। সঙ্গদোষ, বাপ না থাকা (বিপথগামিতার কারণে), আর বায়ুরোগ। এদিকে বৈষ্ণবদের জন্যই দুর্ভিক্ষ অনাবৃষ্টি, ধান মাঠে নষ্ট হয়ে মরে যাওয়া। ব্রাহ্মণদের পক্ষে নাচা অনুচিত। একসঙ্গে সকলে বসে খায়, এতে জাতি নষ্ট হয়। রাত্রে নিশ্চয় এরা মদ পান করে, মেয়েমানুষের সঙ্গ করে, নইলে দরজা বন্ধ করে কেন?

অতএব শ্রীবাসের ঘর ভেঙে ফেলা হোক। নইলে যবনরাজ গ্রাম উৎখাত করবে। রাজদরবারে খবর দাও, এদের কোমরে দড়ি বেঁধে ধরে নিয়ে যাক।

এদের কথাও ফেলবার নয়। যবনরাজ ভীতি তো এদেরও আছে। নিত্যানন্দ বারুণী পান করতেন কী না, বোঝা যায় না। তবে বারনারীর কোন প্রশ্নই নেই। কিন্তু মহিলা বৈষ্ণবরাও কীর্তনে থাকতেন।

শ্রীবাসের বাড়িতে নিমাইয়ের অভিষেক হল। নিত্যানন্দ মাথায় ছাতা ধরলেন, অদ্বৈত স্তব করলেন। শ্রীধরকে ডেকে আনতে বলল। শ্রীধর এলে, তাঁকে বলল, 'শ্রীধর আমার স্তব কর।'

শ্রীধর বেচারী কলাগাছের খোলা বেচে খায়। সংস্কৃত জানে না। বিপদে পড়ে বলল, 'আমি সংস্কৃত জানি না, কী স্তুতি করব?'

নিমাই বলল, 'তুমি যা বলবে, তাই আমার স্তুতি।'

বড় কথা। অর্থাৎ এ সময়ে স্তুতি স্তব কেউ সংস্কৃত ছাড়া ভাবতে পারে না। নিমাই বলল, 'বাংলাতেই বল। তোমার যা ভাবা।' বাংলা ভাষার এই মূল্য তখন রঘুমণি, রঘুনন্দন, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, কেউ বোঝেননি। নিমাই বুঝেছিল,

সংস্কৃত না, বাংলা চাই। বুদ্ধদেব সেইজন্যই পালি নিয়েছিলেন। 'সংস্কৃত নেবনি।'

নিমাইয়ের এই অভিষেক হল কবে? নিত্যানন্দ এসেছেন ১৫০৯ খৃষ্টাব্দের জুনের শেষে। অভিষেক হল আগস্ট মাসে। এই অভিষেকের দিন, নিমাই তার ভোজনাবশেষ অর্থাৎ তার উচ্ছিষ্ট খাদ্য নারায়ণীকে দিল। 'গৌরাঙ্গের অবশেষ পাত্র নারায়ণী।' এটি বৃন্দাবনদাস নিজেই তাঁর মায়ের সম্পর্কে লিখেছেন। কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন—

'নারায়ণী চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট ভোজন
তাঁর গর্ভে জন্মিল শ্রীদাস বৃন্দাবন।'

১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দের আগস্টে, উচ্ছিষ্ট ভোজনে যদি নারায়ণীর গর্ভ সঞ্চার হয়, তবে ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে দশ মাস পূর্ণ হয়ে, বৃন্দাবনদাসের জন্ম হয়েছিল। উচ্ছিষ্ট ভোজনে বিধবার গর্ভ সঞ্চার? একটি ঘটনা। এখানে প্রাকৃত অপ্রাকৃতের প্রশ্ন আসে না। বৃন্দাবনদাসও নিজেকে সব সময় 'নারায়ণী সুত' বলে পরিচয় দিয়েছেন। কোথাও পিতার নাম লেখেননি।

আধুনিক মন যুক্তিবাদী, এখানে এসেই হোঁচট খাচ্ছে। খুবই স্বাভাবিক। তবে গোয়েন্দাগিরি করে লাভ নেই। যে বোঝে, সে জানহ সন্ধান। নিমাই অভিষেকের দিন সবাইকে বর দিল। অদ্বৈতকেও দিল। দিল না কেবল নিত্যানন্দকে। কেন? না, নিত্যানন্দ বরদানের উর্ধ্বে। তাঁর একখানি কৌপীন ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে সবাইকে দান করা হল। তাঁর পাদোদকও সবাইকে পান করানো হল। কেন?

এখানে একটা কথা অপরিহার্য হয়ে উঠছে। নরহরি বৈষ্ণব আন্দোলনের একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। নিমাই তাঁকে 'প্রাণের নরহরি' বলেছে। এই নরহরির সঙ্গে কোন কারণে, নিত্যানন্দের বিরোধ ছিল। বৃন্দাবনদাসই লিখেছেন, একদল লোক নিত্যানন্দের বিরোধী ছিলেন। বৃন্দাবনবাস তাঁদের মাথায় লাথি মারতে চেয়েছেন। 'তবে লাথি মারো তার শিরের উপরে।' নরহরির নাম না করলেও, লাথি যে নিত্যানন্দ-বিরোধী নরহরির মাথায়ও পড়ল, সন্দেহ নেই। নরহরি নদীয়া নগরী ভাবের প্রবর্তক, যা আমরা লোচনে দেখতে পেয়েছি। নরহরি নিমাইকে কৃষ্ণ, নিজেকে রাধা ভাবতেন। গদাধরও তাই ভাবতেন।

এই নরহরি কি বৃন্দাবনদাসের অলৌকিক জন্মের জন্য নিত্যানন্দের প্রতি কোন কুৎসিত ইঙ্গিত করেছিলেন? কেন না দেখা যাচ্ছে, পরবর্তীকালে মামগাছী গ্রামে বৃন্দাবনদাস ছেলেবেলা থেকেই নিত্যানন্দের বিশেষ স্নেহভাজন

কৃপাপাত্র ছিলেন। দীক্ষাও নিয়েছিলেন তাঁর কাছ থেকে।

নিত্যানন্দ অবধূত, তাঁর গম্যাগম্য বলে কোন নিষেধ নেই। নারায়ণীর গর্ভ-সঞ্চারের কালে তিনি শ্রীবাসের গৃহেই ছিলেন। নারায়ণীও সেখানে। অতঃপর এ বিষয়ে আর আলোচনার প্রয়োজন নেই। আমাদের সামনে এর থেকে অনেক বৃহত্তর ঘটনা অপেক্ষা করছে।

নিমাই অভিষেকের দিন নিত্যানন্দের কৌপীন ছিঁড়ে সবাইকে দিল, তার পাদোদকও সবাইকে পান করাল। এর উদ্দেশ্য একটিই। দল সংগঠনের ব্যাপারে, নিত্যানন্দের স্থান সে নির্দিষ্ট করে দিল। এইখানেই যবন হরিদাসকে সে বর দিল, 'আমার শরীর থেকে তুমি বড়, তুমি আমি এক জাতি। তোমাকে যখন বাইশ বাজারে চাবুক মারা হয়েছিল, তুমি আমাকে স্মরণ করেছিলে। আমি তখনও নিজেকে প্রকাশ করেছিলাম।'

হরিদাস এই মিলন বর ও অবতারত্ব প্রকাশ শোনবার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর নাম জপ বৃথা হয়নি। কৃষ্ণের অবতার আবির্ভূত হয়েছেন। বিশেষ, নিমাই নিজেকে হরিদাসের একজাতি বলে প্রকাশ করল। তারপরেই নিমাই নতুন মোড় নিল। নিত্যানন্দ আর হরিদাসকে ডেকে বলল, 'তোমরা দুজনে প্রতি ঘরে ঘরে গিয়ে এই ভিক্ষা কর, সকলে কৃষ্ণ ভজ, কৃষ্ণ বল, কৃষ্ণ শিক্ষা কর। সারাদিনের শেষে এসে আমাকে সব বলবে। যদি কেউ তোমাদের প্রতি বিরূপ হয়ে নাম না বলে, আমি নিজে চক্র হাতে সবাইকে কাটব।'

কাটার কথা পরে। নিমাইয়ের নির্দেশটি দুর্দান্ত। একজন মুসলমান, আর একজন হিন্দুকে একত্রে সে ঘরে ঘরে নামকীর্তনে পাঠাল। ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত নবদ্বীপের পথে একজন মুসলমান, বৈষ্ণব হয়ে কৃষ্ণনাম করে বেড়াচ্ছে, এটা একটা ভূমিকম্পের মত ঘটনা। অতি দুঃসাহসের কাজ। কেউ কেউ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। মার মার বলে ছুটে এল। বাদশাহের দরবারে ধরে নিয়ে যাবার কথা বলল।

এই নবদ্বীপে সুব্রাহ্মণের দুই পুত্র, জন্ম এক ঠাঁই। নাম জগাই মাধাই। রাজানুগ্রহে তারা এত দূর বেড়ে উঠেছে, গোমাংস ভক্ষণ তো কিছুই না, গুরুপত্নীরাও এদের কামাসক্ত আক্রমণ থেকে রেহাই পায় না। মদ খেয়ে তো সব সময়ে মত্ত হয়ে আছে। একদিন নিত্যানন্দ আর হরিদাস দেখলেন, দুজনেই এক জায়গায় মাতাল হয়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে। রাস্তায় যাকে পাচ্ছে, তাকেই পেটাচ্ছে। আর চকার বকার খিস্তি মুখে লেগেই আছে। এদের দেখলেই নবদ্বীপের লোকের প্রাণ উড়ে যায়।

দুজনকে দেখেই নিত্যানন্দের প্রাণ করুণায় বিগলিত হল। 'করুণা' শব্দটি

বৌদ্ধদের নিজস্ব। বৈষ্ণবরা এই শব্দ বৌদ্ধদের কাছ থেকেই গ্রহণ করেছেন। নিত্যানন্দ হরিদাসকে বললেন, 'চল, এই দুজনকে প্রভুর আজ্ঞা জানাই।'

কাছে পিঠে যারা ছিল, সকলেই বারণ করল, 'সর্বনাশ, কাছে গেলেই প্রাণ হারাবে। আমরা ভয়ে দূরে থাকি, তোমরা কোন্ সাহসে যাচ্ছ? ওরা সন্ন্যাসী-টন্ন্যাসী কিছুই মানে না।'

তবু নিত্যানন্দ হরিদাসকে নিয়ে, দুই হিংস্র পশুতুল্য মাতালের কাছে গেলেন। দুজনের নাম ধরে ডেকে প্রভুর আজ্ঞা শোনালেন।

ডাক শুনে দুই মাতাল রক্তচক্ষে তাকায়। ধর ধর বলে চিৎকার করে। হরিদাস ভয় পেয়ে সরে গেলেন। নিত্যানন্দের ওপর চটে বললেন, 'তোমার বুদ্ধিতে অপমৃত্যু হবে। যবনের হাতে মার খেয়ে বেঁচেছিলাম। এগুলো পশু। তোমার চঞ্চল বুদ্ধিতে এদের কাছে প্রাণ হারাতে হবে।'

নিত্যানন্দ বললেন, 'আমি চঞ্চল নই, তোমার অন্তরই বিহ্বল। মনে রাখবে প্রভুই সব। তাঁর আজ্ঞা রাজ-আজ্ঞা।' সেদিন দুজনেই ফিরে এসে নিমাইকে সব কথা বলল। নিমাই হুংকার দিয়ে উঠল, 'সেই দুই ব্যাটাকে আমি খণ্ড খণ্ড করে কাটব।'

নিত্যানন্দ এটা সমর্থন করলেন না। এটা তাঁর বৈশিষ্ট্য। বললেন, 'তুমি খণ্ড খণ্ড কর, কিন্তু আমি এ দুজনকে ছাড়ব না। তোমার এত বড়াই কিসের? আমি ওদের মুখ দিয়ে গোবিন্দ নাম বলাব।'

অদ্বৈত হরিদাসকে সাহস দিয়ে বললেন, 'কোন চিন্তা নেই। নিত্যানন্দ মাতাল, জগাই মাধাইও মাতাল। তিন মাতাল এক সঙ্গে হবে। সে-ই ওদের দলে আনতে পারবে।'

অদ্বৈত সব সময়ই নিত্যানন্দকে 'মাতালিয়া' বলতেন। কেবল রহস্য করে নয়। বোধ হয় সত্যই মাতালিয়া। এদিকে নিমাই যে গঙ্গার ঘাটে স্নান করে, জগাই মাধাই সেখানে গিয়ে থানার ঘাঁটি করল। ঘাট থেকে তারা নিমাইয়ের বাড়ি থেকে ভেসে আসা মৃদঙ্গ মন্দিরার বাজনা আর নামগান শুনেও নাচতে লাগল। মাতাল তো! কোন খেয়াল নেই, কিসের নাম হচ্ছে। কয়েকদিন যায়। একদিন নিমাইকে দেখে তারা বলল, 'নিমাই পণ্ডিত, তুমি মঙ্গলচণ্ডীর গানের ব্যবস্থা কর,আমরা গায়ক এনে দেব।'

নিমাই কোন প্রত্যুত্তর না করে চলে এল। মঙ্গলচণ্ডীর গানে জগাই মাধাইয়ের উৎসাহ। তারা শাক্ত। বিষহরির পূজা করে, নাচে গায় মদ খায়।

আরও অনেক ক্রিয়াকাণ্ড করে। এর মধ্যেই নিত্যানন্দ একদিন রাত্রে নগর ঘুরে, নিমাইয়ের কাছে আসছিল। পথে জগাই-মাধাইয়ের সঙ্গে দেখা, বলে, 'কে রে? কে তুই, কী নাম তোর?'

নিত্যানন্দ নিজের নাম বা বৈষ্ণব কিছুই বললেন না। বললেন, 'আমার নাম অবধূত।'

অবধূত শুনে জগাই-মাধাইয়ের চটে ওঠার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। কিংবা তারা অবধূত-এর ব্যাখ্যা জানত না। কারণ অবধূত শুনেই, মাধাই মদের মাটির মটকা ছুঁড়ে মারল নিত্যানন্দের মাথায়। মাথা ফেটে রক্ত ঝরতে লাগল। মাধাই আবার মারতে গেল। জগাই বাধা দিয়ে বলল, 'দেশান্তরী সন্ন্যাসীকে মেরে কী লাভ? কেন মারলে?'

ঘটনাটা লোকে দেখল। দেখেই দৌড়ে গিয়ে নিমাইকে খবর দিল। নিমাই সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে ছুটে এল। এসে দেখল, নিত্যানন্দের মাথা ফেটে রক্ত পড়ছে, কিন্তু তিনি হাসছেন। নিমাই ভয়ংকর ক্রুদ্ধ হয়ে চিৎকার করে উঠল, 'চক্র—চক্র—চক্র দাও আমাকে।'

চক্র এল। কোথা থেকে, কেমন করে, সে কথা আলাদা। সবাই দেখল, নিমাইয়ের হাতে চক্র। জগাই-মাধাইও দেখল। কিন্তু নিত্যানন্দ বললেন, 'মাধাই মেরেছে, জগাই রেখেছে। তুমি এ দুজনের প্রাণ আমাকে ভিক্ষা দাও। আমার কোন কষ্ট নেই।'

নিমাই নিজেকে সংবরণ করল। দেখল, জগাই মাধাই দুজনেই ভীত সন্ত্রস্ত। জগাইয়ের ওপর তার মন প্রসন্ন হল। সে জগাইকে আলিঙ্গন করল। জগাই সেই স্পর্শে মুহূর্তেই মূর্ছা গেল। নিমাই জগাইয়ের বুকের ওপর পা তুলে দিল। তারপরে জগাই মাধাই দুজনেই শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম হাতে নিমাইকে দেখল। দেখে মাধাইয়েরও চিত্ত স্থির হল। দুজনেই নিমাইয়ের পায়ে এসে পড়ল। নিমাই বলল, 'তোরা আর করিস না পাপ।'

জগাই মাধাই বলল, 'আর না রে বাপ!'

জগাই মাধাইয়েরও অবতার দর্শন হল। একেই বলে রূপান্তর। আন্দোলন সংগঠনের মধ্য দিয়েই এ ঘটনাটি ঘটল। নিমাই দুজনকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল। সেখানে কীর্তন আরম্ভ হল। শচীদেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়া এ দৃশ্য দেখে আনন্দ সাগরে ভাসতে লাগলেন। কিন্তু এ রূপান্তরটি নিত্যানন্দের পূর্বপরিকল্পিত বলেই মনে হয়। নিত্যানন্দ এ ঘটনার দ্বারা বৈষ্ণব ধর্মের অহিংস নীতিবাদ ক্ষমার ভিত্তির

ওপর প্রতিষ্ঠিত করলেন। নিত্যানন্দের এই উদ্ধারকার্যকে 'নির্লক্ষ উদ্ধার' বলা হয়েছে।

অবশ্য সেই পরিচিত কথা নিত্যানন্দ বলেছিলেন, 'মারিলি কলসীর কানা, সহিবারে পারি, তোদের দুর্গতি আমি সহিবারে নারি। মেরেছিস ক্ষতি নেই, কিন্তু হরিনাম বল্।'

নিত্যানন্দ ঘটনা ঘটালেন, নিমাই অবতারত্ব দেখাল। জগাইয়ের পাপ হাত পেতে নিল নিমাই, মাধাইয়ের নিত্যানন্দ। অতঃপর জগাই-মাধাইয়ের পরিবর্তন। ভোরবেলা দুজনে গঙ্গাস্নান করে দু লক্ষ কৃষ্ণনাম জপ করে। স্বয়ং নিমাই এসে তাদের খাওয়ায়। কিন্তু জগাই-মাধাইয়ের প্রাণের অনুশোচনা যায় না। নিমাই বলল, 'ঘাট সাজাও, পূজার জন্ম সবাইকে বিনীত নমস্কার কর, সেবা কর। জপ কর। তবেই মুক্তি পাবে।'

লম্পটেরা ব্রহ্মচারী হল। এবার সবাই নিমাইকে প্রাকৃত মানুষের উর্ধ্বে চিন্তা করতে লাগল। কেবল বৈষ্ণবরা নয়, সকল নবদ্বীপবাসী। কারণ জগাই-মাধাইয়ের ভয়ে সকল নবদ্বীপবাসীই সন্ত্রস্ত ছিল। নিমাইকে তারাও অবতার মনে করতে লাগল।

দশ



আন্দোলন ক্রমেই বাড়ছে। ঠিক পথেই চলেছে। নিমাই সকলের মনে নতুন রেখাপাতের জন্মই বোধ হয় একটি নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করল। বলল, 'আমি প্রকৃতি হয়ে নাচব। রুক্মিণীর বেশে নাচব।'

চন্দ্রশেখরের বাড়িতে এ নাটকের অভিনয় হল। শচীদেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়া নাটক দেখতে গেলেন। হরিদাস মস্ত বড় গোঁফ লাগিয়ে আসরে এলেন। তিনি বৈকুণ্ঠের কোটাল। শ্রীবাস নারদ। নিমাই এল রুক্মিণীর বেশে। কেবল বেশ ধারণ নয়, রুক্মিণীর বেশে রুক্মিণীর ভাবাবেশও হল। গদাধর রুক্মিণীর সহচরী সুপ্রিয়া সেজে এলেন।

আসলে রুক্মিণীর বেশে নাচতে গিয়ে, নিমাই আদ্যাশক্তির বেশও দেখাল। যেন মহাচণ্ডী। উদ্দেশ্য স্পষ্ট। নিমাই চণ্ডীরও অবতার। লৌকিক বৈদিক, সব কৃষ্ণশক্তিই দেখানো। এর পরেই অদ্বৈত আবার শান্তিপুরে চলে গেলেন। গিয়ে

জ্ঞান পথে শাস্ত্র ব্যাখ্যা আরম্ভ করলেন। ভক্তি-পথ ছেড়ে জ্ঞান-পথে।কেন ? নিমাইকে আবার পরীক্ষা।

নিমাই নিত্যানন্দকে নিয়ে শান্তিপুরে গেল। গিয়ে অদ্বৈতকে বলল, 'হে নাঢ়া (নেতা বা গুরু), এ আবার কী ব্যাখ্যা ? বল, জ্ঞান বড়, না ভক্তি বড় ?'

অদ্বৈত বললেন, 'জ্ঞান বড়।'

আর যাবে কোথায়। অদ্বৈতকে রক থেকে উঠোনে নামিয়ে কিল মারতে আরম্ভ করল নিমাই। অদ্বৈতর বৃদ্ধা পত্নী কেঁদে উঠলেন, 'কর কি কর কি, বুড়ো ব্রাহ্মণকে মার ? কী শিক্ষায় এত অপমান তাঁকে কর ?'

অদ্বৈত বললেন, 'আমি দুর্বাসা নই যে শাপ দেব। ভৃগু নই যে তোমার বুকে লাথি মারব। আমি তোমার শুদ্ধ দাস।'

অদ্বৈত-চরিত্র বিকাশের জন্য এ প্রহারেরও প্রয়োজন ছিল। তাঁর পরীক্ষা আবার সফল হল। কেন না, আসলে ভক্তিপথে শাস্ত্র ব্যাখ্যায়, তিনিই তো প্রকৃত প্রধান নেতা। নিমাই অদ্বৈতকে নিয়ে নবদ্বীপে ফিরে এল। ফিরে এসে সে প্রকাশ্যে সকল বৈষ্ণবকে মন্ত্র শোনাল, মন্ত্র এক : হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে। বলল, 'সবাই এই মন্ত্র জপ কর। এই মন্ত্র বল। এর মধ্যে অপ্রকাশ্য কিছু নেই।'

এর পরে জগাই মাধাই উদ্ধার ও নাটক ইত্যাদির পরে, ক্রমেই যবনরাজের উষ্মা প্রকাশ পেতে লাগল। বৈষ্ণবরা কীর্তনের সাফল্যে আনন্দেই ছিলেন। কিন্তু পাষণ্ডীরা ষড়যন্ত্র করে কাজীকে খবর দিল—'নিমাই পণ্ডিত আমাদের ধর্ম নষ্ট করছে। তাকে ডেকে শায়েস্তা করুন।'

নিমাই এই সময়ে আর একটি কাজ করল। নগরিয়াদের বাড়িতে দুর্গাপূজার সময় যে সব বাজনা বাজে, মৃদঙ্গ শঙ্খ মন্দিরা, সবই কীর্তনে ব্যবহার করতে বলল।

সময় ১৫০৯ খৃষ্টাব্দ। হুসেন শাহর রাজত্বেই এই আন্দোলনের সূত্রপাত। এর আগে আমরা নিমাইয়ের জন্মের সময়ে দেখেছি ফতেশা নবদ্বীপ হিন্দু উৎসন্ন করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। এখন দেখছি হুসেন শাহর আমলে, নিমাই আন্দোলনে নেমেছে। আর ইতিমধ্যেই হুসেন শাহ উড়িষ্যার দেব-দেউল ভেঙেছেন।

এইবার কাজীর সঙ্গে নিমাইয়ের সংঘর্ষ দানা বেঁধে উঠতে লাগল। চাঁদকাজী থাকত সিমুলিয়ায়, নবদ্বীপ থেকে কিছু দূরে। হুসেন শাহর সে দৌহিত্র। হুসেনের আঠারোটি ছেলে। মেয়ে কয়টি ছিল, জানা যায় না। কাজী কোন্ মেয়ের ছেলে, এটা ঠিক নির্ণয় করা কঠিন। কারণ চাঁদকাজীর যাকে আমরা ঘটনা-প্রবাহের মধ্যে

দেখতে পাচ্ছি না। হুসেন শাহ যে চাঁদকাজীর সাক্ষাৎ মাতামহ, এটা নবদ্বীপবাসী সকলেই জানে। পাষণ্ডীরা তার কান ভারী করছিল। কাজী নিজেও যে কোন সংবাদ রাখছিল না, তা বলা যায় না।

নিমাই যে-ভাবে সমস্ত দিক ভেবে চিন্তা করে, তার নিজের অবতারত্ব দর্শন করানো থেকে শুরু করে,যবনরাজ ভীতি দূরীকরণের প্রয়াসে নিজেএকলা নগরে পরিভ্রমণ করেছে, এবং রাজার নৌকা বৈষ্ণবদের ধরতে এলে সে সকলের আগে গিয়ে নৌকায় উঠে রাজার সকাশে যাবে, এবং 'আমিই সে' 'সংহারিমু' ইত্যাদি সমস্ত ঘটনাই, রাজশক্তির সঙ্গে একটা অনিবার্য সংঘর্ষের দিকে এগিয়ে চলছিল। নিমাইও তাই চাইছিল। এর একটা ঐতিহাসিক প্রয়োজনও ছিল।

চাঁদকাজী নবদ্বীপে বিশেষ যাতায়াত করত না। তার থানাদার কোটালরাই শাসন করত। তা ছাড়া গুপ্তচররা ছিলই। তাদের মধ্যে পাষণ্ডীরাও ছিল। নিমাইয়ের আন্দোলন আদৌ কোন অলৌকিক পথ ধরে চলছিল না। তার অবতারত্ব আসলে সাধারণ মানুষের মনের মধ্যে একটা বিশেষ ক্রিয়ার কারণেও বটে। সেদিক থেকে সে সার্থক হয়েছিল। আচণ্ডাল জনসাধারণের মহাসংঘ যেভাবে ক্রমাগতই জেগে উঠেছিল, এটা পাষণ্ডীদের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। তারাও সংঘর্ষের ইন্ধন যোগাচ্ছিল। তারা স্পষ্টই প্রচার করছিল, "নিমাই ভ্রষ্ট চরিত্র। দরজা বন্ধ করে বৈষ্ণবদের নিয়ে মদ্যপান চালাচ্ছে। আর বারাঙ্গনাদের এনে সেখানে ব্যভিচার করছে।" জেনে শুনেই এ মিথ্যা প্রচার তারা চালাচ্ছিল।

অবশ্য নিত্যানন্দ একটা কারণ। তিনি মাতলিয়া বটে। নিমাইকেও আমরা একাধিকবার 'মদ আন মদ আন' বলতে শুনেছি। কিন্তু নিমাইয়ের পক্ষে এটা ঐতিহাসিক সত্য নয়।

যাই হোক, কীর্তনের সাফল্যে বৈষ্ণবদের আনন্দেই দিন কাটছিল। তাঁদের ভয় ছিল না, কৃষ্ণ-অবতার নিমাইকে পেয়ে তাঁরা নিঃশঙ্ক ছিলেন। এই সময়েই একদিন চাঁদকাজী নবদ্বীপ পরিক্রমায়, সন্ধ্যাবেলা সম্ভবতঃ শ্রীবাসের বাড়ির সামনে দিয়ে যাবার সময়, বৈষ্ণবদের মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ বাদ্যসহ কীর্তন শুনতে পেল। শুনেই সে ক্ষেপে লোকজন সহ মহা চিৎকার জুড়ে দিল। যাকে কাছে পেল, সাধারণ মানুষদের ধরেই প্রচণ্ড মারধোর শুরু করে দিল। যে সব বৈষ্ণবদের কাছে পেল, তাদের প্রতি অত্যাচারের তো কথাই নেই। তাদের কাঁধ থেকে মৃদঙ্গ টেনে নিয়ে মাটিতে আছড়ে ভাঙল। নানা রকম অনাচার

করল দলবল সহ।

অনাচার বলতে থুথু দেওয়া, বৈষ্ণবদের ঘরের সামনে প্রাকৃতিক ক্রিয়াদি, কিছু বাদ গেল না। সবাই ভয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে যেদিকে পারল, পালাতে লাগল। তার মধ্যে চাঁদকাজী স্পষ্টই নাম করে বলল, 'সবগুলোকে শায়েস্তা করব। আমার রাজ্যে কে এই হিন্দুয়ানি করছে, যার রূপ অন্য রকম? কোথায় সেই নিমাই আচার্য? দেখি সে কী করে।'

চাঁদকাজী আর কারুর নাম করল না, কিন্তু নিমাই আচার্যের নাম করল। এর থেকেই প্রমাণ হল, সে নিমাইয়ের কথা সবই শুনেছিল। নিমাই যে নেতৃত্ব করছে, এটাও তার কর্ণগোচর হয়েছিল। সেই জন্যই, ঐতিহাসিক দিক থেকে, সে নিমাইকেই 'চ্যালেঞ্জ' করল। 'দেখি আজ তোদের নিমাই কি করে?' এই ছিল তার হুংকার।

চাঁদকাজীর এটা দৈবভ্রমণ নয়। সম্ভবতঃ চক্রান্ত করেই সে সিমুলিয়া থেকে নবদ্বীপে সন্ধ্যাবেলা এসেছিল। আর এক সন্ধ্যাতেই ব্যাপারটা মিটল না। সে কিছুকাল প্রতিদিনই এই কাণ্ড আরম্ভ করল। কোথায় কীর্তন হচ্ছে, সে খুঁজে বেড়াতে লাগল। আর নগরিয়া বা বৈষ্ণবরা সব ভয়ে দুঃখে লুকিয়ে থাকা ছাড়া আর কোন পথ পেল না।

নিমাইয়ের নেতৃত্ব যেন এরই জন্য অপেক্ষা করেছিল। কিন্তু বৈষ্ণবরা এসে নিমাইকে বলল, 'আমরা নবদ্বীপ ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাব। এখানে থাকলে প্রাণে মারা যাব। কীর্তন তো করতেই পারব না।'

এ ঘটনাটি জরাসন্ধ-ভীত যদুবংশের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। কংস-হত্যার পর জরাসন্ধ যখন মথুরা আক্রমণের উদ্যোগ করছিলেন, আর যদুবংশ ভয়ে নির্জীব হয়ে পড়েছিলেন, তখন তাঁরা কৃষ্ণকে বলেছিলেন, 'জরাসন্ধ আমাদের সমূলে বিনাশ করবে। মধুসূদন, তুমি থাকতে আমরা উচ্ছন্নে যেতে বসেছি।'

কৃষ্ণ বাস্তব অবস্থা বুঝে, সাময়িক ভাবে পশ্চাদপসরণ করেছিলেন। সমস্ত যদুকুলকে নিয়ে, দ্বারকার নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে চলে গিয়েছিলেন। নিমাইয়ের পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। সে তা চায়ওনি। সে নিত্যানন্দকে ডেকে বলল, 'নিত্যানন্দ, সাবধান হবার সময় এসেছে।' অর্থাৎ চুপ করে এ অত্যাচার সহ্য করা সম্ভব নয়। বৈষ্ণবদের সকলের সঙ্গে কথা বলা দরকার।

নিমাই সকল বৈষ্ণবদের ভরসা দিয়ে, অতি ভয়ংকর কথা বলল, 'আমরা সমস্ত নবদ্বীপে কীর্তন করব, দেখি আমাকে কে কী করে। কাজীর মোকাবিলা

করতে হবে। দরকারে তার বাড়ি আক্রমণ করব। দেখি গৌড়ের রাজা আমার কী করতে পারে।'

নিমাই যে সবই জ্ঞাতসারে করছে, বোঝা গেল। পালাবার প্রস্তাব উড়িয়ে দিল। বরং সে সমস্ত নাগরিকদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। এখন আর কেবল বৈষ্ণবদের কাছে নয়। সমস্ত সাধারণ মানুষ বৈষ্ণব নয়। সে বৈষ্ণবদের কাছে গেল। আবার সাধারণ মানুষের কাছেও গেল। সংকট মুহূর্তে, এই নেতার দূরদৃষ্টি দেখিয়ে দিয়েছিল, কেবল বৈষ্ণবরা নয়, সাধারণ মানুষও তাকেই মনে মনে সমর্থন করে। সুতরাং অভিযান দলগত নয়, সমস্ত নবদ্বীপবাসীর মিলিত অভিযানের ডাক দিল নিমাই। বলল, 'আজ বিকেলে তোমরা সকলে আমার বাড়ির সামনে এসে উপস্থিত হবে। প্রত্যেকে হাতে একটি করে মশাল নিয়ে আসবে। (তা হলে এ যুগের রাজনৈতিক দলগুলোর বর্তমান মশাল মিছিল নতুন কিছু নয়, ষোড়শ শতাব্দীর গোড়াতেই নিমাই এই মশাল মিছিলের প্রবর্তক।) কেউ ভয় করো না।। আজ আমরা কীর্তনের মিছিল নিয়ে কাজীর বাড়ি যাব। দেখি কাজী কত সাহস ধরে। আমাদের এই বিশাল শক্তির কাছে সে তুচ্ছ। দরকার হলে, তার ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দেব। সবাই খেয়েদেয়ে বিকালের মধ্যেই চলে এস।'

নবদ্বীপের ঘরে ঘরে এ বার্তা রটে গেল, নিমাই স্বয়ং আজ নগরে নৃত্য করে বেড়াবে। এ সময়ের যা নিয়ম, সবাই দরজায় দরজায় পত্রে-পুষ্পে মঙ্গলঘট সাজাল। বিকালে হাজার মানুষ মশাল হাতে এল। সঙ্গে বড় বড় তেলের ভাণ্ড। মশাল জ্বালাবার জন্য।

অভিযানের শুরুতে নিমাই প্রথমেই, মিছিলের কে কোথায় থাকবেন, সে সব স্থির করল। সিমুলিয়া আসলে মুসলমানদেরই বাসস্থান। তারা নবদ্বীপে হিন্দুদের সঙ্গে থাকতে চায় না। সেই জন্যই চাঁদকাজী সিমুলিয়াবাসী। নিমাই নির্দেশ দিল, 'সকলের আগে নাচতে নাচতে যাবেন অদ্বৈত গোসাঁই। মাঝখানে থাকবেন হরিদাস। এঁদের সকলকে ঘিরে বিভিন্ন গোষ্ঠী সম্প্রদায় থাকবেন। আমি সকলের পিছনে আছি, প্রয়োজনে আমার স্থান পরিবর্তিত হবে। আমার সঙ্গে থাকবেন নিত্যানন্দ আর গদাধর।'

হাজার হাজার মশাল জ্বলে উঠল। বদ্ধ ঘরের কীর্তন, মিছিল করে, নগরে শোভাযাত্রা করে বেরিয়ে পড়ল এই প্রথম। নবদ্বীপের আকাশ মশালের আলোয় আলোময়। যেন মহোৎসব লেগেছে। আর পাষণ্ডীরা ব্যাপার দেখে মনে মনে জ্বলে পুড়ে মরতে লাগল। আবার এ আশাও করল, আজ নিমাইয়ের সর্বনাশ হবে।

নিমাই প্রথমে নির্দেশ করল, গঙ্গার ধার দিয়ে এগিয়ে চল। উদ্দেশ্য ছিল। নিমাই গঙ্গার ঘাটে প্রথমে নিজে মহানৃত্য দেখাল। সাহসযোগানোই উদ্দেশ্য। তার নিজের ঘাটে সে নৃত্য করল। তারপরে গেল মাধাইয়ের ঘাটে। সেই জগাই-মাধাইয়ের এক ঘাট তখন মাধাইয়ের ঘাট নামে প্রচারিত হয়েছে। অবশ্য আমরা জগাই-মাধাইকে এ মিছিলে দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু তারা নেই, এ কথা বোধ হয় বলা যায় না। মাধাইয়ের ঘাট থেকে বারকোনা ঘাট এবং নগরিয়া ঘাট— অর্থাৎ সর্বজাতির ঘাটে মিছিল গেল। এখানেই নবদ্বীপ নগরের শেষ, এবার সিমুলিয়া। মিছিল সিমুলিয়ায় প্রবেশ করল।

নিমাইয়ের নির্দেশমত মিছিল চাঁদকাজীর বাড়ির দিকে চলল। কাজী তখন নিশ্চয় অবসর-বিনোদনে, বিলাস-প্রমোদে মত্ত ছিল। দূরবর্তী বাজনা ও কীর্তন শুনে, লোক ডেকে বলল, 'এ সব কিসের বাজনা চিৎকার? বিয়ের বরযাত্রী যাচ্ছে না ভূতের কীর্তন হচ্ছে? এখানে এ সব হিঁদুয়ানি কে করছে? আমাকে তাড়াতাড়ি সংবাদ এনে দাও।'

কাজীর অনুচরেরা ছুটল। সব দেখে শুনে এসে খবর দিল, 'আমরা যে সব নগরিয়াদের মেরেছি, তারা আজ কাজীকে মার মার বলে ছুটে আসছে।'

কাজী হেসে বলল, 'আমি তো ভেবেছি নিমাই পণ্ডিত আবার বিয়ে করতে চলেছে কোথাও। আমার আদেশ লঙ্ঘন করে সে আসছে? তবে আজ সকলের জাত নষ্ট করব।'

মিছিল এসে দাঁড়াল কাজীর বাড়ির সামনে। এখন আর নিমাই সকলের পিছনে নয়। সকলের আগে। হুংকার দিয়ে বলল, 'কোথায় সেই চাঁদকাজী? ঝটিতি ধরে নিয়ে এস, ওর মাথা কাটব আমি।'

প্রবলের অত্যাচার মহাজন সংঘের নেতার হুংকারে নির্জীব। অত্যাচারীর চরিত্রের এটাই লক্ষণ। অন্তরে সে কাপুরুষ, রাজশক্তির জোরে তড়পায়। নিমাইয়ের হুংকার আর বিশাল মারমুখী জনতা দেখেই কাজী বাড়ির পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে গেল। বাড়ির বেগম, স্ত্রীলোকদের এবং সন্তানসন্ততির কথাও একবার ভাবল না।

নিমাই হুংকার দিল, 'কোথায় কাজী? বেরোয় না কেন? দরজা ভাঙ!'

মুহূর্তেই দরজা ভেঙে, কাজীর বাড়ি তছনছ শুরু হল। কেউ কেউ বাগানে গিয়ে, গাছপালা ধ্বংস করতে লাগল। যে সব পুরুষরা পালাতে পারেনি, তারা মাথা নীচু করে ভয়ে বসে রইল। তাদের উপর আক্রমণ করা হল না। নিমাই

চায় চাঁদকাজীকে। সমস্ত বহির্বাটি ধ্বংস হয়ে গেল। এবার অন্দর মহলের কী হবে ? সেখানে তো স্ত্রীলোকেরা আছে।

নিমাই বলল, 'কারুকে ছাড়াছাড়ি নেই। সমস্ত বাড়িতে আগুন লাগাও ! সবাই পুড়ে মরুক ! দেখি, কোন্ রাজা আমায় শাস্তি দেয়। কে কীর্তন বন্ধ করে। আগুন লাগাও, আগুন লাগাও।'

এবার নিত্যানন্দের আবার সেই করুণা প্রকাশ। বললেন, 'কাজীর শাস্তি যা দেবার দিয়েছ, এরপরে যদি সে অত্যাচার করে, তবে সকলের প্রাণ নিও। আজ ছেড়ে দাও।'

নিমাই নিত্যানন্দের কথা রাখল। সদলবলে সিমুলিয়া থেকে ফিরে এল। চৈতন্য-জীবনীকারেরা এই ঘটনার নানা ব্যাখ্যা করেছেন। তা দিয়ে আমাদের দরকার নেই। চাঁদকাজী পরে এসে নিমাইয়ের কাছে ক্ষমা চেয়েছিল, এটাও বাস্তব ঘটনা নয়। এ ঘটনা সম্ভবতঃ ১৫০৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে।

এগারো



১৫১০ খৃষ্টাব্দে নিমাইয়ের আবার ভাবাবেশ দেখা দিল। এই ভাবাবেশে নানা অবতার মূর্তি সে দেখাল। কখনও কৃষ্ণরূপে রাধাকে দেখাল, আবার কখনও রাধারূপে কৃষ্ণকে। এর মধ্যে একটি ঘটনা নিমাইয়ের ছেলেবেলার পড়ুয়া সঙ্গীদের অনেকের ভাল লাগল না। নিমাইয়ের কৃষ্ণভাব এলেই, সে গোপীদের সম্বোধন করে ডাকে।

এ অবস্থাতে একদিন এক ছেলেবেলার পড়ুয়া বন্ধু বলল, 'নিমাই, তুমি গোপী গোপী বল কেন ? কৃষ্ণকেই ডাক।'

নিমাই ভাবাবেশে রেগে গিয়ে বলল, 'কেন তাঁকে ডাকব। তিনি দস্যু, তাঁকে কে ভজে ? রাম হয়ে তিনি বিনা দোষে বালিকে বধ করেছেন, সূর্পণখার নাক কেটেছেন, বলিকে পাতালে পাঠিয়েছেন। তাঁর নাম নিয়ে কী হবে ?'

ওর পড়ুয়া বন্ধু এর প্রতিবাদ করল। নিমাই রেগে গিয়ে শুম্ভ হাতে নিয়ে তাকে মারবার জন্ম তাড়া করল। পড়ুয়া দৌড়ে পালাল। ভক্তরা নিমাইকে গিয়ে ধরে আনল। সে স্থির হল। কিন্তু বিপর্যয় যা ঘটবার ঘটে গেল। পড়ুয়াটি বাকি

সকল পড়ুয়াদের গিয়ে, সব কথা বলল। সবাই নিমাইয়ের ওপর রেগে উঠল। বলল, 'নিমাইকে কেন আমরা সম্ভ্রম করি? আমরা কি ব্রাহ্মণের তেজ ধরি না? সে মারতে আসবে, আমরা সইব? সে তো রাজা নয়। আমরাও তাকে মারব।'

এরা আসলে নিমাইয়ের ভক্ত নয়। তার অবতারত্বেও বিশ্বাস করে না। বিশেষ করে এরা নিমাইয়ের সমবয়সী। নিমাই ব্যাপারটা বুঝল। অন্তরে দুঃখিত হল। নিত্যানন্দকে ডেকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে বলল, 'অবতার হয়ে, সকলকে উদ্ধারের জন্য, জীবন সংহার পর্যন্ত করেছি। কিন্তু দেখছি, আমি সকলের মন জয় করতে পারিনি। এর একটাই এখন উপায় আছে। সন্ন্যাসীকে সকলেই নমস্কার করে, তাঁকে কেউ অপমান বা প্রহার করে না। আমি এবার সন্ন্যাসী হয়ে সকলের দরজায় দরজায় গিয়ে আমার কথা বলব। দেখি তখন কে মারে। তোমাকে বলছি, আমার আর সংসার-ধর্মে মন নেই। গৃহস্থ-ধর্ম ছাড়ব। তুমি আমাকে বিধি দাও। আমি জগৎ-উদ্ধারের কারণে সন্ন্যাস চাই।'

অনেক অনেক রকম কথা বললেও, বন্ধু সহপাঠীদের আচরণই তাকে বিচলিত করল, এটাই সত্য। অবশ্য এর সঙ্গে অন্য কারণও নিমাইয়ের মনের গভীরে ক্রিয়াশীল। লক্ষ্মীর মৃত্যু তার মন থেকে কখনও ঘোচেনি। লক্ষ্মীর প্রতি প্রেম বিরহ ও কৃষ্ণ-বিরহে রূপান্তরিত হয়ে, নানা লীলা করল। কিন্তু সংসার যে মিথ্যা, এ জ্ঞান তার মনে সাত বছর ধরেই স্থায়ী হয়ে আছে। গয়া থেকে ফেরবার পথেও সে আর বাড়ি না ফিরে আসার কথা বলেছিল। এবার পড়ুয়াদের আচরণে মন আরও সেইদিকে গেল।

এই প্রথম নিমাইয়ের সন্ন্যাসের কথা শোনা গেল। তার দাদা বিশ্বরূপ নিজের মোক্ষলাভের জন্য সন্ন্যাসী হয়েছিল। নিমাই প্রথমে অবতার। তারপরে সন্ন্যাসের কথা বলল। এ সন্ন্যাসও জীব-উদ্ধারের কারণেই। বন্ধুরা এখনও তার বিরুদ্ধাচরণ করছে।

আরও একটা কারণ, এ সময়েই কেশবভারতী নবদ্বীপে এলেন। মনের বিচলিত অবস্থায়, কেশবভারতীকে দেখেও তার মনে সন্ন্যাস গ্রহণের বিষয়টি আসতে পারে। নিমাই পড়ুয়াদের মারতে গেছল, কিন্তু পরে তা নিয়ে অনুশোচনাও করেছিল। মনের অনুতাপের জন্যও কেশবভারতীকে দেখে সন্ন্যাসের ইচ্ছা হয়েছিল।

নিমাই চব্বিশ বছর বয়সে সন্ন্যাস নেবার সংকল্প করছে। নিত্যানন্দ বললেন, 'তুমি "স্বতন্ত্র" স্বাধীন, তুমি যা করবে, তাই নিশ্চিত হবে। তুমি জগৎ উদ্ধার

করবে, সেটা তুমিই জান। আর কেউ জানে না! যা ভাল হয় কর। তবু তুমি সবাইকে কথাটা বল, সকলে কী বলে, তা শোন।'

নিত্যানন্দের পরামর্শটি সত্যই বাস্তবোচিত। সকলের সঙ্গে কথা বলে যা হয় স্থির করার পরামর্শ দিল। এটি হল, গণচেতনার কথা। নিমাই একলা সব সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। নিমাই প্রথমে মুকুন্দর কাছে গিয়ে সব বলল, 'শিখা সূত্র ছেড়ে সন্ন্যাস নেব।'

মুকুন্দ বোঝালেন। তারপরে বললেন, 'তবে এখনই নয়, কিছুদিন কীর্তন কর।'

তারপরে গদাধরের কাছে। গদাধরের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। অনেক তর্ক-বিতর্ক, তারপরে গদাধর বললেন, 'প্রথমেই জননী-বধের ভাগী হবে। তবুও যদি মাথা মুড়োতে চাও, করোগে।' এটা অভিমানের কথা।

যিনি শুনলেন, সকলেই প্রতিবাদ করলেন। নিমাই বলল, 'যদি জগৎ উদ্ধার চাও, আমার সন্ন্যাসে বাধা দিও না। লোকশিক্ষা নিমিত্তই আমার সন্ন্যাস। আমাকে তোমরা নিষেধ করো না।'

নিত্যানন্দকে বলল, 'পাঁচজনকেও এ সংবাদটি দিও। আমার মা, গদাধর, ব্রহ্মানন্দ, চন্দ্রশেখর আর মুকুন্দকে।'

কিন্তু অদ্বৈতকে বলতে বলল না। সেই 'রাজা গোসাঁই' গৃহস্থ কখনও সম্মতি দেবেন না। নিমাইয়ের এক কথা। লোকশিক্ষা, জগৎ উদ্ধার, ধর্মপ্রচার হেতু সন্ন্যাস। এ বেদবিরুদ্ধ নয়। সে তা যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করল। সন্ন্যাসীর মধ্যেই লোকে মহত্ত্ব দেখতে পায়, সেইজন্যই সন্ন্যাস নিতে হবে। অতএব, তাতেই জীব উদ্ধার হবে।

নিমাই কেশবভারতীকে বলল, 'তোমার মত বেশ কবে আমার হবে? তুমি আমাকে সন্ন্যাস দাও।'

কেশবভারতী সম্ভবতঃ সকলের মন বোঝবার চেষ্টা করছিলেন। গয়াতে ঈশ্বরপুরীর আবির্ভাবের মতই, কেশবভারতীও যেন যথাসময়েই নবদ্বীপে এসে উপস্থিত হলেন। অনেকে নিমাইয়ের কৃষ্ণপ্রেম পাগল অবস্থার জন্যই সন্ন্যাসের ব্যাখ্যা করেছে। কিন্তু আমি ঘটনার গতি দেখে আসছি অন্য রকম। এখানেও নেতৃত্বই আসল কথা। 'লোকশিক্ষা' চাই। নইলে পড়ুয়া বন্ধুরা এ রকম ভাবা বলবে কেন?

এ সংবাদ যখন শচীদেবী আর বিষ্ণুপ্রিয়ার কানে গেল, তখন কী অবস্থা হতে পারে, আমি সহজেই অনুমান করতে পারি। শচীমাতার সে মর্মভেদ কান্না

ভোলবার নয়। বললেন, 'ওরে নিমাই, মাকে ছেড়ে যাসনে। কী করে থাকব ? বিশ্বরূপের ঘা এখনও শুকায়নি, আবার তুই ? তুই কি সব কথা ভুলে গেলি ? বলেছিলি না, মা, দাদা সন্ন্যাস নিক, আমি তোমাদের সেবা করব, গৃহস্থ ধর্ম করব, সংসার বৃদ্ধি করব। তার ওপরে আমার এই বিষ্ণুপ্রিয়া অনাথিনী হবে ? প্রথম যৌবনের এই জলন্ত আগুনি ! কী করিস, কী বলিস তুই নিমাই ? বাবা রে, এভাবে ছেড়ে যাস নে। তোকে দেখেই যে সব ভুলে আছি।'

শচীদেবী বুক চাপড়ে কাঁদলেন। কিন্তু সবই তো নিরর্থক। আর বিষ্ণুপ্রিয়া ? সে কি করছে ?

বিষ্ণুপ্রিয়া একটি নতুন গামছা নিমাইয়ের পায়ে দিয়ে, পা ধরে বলল, 'তুমি যেখানেই যাও, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাও। আমি কী—কী নিয়ে থাকব বল ? আমার কী আছে ? রামের সঙ্গে সীতা বনে গেছলেন, যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে দ্রৌপদী।'

নিমাই বলল, 'রাম বা যুধিষ্ঠির সন্ন্যাস নেননি। সন্ন্যাসীর সঙ্গে স্ত্রী কেমন করে যাবে ? তুমি কী করে আমার সঙ্গে যাবে ?'

বিষ্ণুপ্রিয়া কেঁদে বলল, 'তবে সুখেঘরে থাক। তোমার ঘর কি সুখময় নয় ?'

'হ্যাঁ, সুখময়। কিন্তু আমার কাজ যে আলাদা। আমি যদি বৈরাগ্য না করব, কে করবে বল ? আমি যে যুগধর্ম পালন করতে এসেছি। প্রিয়া, তুমি বল, আমি সংসারে থাকলে, কী করে ধর্মপ্রচার করব ?'...

নিমাই আরও একটি আশ্চর্যের কথা বিষ্ণুপ্রিয়াকে বলল, 'তুমি এখানে না থাকলে সংকীর্তন বাদ হবে, সেটি এক প্রমাদ।'

এ কথার অর্থ কী ? বিষ্ণুপ্রিয়াও কি অবতার হচ্ছে ? নিমাই আবার সেই কথা বলল, 'সংসার অনিত্য প্রিয়া। কেউ কারু নয় গো। আমাকে বিদায় দাও তুমি।'

বিষ্ণুপ্রিয়া কেঁদে বলল, 'তোমার মায়ের অনুরোধে, আমার বাবার সত্য পালনের জন্ত, ভুলিয়ে কেন আমাকে বিয়ে করলে ? করলে যদি, কেন ছেড়ে যাও ? তবে বিষ দাও। নয় তো আমি আগুনে প্রবেশ করি।'

নিমাই বলল, 'এখন শোক করো না, আগে সন্ন্যাস নেওয়া স্থির হোক। এখনও সকলে একমত নয়। তাছাড়া কৃষ্ণ সকলের পতি, আর সবাই প্রকৃতি।'

বিষ্ণুপ্রিয়া কেঁদে বলল, 'তুমিই আমার কৃষ্ণ, আমার পতি, আমি তোমা বৈ জানি না।'

নিমাই বিষ্ণুপ্রিয়াকে চতুর্ভুজ মূর্তি দেখাল। বিষ্ণুপ্রিয়া তাতেও দমল না,

বলল, 'তথাপি তুমি আমার পতি, আমি তোমাকে ছাড়া কিছুই জানি না।'

সে হেঁট মুখে চোখের জলে ভাসতে লাগল। তখন নিমাই রাত্রে বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিয়ে শয্যায় গেল। নানা কৌতুক রসে অশেষ চুম্বন দান করল। শৃঙ্গার রসে সোহাগ করে, অনন্ত বিনোদ ক্রীড়া করল। তাকে ডেকে ডেকে কোলে বসাল। নিজে বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখে পানের খিলি তুলে দিল। বস্ত্র কাঁচুলি খুলে, স্তনে কস্তুরি চন্দন দিল লেপে। তারপরে রতিবিলাস।

বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিছানা স্পর্শ করতে দিল না, বুকে করে রাখল। এ ওর বুকে, ও এর বুকে, মুখে মুখ। পাশ ফিরতেও দুজনের মধ্যে অঙ্গের ছাড়াছাড়ি হয় না। তারপর রস অবসাদে দুজনে নিদ্রা গেল। রাত্রি শেষে নিমাই ঘরের বাইরে চলে এল নিঃশব্দে। মা দাঁড়িয়ে আছেন বাইরে। শেষ বিদায়ের পালা। মাকে সে অনেক কথা বলল। মায়ের হাত ধরে বসল। তারপরে প্রণাম করে গৃহত্যাগ করল। শচীদেবী জড়ের মত নির্বাক হয়ে বসে রইলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া তখন গভীর আবেশে নিদ্রা যাচ্ছে।

নিমাই ঊষাকালে স্নান করে, সকলের ঘরে ঘরে গিয়ে, প্রধানদের প্রণাম করল। কুলবধূরাও নিমাই রূপে মোহিত। তারাও কান্না জুড়ে দিল। কেবল পাষণ্ডীরা হাস্য করল। বিষ্ণুপ্রিয়া যে নতুন গামছাখানি নিমাইয়ের পায়ে দিয়েছিল, সেটি সে নিত্যানন্দকে স্তুতি করে দান করল। সে গামছা নিত্যানন্দ গঙ্গাকে দিলেন। অদ্বৈতকে জানানো হল না। কিন্তু তিনি শান্তিপুরে থেকে সবই শুনেছেন। তাঁর একটিই কথা, 'ঈশ্বরে বৈরাগ্য কেন করে ?'

সন্ন্যাসের কথা শোনামাত্রই হরিদাসের সমাধি লাগল। শচীদেবী নিমাইয়ের ঘরে খাট, কৃষ্ণকলি, বসন, সোনার মাদুলি, ডাবর, বাটাবাটি সব দেখে মনে মনে পুড়ে মরতে লাগলেন। বললেন, 'কেশবভারতী এ কি করলেন ?'

বিষ্ণুপ্রিয়া ঘুম থেকে উঠে আর্তনাদ করে উঠল, 'প্রাণনাথ, আমাকে ছেড়ে কোথায় গেলে ? আমার সংসার, জীবন, সবই যে অন্ধকার হয়ে গেল !'

সে কপালে করাঘাত করতে লাগল। বিষ খেয়ে মরতে চাইল। বারে বারে বলল, 'তোমার পৈতা আমাকে দিয়ে গেলে? কিন্তু আমি যে তোমার সেই রূপটিই দেখতে চাই। তোমার সেই চাঁচর কেশ, মদনমোহন মূর্তি। আমি শুনতে চাই তোমার ভাগবত পাঠ। আর—আর এ কি শেল দিয়ে গেলে নারীর প্রাণে, একটি সন্তানও আমার শূন্য বুকে নেই !...'

এ আর্তনাদটিই মর্মান্তিক। বুদ্ধদেব গৃহত্যাগ করলেও গোপার বুকে ছিল

সন্তান রাহুল। নিমাইয়ের তাও রইল না। প্রিয়া হিসাবে কান্নার থেকে এ কান্না আরও করুণ।

নিমাই কেশবভারতীর সঙ্গে গঙ্গার ওপারে কাটোয়া গেল। সঙ্গে চন্দ্রশেখরাচার্য। দিনের শেষ, আকাশ তখন রক্তিম। নিমাইয়ের ক্ষৌরকর্ম শেষ হল। শ্রীশিখার অন্তর্ধান হল। মন্ত্র গ্রহণের পরে, হাতে নিল দণ্ড কমণ্ডলু। অথচ নিত্যানন্দ এই নিমাইয়ের অবতারত্ব দর্শনে দণ্ড কমণ্ডলু ভেঙে ফেলেছিলেন। নিমাইয়ের আজ থেকে নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এখানে, বেদান্তের সার বক্তৃতা দিলেন, 'এ সকল যা কিছু দেখছ, সবই মিথ্যা। প্রকৃতির ছায়া মাত্র, বেদে তাই বলে।' লক্ষ্মীর মৃত্যুর সংবাদ শোনার পরে যা বলেছিলেন, তারই প্রতিধ্বনি যেন। 'এই মত কাল গতি কেহ কার নহে।'

এর পরে চৈতন্যদেব তিনদিন রাঢ় দেশ ভ্রমণ করে, প্রথমে হরিদাসের কাছে ফুলিয়া গেলেন। সেখান থেকে শান্তিপুরে। শচীমাও শান্তিপুরে ছেলেকে দেখতে এসেছিলেন। শেষ দেখা। মাকে বললেন, 'তোমার শরীর আমার শরীর এক ; তোমারই গর্ভে জন্ম, তোমার ঋণ শোধ করতে পারব না। মনে রেখ, আমি সর্বদাই তোমার কাছে আছি।'

ভক্তদের বললেন, 'আমি সহসা সন্ন্যাস নিলেও, আমি তোমাদের প্রতি উদাসীন নই। তোমাদের আমি জীবিতকাল পর্যন্ত ছাড়ব না।'

অদ্বৈত গোপনে শচীদেবীকে বললেন, 'নিমাইকে নীলাচলে গিয়ে থাকতে বল। কারণ এই দুই স্থানের সঙ্গে সর্বদাই যোগাযোগ থাকবে। সব সময় বার্তা পাঠানো যাবে।' শচীদেবী তাই বললেন। চৈতন্য বললেন, 'তাই হবে।'

১৫১০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে মাঘ সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য গৃহত্যাগ, কাটোয়া যাত্রা। ২৯শে মাঘ সংক্রান্তির দিন সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। ফাল্গুনের প্রথম তিনদিন রাঢ় দেশে ঘুরে বেড়ালেন। শচীদেবী তার মধ্যে দ্বাদশ দিন উপোস করে শান্তিপুরে এলেন। শেষ সাক্ষাৎ। ৯ই ফাল্গুনের আগে দ্বাদশ দিবস শেষ হতে পারে না। তা হলে হিসাব মত, ১১ই ফাল্গুন শ্রীচৈতন্য নীলাচলে রওনা হলেন।

এ পর্যন্ত যে নিমাইকে আমি দেখলাম, তাঁকে যতই অপ্রাকৃতের রূপ দেবার চেষ্টা করা হোক, আসলে সবই প্রাকৃত লীলা। অনেকেই তাঁর সংহার মূর্তিটিই

চেয়েছিলেন। হাতে তাঁর তলোয়ার না থাকলেও তার চেয়ে অধিক শক্তিশালী মন্ত্র ছিল। সম্ভবতঃ আজকের মানুষ, সংগ্রামী মানুষ তাঁর সিমুলিয়া থেকে সেই রাত্রে গৌড়াভিযানও কল্পনা করতে পারেন। তা হলে ষোড়শ শতাব্দীর গোড়া থেকেই এ দেশের ইতিহাস অন্য পথে প্রবাহিত হত।

তা হল না। নিমাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হলেন। সন্ন্যাস নিয়ে নীলাচলে গেলেন। তারপরেও সারা ভারতের অনেক জায়গায় গেছেন। কিন্তু সারা ভারতবর্ষ আজও সেই চাঁদকাজীর গৃহ-আক্রমণকারী মুক্তিদাতার পথ চেয়েই যেন বসে আছে।

ভারতের ইতিহাসও কি তাই নেই? পরবর্তী লীলা ভারতবর্ষের এক নতুন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেছে। কিন্তু অত্যাচারী রাজার বিরুদ্ধে, পাষণ্ডীর মত ষড়যন্ত্রকারী নীচদের বিরুদ্ধে, সিংহের ন্যায় সেই সংহারক মূর্তিকে আর আমরা পেলাম না।

যিনি নিত্য প্রেম সেধেছিলেন, এই অনিত্য সংসারে তাঁর সেই রূপেরই আবার আবির্ভাব হোক। সাধারণ মানুষ আজ, এই কলঙ্কিত, মিথ্যাচার, ভীরুতার যুগে, তাই প্রার্থনা করবে।

তবুও পরবর্তী লীলা দর্শনের জন্য, ইতিহাসের পথ ধরে আমাকে যেতে হবে নীলাচলে। যেতে হবে নবীন সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পদচিহ্ন ধরে। আর এখন থেকে নিমাইকে আমি 'আপনি' সম্বোধন করবো। নীলাচলে নিমাই চরিত্রের অন্ত মহিমা প্রকাশ পেয়েছে। আজ তাঁকে শেষ বিদায়ের বেলা দেখছি, 'ছেঁড়া কাঁথা, মুড়ো মাথা, করঙ্গ লইয়া হাতে।'...আর বিষ্ণুপ্রিয়ার কান্না: 'সেই চাঁচর কেশের কী করলে গোসাঁই? আর তো দেখা নেই। সোনার অঙ্গে রাঙা বসন যেন সিঁদুরের সুমেরু শিখরে। তোমাকে কি আর দেখতে পাব না?'...শেষ কথা কিন্তু লক্ষ্মীর মৃত্যু। সেই যে মনে প্রথম আঘাত, পরবর্তী কালে সেই আঘাতই নিমাইকে শ্রীচৈতন্য করেছে। তখনই উচ্চারিত হয়েছিল, 'সংসার অনিত্য মা...এই মত কাল গতি, কেহ কার নহে।'...

সংসারের এই রূপটিই আমার মনে গভীর ও ব্যাকুল, জীবনপথের নানা প্রশ্নে আমাকে ঘরের বাইরে আহ্বান করছে।

প্রভু
কার হাতে তোমার রক্ত



এক



আমি মানুষ। আমি জীবনমাত্রকেই মায়াবদ্ধ ভাবতে পারি না। কিন্তু আমি আমার এই জীবনে দেখে এলাম, মায়া ছাড়িয়ে আর কোথায় শেষ পর্যন্ত যাত্রা আছে। মানুষের জীবন কত লক্ষ বছর আগে শুরু হয়েছিল? পণ্ডিতবর্গ ফসিল দেখে,বৈজ্ঞানিক বিচার করে অনুসন্ধান করে দেখেছেন, লক্ষ লক্ষ বছর আগে মানুষ কেমন ছিল। আজ কেমন হয়েছে। ভবিষ্যতের কথাও ভাবতে হবে। কিন্তু এও যে ইতিহাসের ধারা, মানুষ তা পিছনে রেখে চলেছে, তাতে এই গ্রহের কোথায় কী এলো গেল, আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না।

এবার নীলাচলে যাবার আগে একবার কাটোয়ায় যাই। এর আগে, নিমাইয়ের জীবন দেখতে গিয়ে, কাটোয়ায় তাঁকে ছেড়ে এসেছিলাম। নিমাইয়ের সন্ন্যাস গ্রহণেই, সেই অধ্যায়ের শেষ হয়েছিল। ভেবেছিলাম, আর নিমাইয়ের কাছে যাবো না। কিন্তু ভেবে দেখলাম, যার শৈশব নিয়ে শুরু করেছিলাম, তার অন্তঃলীলা আর বাকি থাকে কেন?

নিমাইয়ের সন্ন্যাসের আগে,তার অভিষেকের দিনটি আমার বিশেষ ভাবে মনে আছে। এখানে একটা দিনাঙ্কের হিসাব দিয়ে রাখি। নিত্যানন্দের আগমন ঘটেছিল ১৫০৯ খৃষ্টাব্দের জুন-জুলাই নাগাদ। নিমাইয়ের অভিষেক তার পরে। অর্থাৎ আগস্টের মাঝামাঝি। তখনও নারায়ণীর পুত্র বৃন্দাবনদাসের জন্ম হয়নি। নিত্যানন্দের ব্যাস-পূজার পরেই নিমাইয়ের অভিষেক। এই অভিষেকের দিন নিমাই নারায়ণীকে ভোজনের অবশেষ দিয়েছিলেন। কেন দিয়েছিলেন, আমি এ প্রশ্নে যাবো না। কিন্তু এটাও ঠিক নয় এ ভোজনাবশেষ খেয়েই নারায়ণী গর্ভবতী হয়েছিলেন। সে সব কথাও আমার আলোচ্য না। বৃন্দাবন জন্মের পরে, বড় হয়ে নিজেই লিখেছেন, 'গৌরাঙ্গের অবশেষ পাত্র নারায়ণী।' বৃন্দাবনদাস যা কিছুই চৈতন্য-ভাগবতে লিখেছেন, সবই নিত্যানন্দ এবং তাঁর মায়ের মুখ থেকে শুনে লিখেছিলেন। তাঁর নিজেরই দুঃখের কথা হলো,প্রভু যখন নীলাচলে গেলেন,তখন আমি তাঁকে চোখে দেখিনি। জন্মেছেন কিনা, সেটা সঠিক বলা যাচ্ছে না।

কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন,

'নারায়ণী চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট ভোজন।
তাঁর গর্ভে জন্মিল শ্রীদাস বৃন্দাবন॥'

এই শ্রীদাস বৃন্দাবনের চৈতন্য ভাগবত থেকে কবিরাজ গোস্বামী অনেক কিছু সংগ্রহ করেছেন। তবে সবই নবদ্বীপ-লীলা। কারণ, বৃন্দাবনদাস চৈতন্যের সঙ্গে নীলাচলে থাকেননি। পরবর্তী জীবনের কথা ঠিকমতো লিখতে পারেননি। বরং কবিরাজ গোস্বামী বৃন্দাবনে রূপ ও সনাতনের মুখ থেকে শুনে নিমাইয়ের নীলাচল ও বৃন্দাবন ভ্রমণের অনেক কথা যথার্থ লিখেছেন। আবার নবদ্বীপ-লীলার কথা বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য-ভাগবতের সাহায্য নিয়ে লিখেছেন।

যাই হোক, জীবনীকারদের ইতিহাস লেখা বা দেখা আমার কাজ না। ইতিহাসের পথেই আমার চৈতন্যের লীলা সন্ধান। তবে, এই ইতিহাসের যাঁরা ঐতিহাসিক, তাঁদের একেবারে ত্যাগ করতেও পারি না। আমি দেখছি, নিমাই সন্ন্যাস নিয়েছেন। কাটোয়ায় আমি সেই মর্মন্তুদ দৃশ্য দেখেছি। পিতার পিণ্ড দিতে গিয়ে গয়াতেই সন্ন্যাসের বীজ সন্ন্যাসের কারণ নিমাইয়ের মনে অঙ্কুরোদ্গম করেছিল। কিন্তু সত্যি কি তাই? সাত বছর আগে, লক্ষ্মীর সর্প-দংশনে মৃত্যুর খবর আচমকা শুনে তখনই নিমাইয়ের মনে যে আঘাত লেগেছিল, সেই বিরহই সন্ন্যাসের বীজ অঙ্কুরিত করেছিল। নিমাই মাকে বলেছিল, 'এই মতে কাল গতি, কেহ কার নহে। অতএব সংসার অনিত্য বেদে কহে।'

তবে আবার বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিয়ে কেন? বিষ্ণুপ্রিয়া নিজেই সে কথার জবাব দিয়েছেন, 'মায়ের অনুরোধে, সত্য রাখার পালিবারে—আমা বিভা কৈলে লোক ভণ্ডিবার তরে।' নিমাই বিষ্ণুপ্রিয়াকেও বলেছিলেন,'শুন সতী বিষ্ণুপ্রিয়া, সব মিথ্যা কেহ কারো নহে।' সংসার যে মিথ্যা, লক্ষ্মীর মৃত্যুর পর সাত বছর ধরেই নিমাই-য়ের মনে এই কথা তোলপাড় করছিল। কিন্তু অবচেতনে হোক অথবা গোপনে।

বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতি বাস্তবে দেখা যাচ্ছে নিমাই কোনদিনই তেমন খুশি হতে পারেননি। অথচ বেচারি বিষ্ণুপ্রিয়া, তার কোন দোষ ছিল না। তবু কবিরা কবিতা লেখেন। এটা কতখানি সত্য, সেটা বিচার্য। সন্ন্যাসের জন্য, বিদায়ের আগের দিন রাত্রে, বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে মদনে মুগ্ধ হয়ে রতিবিলাস করছে:

হৃদয় ওপরে থোয় না ছুঁয়ায় শয্যা
পাশ পালটিতে নারে দোঁহে এক মজ্জা।
বুকে বুকে মুখে মুখে রজনী গোঙায়
রস অবসাদে দোঁহে সুখে নিদ্রা যায়।

রজনীর শেষে প্রভু উঠিয়া সত্বর
বিষ্ণুপ্রিয়া নিদ্রা যায় অতি ঘোরতর।

নিমাই মাকেও সন্ন্যাসের আগে অনেক কথা বলেছিল। 'মা তুমি আমাকে বিস্তর পালন করেছ। লেখাপড়া যা শিখেছি, সবই তোমার কারণ। তোমার স্নেহ কোটি জন্মেও শোধ করবার নয়। ব্যবহার পরমাণ যতো তোমার, সব ভারই আমার। এই বুকে হাত দিয়ে বলছি, তোমার সব ভার আমার।'

কথাগুলো কিন্তু মিথ্যা স্তোক ছিল না। সন্ন্যাস গ্রহণের পর, নিমাই মায়ের সংবাদ সব সময় রেখেছেন। সব সময় মাকে খবর দিয়েছেন।

কিন্তু একটা বিষয়ে আমাদের লক্ষ রাখা উচিত। শচীমাতা নিমাইকে নিজেই নীলাচলে যেতে বললেন। সন্ন্যাস নিয়ে তুমি যখন ঘরে থাকবেই না, তখন তুমি নীলাচলে যাও। তাতে দুটি কার্য হয়। নীলাচলে লোক-গতি থাকে সব সময়। আমি তোমার খবর পাবো। তুমিও গঙ্গা স্নান করবার জন্য ইচ্ছা হলেই আসতে পারবে।

কিন্তু তাই ঠিক কি ? শচীদেবী জানতেন, একদা উড়িষ্যার এই মিশ্র পরিবার উড়িষ্যার জাজপুর থেকেই শ্রীহট্টে গিয়েছিল। তখন উড়িষ্যার রাজা কপিলেন্দ্র— যাঁর উপাধি ছিল 'ভ্রমর'। তাঁর ভয়ে মিশ্র পরিবার উড়িষ্যা ত্যাগ করে পূর্ববঙ্গে চলে গিয়েছিলেন। কারণটা বলা হয়নি। আমিও সঠিক সন্ধান পাচ্ছি না। তবে 'ভয়' ছিল, এটা বলা হয়েছে। কপিলেন্দ্র কি কোনো কারণে বৈষ্ণব বিদ্বেষী ছিলেন ? এটা অনুমান মাত্র। আসল কারণের ব্যাখ্যায় ইতিহাস নীরব।

১৫১০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে মাঘ নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য রাত্রিশেষে গৃহত্যাগ করেছিলেন। আর ১২ই ফাল্গুন শান্তিপুর ত্যাগ করেন। এর মাঝখানে তিন দিন রাঢ় ভ্রমণ করেছিলেন। শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যের গৃহে বাকি দিনগুলো থাকলেন। এই অবসরে নিত্যানন্দ নবদ্বীপ থেকে শচীমাতাকে শেষ দর্শনের জন্য নিয়ে এলেন। তার মধ্যে শচীদেবীর দ্বাদশ উপবাস দিন কেটেছে।

বিষ্ণুপ্রিয়ার বিলাপ :

'সে হেন চাঁচর কেশে কি কৈলে সোমাঞি
কোথা আছ প্রাণনাথ আর দেখা নাই।
তোমার অঙ্গে রাঙা বসন কেমন শোভা করে
সিন্দুরিয়া মেঘে যেন সুমেরু শিখরে।
আর না দেখিব তোমার সরু পৈতা কান্ধে
আর না দেখিব তোমার কেশের তেন ছান্দে।'

চাচর কেশ, তেনের ছান্দে, আমি পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথেরও দেখেছি। সেটা হয়তো তৈরি হতো সাহেব নরসুন্দরের হাতে। কিন্তু দেশী নরসুন্দরও চাচর কেশ তেনের ছান্দে তৈরি করতে জানতো। এখন সে সব গিয়ে শিখা সূত্র ত্যাগ করে, নিমাই হলেন 'ছেঁড়া কাঁথা, মুড়া মাথা, করঙ্গ লইয়া হাতে।'

কিন্তু ভক্তরা নিমাইকে এ সময়ে নীলাচলে যেতে বারণ করলো। কেননা, তখন উড়িষ্যা আর বাংলার মধ্যে যুদ্ধের উপক্রম হয়েছে। দুই রাজ্যে লোক যাতায়াত নিষেধ হয়েছে। তখন গৌড়ে রাজা হোসেন শাহ। আর উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র।

উড়িষ্যা আর বাংলার দুই রাজ্যের সীমানা ছত্রভোগ। বর্তমান ডায়মণ্ড হারবারের কাছে। এখন থেকে নিমাইকে শ্রীচৈতন্য বলে উল্লেখ করবো, এ কথা আগেই বলেছি। শ্রীচৈতন্য তখন ছত্রভোগে উপস্থিত। কেমন করে বাংলা দেশ সীমান্ত পার হবেন। সংকট সেইটাই।

হোসেন শাহকে নিয়ে বাংলায় অনেক কথা আছে। তিনি কী ভাবে রাজা হয়েছিলেন, সেটা একবার আমরা ঝেলে নিতে পারি। তাঁর রাজত্বের আগে, গৌড়ে হাবশীদের শাসন চলেছিল অনেককাল। আর এই হাবশীরা ছিল পরস্পরের প্রতি সন্দিহান। হোসেন শাহকে অনেকে বাঙালী বলে চালাতে চেয়েছেন। হয়তো সেটাই ঠিক। তবে তাঁর তিন কি চার পুরুষ পূর্ববর্তীরা এসেছিলেন আরও আগে, ভারতের বাইরে থেকে। এঁরা ছিলেন সৈয়দ বংশ।

হোসেন শাহর পিতার নাম ছিল সৈয়দ আশরফ অলহোসেনী। রিয়াজউস-সুলতান ইতিহাস গ্রন্থ বলছে, হোসেন শাহ তাঁর পিতা আশরফ অলহোসেনী, তাঁর ভ্রাতা য়ুসুফের সঙ্গে সুদূর তুর্কিস্থানের তারযুজ শহর থেকে এসেছিলেন। এসে বাংলা দেশের রাঢ়ে চাঁদপুরা মৌজায় বসতি স্থাপন করেন। সেখানকার কাজী তাঁদের দুই ভাইকে শিক্ষা দেন। আর উচ্চ বংশমর্যাদার কথা ভেবে তাঁর সঙ্গে নিজের কন্যার বিয়ে দেন।

এখানে অনেক কিংবদন্তী আছে। বিশেষ করে রাঢ়ের এই চাঁদপুরা গ্রামকে নিয়ে। বলা হচ্ছে, ভবিষ্যতের সুলতান, চাঁদপুরার এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে রাখালের কাজ করতো। অবশ্য তখন সে বালক। বাংলার সুলতান হয়ে তিনি নাকি সেই ব্রাহ্মণকে মাত্র এক আনা খাজনায় গ্রামখানি ভোগ করতে দেন। তার ফলে গ্রামটি আজও একানী-চাঁদপাড়া নামে খ্যাত। কিন্তু কিছুদিন পরে সুলতানের বেগম সেই ব্রাহ্মণের জাতিনাশ করতে পরামর্শ দেন। তার ফলে ব্রাহ্মণকে গরুর মাংস খেয়ে জাত খোয়াতে হয়।

আসলে এটি উদোর বোঝা বুদোর ঘাড়ে এসে পড়েছে। সেই ব্রাহ্মণকে হোসেন শাহ মোটেই জাত নষ্ট করেননি। আসল ঘটনা হল, সুলতান হবার অনেক আগে, সৈয়দ হোসেন গৌড় অধিকারী (বাংলার রাজধানী গৌড়ের শাসনকর্তা অর্থাৎ ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট) সুবুদ্ধি রায়ের অধীনে চাকরি করতেন। সুবুদ্ধি রায় তাঁকে একটি দীঘি কাটানোর কাজে নিয়োগ করেন। এবং তাঁর কাজে ত্রুটি হওয়ায়, তাঁকে চাবুক মারেন। পরে সৈয়দ হোসেন সুলতান হয়ে সুবুদ্ধি রায়ের পদমর্যাদা অনেক বাড়িয়ে দেন। কিন্তু তাঁর বেগম একদিন পিঠে চাবুকের দাগ দেখে, জানতে চান, সেই চাবুক তাঁকে কে মেরেছিলেন। হোসেন শাহ বেগমকে সত্যি কথাই বলেছিলেন। বেগম শোনামাত্র সুবুদ্ধি রায়ের প্রাণ বধ করতে বলেন। সুলতান তাতে রাজী না হওয়ায়, বেগম সুবুদ্ধি রায়ের জাতি নষ্ট করতে বলেন। হোসেন শাহ তাতেও আপত্তি জানান। কিন্তু বেগমের নির্বন্ধাতিশয্যে অবশেষে তিনি সুবুদ্ধি রায়ের মুখে তাঁর কাপরার অর্থাৎ বদনার জল দেওয়ান। এই ভাবেই সুবুদ্ধি রায়ের জাতিনাশ করা হয়েছিল। কিন্তু চাঁদপাড়ার ব্রাহ্মণের তিনি উপকারই করেছিলেন।

হোসেন শাহ তুর্কীস্থান থেকে এসেছিলেন, এটা আমার বিশ্বাস হয় না। তাঁর গাত্রবর্ণ ছিল কালো। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি আসলে বাংলার গ্রামেরই লোক ছিলেন। ফ্রান্সিস বুকানন সাহেব লিখেছেন, রঙপুরের বোদা বিভাগের দেবনগর নামে গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। রামপ্রাণ গুপ্ত লিখেছেন, হোসেনের মা হিন্দু ছিলেন, এরূপ জনপ্রবাদও বিরল নয়। আরও অনেকে এমন সব কথা লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন, তাতে সন্দেহের অবকাশ আছে, তিনি ছিলেন একজন বাঙালী মুসলমান, তাঁর কালো গাত্রবর্ণ, আর মাথার ওপর ময়ূর পুচ্ছের পাখা ধরতেই, তাঁর চিকিৎসক মুকুন্দ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে দেখে ভাবে বিভোর হযে গিয়েছিলেন।

কী করে তিনি রাজা হলেন ? তাঁর আগের সুলতান হাবশী মোজাফ্ফর শাহের উজীর হতে পেরেছিলেন। এই মোজাফ্ফর শাহ ছিল অত্যন্ত লোভী আর ঘৃণিত পুরুষ। হোসেন শাহ মোজাফ্ফর শাহের চরিত্র বেশ ভালো বুঝেছিলেন। সেই জন্যই তিনি তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, সৈন্যদের বেতন কমিয়ে রাজকোষে অর্থ সঞ্চয় করতে। এই ভাবেই হোসেন শাহ সুলতান মোজাফ্ফর শাহের আস্থা ও সন্তোষ উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কারণ, অর্থলোভা সুলতান রাজস্ব সংগ্রহের জন্য প্রজাদের ওপর ঘোরতর অত্যাচার করতেন। বুদ্ধিমান হোসেন তা সমর্থন করতেন, কেবলমাত্র দেখাতে, সুলতান কী রকম অত্যাচারী। সুলতান

যতোই অত্যাচারী হবে, প্রজার মনে ততোই বিরাগ জন্মাবে, ঘৃণা জন্মাবে। হোসেন এই কাজটি খুব বুদ্ধির সঙ্গে করেছিলেন। তাঁকে বলা যায় কুশাগ্রবুদ্ধি ব্যক্তি। সেই তুলনায় সুলতান মোজাফ্‌ফরের বুদ্ধিও ছিল কম।

অবিশ্যি হোসেন শাহ একলা এ কাজ করেননি। তাঁর সমর্থক ছিলেন অনেক অমাত্যগণ এবং বাইরের থেকে মদত যোগাতেন অনেকে। এটা সর্বকালের সর্ব-দেশের ইতিহাসেই ঘটে, যিনি জবরদখল করে সিংহাসন ভোগ করেন, তিনি কূটচক্রী, রাজার বিরুদ্ধে কলঙ্ক রটান, আর তাই ইতিহাসে স্থান পায়। এই সুযোগও হোসেন শাহকে ইতিহাসই এনে দিয়েছিল। তিনি মোজাফ্‌ফরকে একরকম পরামর্শ দিতেন। কিন্তু লোককে বলতেন, 'সুলতান অত্যন্ত নিষ্ঠুর, তাঁর ব্যবহার কর্কশ। যদিও আমি তাঁকে সৈন্য ও অমাত্যদের সুখসাধন বিধান করতে পরামর্শ দিই, আর মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ করি, তাতে কোনো ফল হয় না। তাঁর ঝোঁক খালি অর্থসংগ্রহের দিকে।'...একে বলে রাজনীতির কূট চাল। অবশ্য এ কাজটি একদিক থেকে 'শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ' নীতির অনুসরণ বলে, রাজনীতির ক্ষেত্রে ক্ষমার্হ। তবে অনেকে যেমন বলেন হোসেন হিন্দুদের প্রতি অত্যাচারী হলে, একজন হিন্দু কবি তাঁর সম্পর্কে এরকম প্রশস্তি গাইতো না। বলা হয়, আশপাশের সমস্ত রাজাকে বশীভূত করে, এবং উড়িষ্যা পর্যন্ত জয় করে, তিনি কর আদায় করেছিলেন। এসব কথা অত্যুক্তি। তিনি আসামের কিয়দংশ কিছুকালের জন্য জয় করলেও, উড়িষ্যা কখনও জয় করতে পারেননি। যদিও তাঁকে উপাধি দেওয়া হয়েছিল বা নিজেই নিয়েছিলেন, 'অলফতেহ, অল-কামরু ওঅ জানতে ওঅ জাজনগর ওঅ ওরিসে'।

চার মাস লড়াই হয়েছিল। এক লক্ষ কুড়ি হাজার লোক নিহত হয়েছিল। একেবারেই গল্প। বরং হোসেন শাহ মুজাফ্‌ফর শাহর পথই নিয়েছিলেন। তবে অনেকটা প্রকাশ্যেই। তিনি মুজাফ্‌ফর শাহকে হত্যা করেছিলেন। যুদ্ধবিগ্রহ কিছুই হয়নি। হয়ে থাকলে দু-চারজনের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ ছিল। মুজাফ্‌ফর শাহকে হত্যা করার পরে, প্রধান অমাত্যেরা একটি পরিষৎ রচনা করে, হোসেন শাহকে রাজা বলে ঘোষণা করেছিলেন। হোসেন শাহ নিজেকে নিজে রাজা বলে ঘোষণা করেননি। এটাও তাঁর দূরদৃষ্টির পরিচায়ক। সময়টা ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দের জুলাই নাগাদ ঘটেছিল।

মুজাফ্‌ফর শাহের জীবিতকালেই হোসেন শাহ শাসন-দক্ষতায় নাম করে-ছিলেন। লোকপ্রিয়ও হয়েছিলেন। বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলের দিকে একবার তাকালেই, সেই ঐতিহাসিক সন্ধান পেতে পারি। বিজয়গুপ্ত লিখেছিলেন :

সুলতান হোসেন শাহ নৃপতি তিলক
সংগ্রামে অর্জুন রাজা প্রভাতের রবি।
নিজ বাহুবলে রাজা শাসিল পৃথিবী ॥
রাজার পালনে প্রজা সুখে ভুঞ্জে নিত
মুল্লুক ফতেয়াবাদ বাঙ্‌রোড়া ওজসিম
পশ্চিমে ঘাঘর নদী পুবে খণ্ডেশ্বর (ঘণ্টেশ্বর)
মধ্য ফুলশ্রী গ্রাম পণ্ডিত নগর।

এরকম অনেক হিন্দু কবি আর পণ্ডিতরাই হোসেন শাহের প্রশস্তি গেয়েছেন। অথচ দেখতে পাচ্ছি, পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলোও নাকি জয় করেছিলেন। তাঁর নিজের মুদ্রায় পাওয়া গিয়েছে, এইরকম উপাধি ; 'অল ফতেহ্ অল কামরু ওঅ কামতে ওঅ জাজনগর ওঅ ওরিসে'। অর্থাৎ কামরু কামতা জাজনগর উড়িষ্যা বিজয়ী উপাধিযুক্ত হয়েছেন। কিন্তু কথাগুলো একটু অতিরঞ্জিত। উড়িষ্যা আর আসাম দখলের জন্য হোসেন শাহ অনেকবারই চেষ্টা করেছেন। কিন্তু পূর্ণ সার্থক কখনও হতে পারেননি। তিনি সিংহাসনে বসেই, এ যুদ্ধের পরিকল্পনা করেছিলেন। সেটাই স্বাভাবিক। পার্শ্ববর্তী রাজ্য মানেই শত্রুরাজ্য। প্রথমতঃ উভয় রাজ্যই হিন্দুর অন্য এক দেশ ত্রিপুরাও হিন্দুর সঙ্গেই। এখন অসমীয়ারা আধুনিক রাজনীতিতে আসাম ত্রিপুরাকে নানা ভাবে চিহ্নিত করতে চাইছেন। কেউ কেউ ভারতের অধীনতাও অস্বীকার করতে চাইছে। কিন্তু পাঁচশ বছরেরও আগে ব্যাপার ছিল অন্যরকম।

হোসেন শাহ উড়িষ্যা আক্রমণ ও জয় করার চেষ্টা অনেককাল থেকেই করে যাচ্ছিলেন। সেই ১৪৯৪ থেকে ১৫১২, অর্থাৎ আঠারো বছর ধরে উড়িষ্যাকে স্থির থাকতে দেননি। আমার খেয়াল আছে তো, সন্ন্যাসী নিমাইকে সপারিষদ ছত্র-ভোগের পথে রেখে এসেছি। সময়টা ১৫১০ খৃষ্টাব্দের ফাল্গুন মাস। তখন বাংলা আর উড়িষ্যার মধ্যে যুদ্ধ চলছিল। ছত্রভোগই ছিল দুই রাজ্যের সীমানা। আর সীমান্ত রক্ষায়, হোসেন শাহের হয়ে উপস্থিত ছিলেন রামচন্দ্র খান। বৃন্দাবনদাস এখানকার বর্ণনাটি দিয়েছেন নিখুঁত ঐতিহাসিকের মতো। রামচন্দ্র খান এসে নিমাইকে বললেন, 'প্রভু, এখন বিষম বিপদের সময়। সেদেশ এদেশের লোক কেউ এখানে চলছে না। দুই রাজাই তাঁদের ত্রিশূল পুঁতে দিয়ে সীমানা ভাগ করেছেন। পথিক পেলেই তার প্রাণ নিচ্ছে। তবু আপনাকে আমি এ পথ পার করাবো। আমার জীবন সংশয় হলেও তা করবো।'

বলাবাহুল্য রামচন্দ্র খান তা করেছিলেন। ছত্রভোগের ছুই রাজ্যের সীমানা থেকে তিনি সন্ন্যাসী নিমাইকে উড়িষ্যার সীমান্তে পৌঁছে দিয়েছিলেন। এ ঘটনা ১৫১০ খৃষ্টাব্দে। মনে রাখতে হবে ১৪৯৪ থেকেই হোসেন শাহ উড়িষ্যা আর আসাম বারবার অভিযান করেছেন। কিন্তু কখনো পুরোপুরি দখল নিতে পারেন-নি। যাই হোক, সন্ন্যাসী নিমাই যখন প্রথম যাত্রা করলেন, আর ছত্রভোগের সীমান্তে আটকে গেলেন, তখন উড়িষ্যার রাজা, উড়িষ্যার দক্ষিণ সীমান্তে বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেবের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত। হঠাৎ এ সময়েই আলাউদ্দীন হোসেন উড়িষ্যার উত্তর ভাগে আক্রমণ করেছিলেন। সেটা কি কেবল প্রতাপরুদ্র যেহেতু তখন রাজ্যের দক্ষিণে অন্য রাজার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত বলে ? না কি, ভিতরে অন্য কোনো ষড়যন্ত্র ছিল?

তার আগে, ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে হোসেন শাহ উড়িষ্যা আক্রমণ করে অনেক ক্ষতি করেছিলেন। অনেক দেবদেউল বিগ্রহ ধ্বংস করেছিলেন। উড়িষ্যার রাজ্যভার তখন কাকে দেওয়া ছিল ? এর নাম গোবিন্দ ভোই। এই লোকটিকে আমি ভালো করে দেখে রাখছি। এর নাম আমাকে ভুললে চলবে না। অবিশ্যি সে নিজেই ভুলতে দেবে না। এই লোকটিকে 'আপনি' সম্বোধনে ঘৃণা জন্মে। এই লোকটি ছিল প্রতাপরুদ্রের বিশ্বস্ত মন্ত্রী ও সেনাপতি। প্রতাপরুদ্র বিজয়নগর আক্রমণ করতে গেলে, গোবিন্দ ভোইয়ের ওপরেই গৌড়ের সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব দেওয়া ছিল। কিন্তু লোকটি আদ্যন্ত বিশ্বাসঘাতক। একে বলা যায়, উড়িষ্যার মীরজাফর। প্রথমে সে ফটকের কাছে, হোসেন শাহকে বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল। চেষ্টাটা ছিল মামুলি।

আরও একটি কথা মনে রাখা অবশ্য কর্তব্য। সন্ন্যাসী নিমাই ছত্রভোগসীমান্ত অতিক্রম করে, জানুয়ারি মাসে উড়িষ্যায় পৌঁছেছিলেন। গোবিন্দ ভোই এ খবরটা পেয়েছিল। সে যদি পারতো, সম্ভবতঃ নিমাইকে উড়িষ্যায় প্রবেশ করতে দিত না। কিংবা, দিত, কারণ সে তখনও জানতো না, সন্ন্যাসী নিমাই, চৈতন্যদেব নামে রাজা প্রতাপরুদ্রের কী অসীম শ্রদ্ধা ও পূজা পাবেন।

গোবিন্দ ভোই যুদ্ধে হেরে গিয়ে, সারঙ্গগড়ে আশ্রয় নিল। তবে লোকটার মনে একটা ভয় ছিল। হোসেন শাহ জগন্নাথ দেবের বিগ্রহ ধ্বংস করতে পারে, এই সন্দেহ করে, দ্রুত পুরী ফিরে আসে। জগন্নাথদেব পুরুষোত্তমকে পুরীর মন্দির থেকে বের করে, দোলায় চাপিয়ে নিয়ে গিয়েছিল চড়াইগুহা পর্বতে। সেখানেই তাঁকে লুকিয়ে রাখে। এদিকে হোসেন শাহ তখন পুরুষোত্তমে হাজির। মন্দির ধ্বংস করতে আরম্ভ করলেন।

খবর গেল রাজা প্রতাপরুদ্রের কাছে। তিনি তৎক্ষণাৎ বিজয়নগর-কাঞ্চী জয় করার আশা ছেড়ে, অত্যন্ত রোষ-ক্রুদ্ধ চিত্তে পুরী ফিরে এলেন। এক মাসের পথ এলেন দশ দিনে। এদিকে গোবিন্দ ভোইয়ের সঙ্গে হোসেন শাহের ষড়যন্ত্র হয়ে গিয়েছে। দুজনের মধ্যে চুক্তি হয়েছিল, গোবিন্দ যুদ্ধ করবে না, বরং রাজার বিরোধিতা করবে। রাজা পরাস্ত হলে, তখন সে গৌড়ের অধীনে থেকে উড়িষ্যার রাজা হয়ে বসবে। অবশ্য ভবিষ্যতে তা সে হতে পেরেছিল। সে ইতিহাস যেমন করুণ তেমনি কলঙ্কিত। অথচ দেখছি, এই লোকটির প্রতি উড়িষ্যার ঐতিহাসিকেরা এক রহস্যময় কারণে কখনও বিরুদ্ধ কথা বলেননি। ক্রমে ক্রমে রহস্যের দ্বারোদ্ঘাটন হবে।

প্রতাপরুদ্র ফিরে এসে, হোসেন শাহকে তাড়া করলেন। প্রচণ্ড সেই আক্রমণ। হোসেন শাহ সৈন্যসামন্ত নিয়ে কটকের দিকে গেলেন। আশা, সেখানে গোবিন্দ ভোইকে পেয়ে যাবেন। কিন্তু প্রতাপরুদ্র তখন ভয়ঙ্কর রুদ্র। জগন্নাথদেবের মন্দিরে হাত দিয়েছে গৌড়ের আমীর। তাঁর ক্ষমা নেই। কটক থেকে তাড়া করে, হোসেনকে নিয়ে চললেন গঙ্গাতীর পর্যন্ত। জায়গার নাম 'চৌমুহরি'। হোসেন শাহ চেষ্টা করলেন প্রতাপরুদ্রকে বাধা দেবার। যুদ্ধও হলো বিস্তর। কিন্তু হোসেন শাহ টিঁকতে পারলেন না। তিনি পালালেন মান্দারণের পথে। রাজাও ছাড়বেন না। হোসেন শাহ মান্দারণ দুর্গে আশ্রয় নিলেন। প্রতাপরুদ্র দুর্গ অবরোধ করে রাখলেন।

এরকম যখন অবস্থা, গোবিন্দ ভোই সুলতানের সঙ্গে গিয়ে যোগ দিল। প্রতাপ-রুদ্রের অবস্থা তখন বেশ ভালো। শত্রুকে হটিয়ে, হস্তী ও সৈন্যবাহিনী নিয়ে তখন জয়ের মুখে। এই সময়ে গোবিন্দ ভোই রাজার সব দুর্বলতাগুলো হোসেন শাহকে প্রকাশ করে দিল, আর নিজে স্বয়ং নিজের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামলো। শুধু নামলো না, প্রতাপরুদ্রকে পিছু হটতে বাধ্য করলো। তাঁকে পালাতে হলো।

গোবিন্দ ভোই তখন একটা ব্যাপার বুঝেছে। কাজটা সে ঠিক করেনি। ঐ ভাবে উড়িষ্যার সিংহাসন দখল করা সম্ভব ছিল না; কিন্তু পুরুষোত্তমের ব্রাহ্মণ আর বৌদ্ধদের সে প্রিয়পাত্র হতে পেরেছিল একটি কারণে। জগন্নাথদেবকে সে গুপ্তস্থানে সরিয়ে রাখতে পেরেছিল। ধর্মান্ধতা এমন বস্তু, তখন দেশপ্রেম উড়ে যায়। আমরা এ যুগের মানুষরা আজও দেখি দলের প্রতি আনুগত্যের জন্য রাজনৈতিক দলগুলো দেশপ্রেম ভুলতে বসেছে। তাদের কাছে দল হলো এক রকমের ধর্ম, এবং সেখানেই তাদের ধর্মান্ধতা। অথচ পুরীর ব্রাহ্মণ আর বৌদ্ধরা

ভেবে দেখলো না, প্রতাপরুদ্র হেরে গেলে, জগন্নাথদেবকেও হারাতে হবে।

প্রতাপরুদ্র সমস্ত ব্যাপারটাই বুঝেছিলেন। তিনি বুদ্ধিমানের মতো গোবিন্দ ভোইয়ের কাছে লোক পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি আমাকে সরিয়ে কাকে রাজা করছো?' গোবিন্দ ভোই বুঝলো, 'তাই তো। হোসেন শাহ উড়িষ্যা জিতে নিতে পারলে, তাকে কি রাজা করবে আদৌ?' বোধ হয় না। তখন সে রাজার সামনে এসে দর্শন দিল। প্রতাপরুদ্র তাকে ভৎর্সনা বা সেরকম কিছুই করলেন না। বরং তাকে সমাদর করলেন। কনকস্নান করালেন। আর তাকে বিদ্যাধর পদে অধিষ্ঠিত করে, পাত্র করলেন। শুধু তাই নয়, তার ওপরেই রাজ্যভারও দিলেন। কারণ তিনি বুঝেছিলেন, দেশের মধ্যে তাঁর বিরোধীদের সঙ্গে গোবিন্দ ভালোভাবেই আঁতাত গড়ে তুলেছিল।

হোসেন ফিরে গেলেন গৌড়ে। গোবিন্দ ভোই হল গোবিন্দ বিদ্যাধর ভোই।

দুই



ছত্রভোগ স্থানটি কোথায়? এটা জানতে চাওয়া স্বাভাবিক। বর্তমান চব্বিশ পরগণার, কলকাতার পঁচিশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ছত্রভোগ। এই ছত্রভোগই ছিল গৌড় আর উড়িষ্যার সীমান্ত এলাকা। অর্থাৎ ডায়মণ্ডহারবারের অন্তর্গত।

সেইরকম যুদ্ধাবস্থায় নিমাইকে সবাই উড়িষ্যায় যেতে বারণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি গিয়েছিলেন, আর কেমন ভাবে গিয়েছিলেন, অর্থাৎ ছত্রভোগ সীমান্ত-রক্ষী রামচন্দ্র খান কি ভাবে পার করিয়ে দিয়েছিলেন, তাও আমি দেখেছি। কেউ কেউ বলেছেন বটে, নিমাই পুরীতে গিয়ে দোলোৎসব দেখেছিলেন। অসম্ভব নয়। যদিও আমি দেখেছি, তিনি ফাল্গুন মাসে যাত্রা করেছিলেন। দোলের দিনের মধ্যে তাঁর পৌঁছানো সম্ভব ছিল কি না, সেটা বিচার্য। রামচন্দ্র খান তাঁকে রাত্রে নৌকাযোগে পার করিয়ে দিয়েছিলেন। নৌকায় উঠেই নিমাই মুকুন্দকে কীর্তন করতে আজ্ঞা করেছিলেন। তখন মাঝি বলেছিল, প্রভু, এমন কাজটি করবেন না। এখানে ডাঙায় বাঘ, জলে কুমীর। যুদ্ধের সময় ডাকাতরা মরিয়া হয়ে উঠেছে। তা ছাড়া শত্রুপক্ষের লোক জানতে পারলে আর রক্ষা নেই। জলদস্যুও কম নেই।

কিন্তু নিমাই ভয়শূন্য। বললে, ভয়? কার ভয়? কিসের ভয়? কীর্তনেই ভয় দূরে যাবে। মুকুন্দ গান করতে থাক।

এসব কথা স্বয়ং বৃন্দাবনদাসের লেখা। নিত্যানন্দর কাছ থেকে শোনা। নিত্যানন্দও তখন নিমাইয়ের সঙ্গে ছিলেন। অতএব যা দেখছেন শুনছেন, কোনোটাই মিথ্যা নয়। এবং সংকীর্তন করতে করতেই উড়িষ্যায় তাঁর প্রবেশ। এখানে আবার একটি সন্দেহ মনে জাগছে। প্রতাপরুদ্র তখন দক্ষিণে যুদ্ধে লিপ্ত। গোবিন্দ ষড়যন্ত্র করার আয়োজনে ব্যস্ত। পুরীর আবহাওয়ায় নিশ্চয় যুদ্ধের ঘনঘটা ছিল না। এবং আর একটি সন্দেহ হয়। নিমাই যে ভাবে, ১৫১০ খৃষ্টাব্দে ফাল্গুন মাসে, সংকীর্তন করতে করতে, পুরুষোত্তমে প্রবেশ করলো, তাতে মনে হয় না, সেখানে তখন দেবদেউল ধ্বংস হচ্ছিল। আসলে একটা অনিশ্চিত অবস্থা। তারই সুযোগ নিয়ে গোবিন্দ ভোই জগন্নাথদেবকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তাও কি সত্য? তা হলে, চৈতন্যচরিতের কোনো গ্রন্থেই কি তা লেখা হতো না? আমিও দেখছি, নিমাই সপারিষদ কী ভাবে পুরুষোত্তমে গান করতে করতে এলেন।

সন্দেহ থেকেই গেল। নিমাই ছত্রভোগ অতিক্রম করে কোন্ পথে এলেন? জলেশ্বর, জাজপুর, কটক, সাক্ষীগোপাল, ভুবনেশ্বর হয়েই এলেন? বোধহয় তাই ঠিক। গৌড়ের হোসেন শাহ যদি সেরকম আক্রমণ করতেনই, নিমাই কি সপারিষদ ঐভাবে, ঐসব স্থান হয়ে আসতে পাবতেন? সম্ভবতঃ না। আসলে গোবিন্দ ভোই ছত্রভোগের কাছাকাছি কোথাও হোসেনের সঙ্গে লক্ষাভাগের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত লিপ্ত ছিল। যথার্থ যুদ্ধ বলতে যা বোঝায়, তা চলছিল না। সেটা ঘটেছিল আরও পরে। সেপ্টেম্বর মাসে। তারও প্রমাণ আমি পাবো।

ইতিমধ্যে দণ্ড-ভঙ্গের একটি ঘটনা ঘটেছে। আমাদের চোখ এড়িয়ে গিয়েছে। উড়িষ্যায় প্রবেশ করে, নিমাই সুবর্ণরেখায় স্নান করতে গেলেন। সন্ন্যাসের দণ্ড দিয়ে গেলেন জগদানন্দর হাতে। জগদানন্দ ভিক্ষায় যাবেন, তাই দণ্ডটি দিয়ে গেলেন নিত্যানন্দর হাতে। নিত্যানন্দ দণ্ডের সঙ্গে কথা বললেন, আমি যে দণ্ড হৃদয়ে বহন করি, চৈতন্য মহাপ্রভু তা কেমন করে বহন করবেন? এই বলে তিনি দণ্ড ভেঙে ফেললেন। নিমাই খুশি হলেন না। পুরীতে গিয়ে তিনি সক্রোধে বললেন, নীলাচলে এসে আমার অনেক হিত হলো। যে-দণ্ডের ওপর আমার দেবতারা অবস্থান করেন, সেটিও ভেঙে ফেলা হল। যাও, তোমরা জগন্নাথ-দর্শনে যাও। আমি তোমাদের সঙ্গে যাবো না। আর যদি যাই তো, আমি একলা আগে যাবো।

নিমাই তাই গেলেন। কিন্তু নিত্যানন্দর দণ্ডভঙ্গ কেমন একটু রহস্যময় মনে হচ্ছে। হঠাৎ তিনি দণ্ড ভাঙলেন কেন? নিমাইয়ের সন্ন্যাস নেওয়ার কষ্ট আর দুঃখেই কি? তা ছাড়া আর তো কোনো কারণ পাওয়া যায় না। আরও একটি ঘটনা রহস্যপূর্ণ। নিমাই জাজপুরে এসেই সবাইকে ছেড়ে একদিনের জন্য পালিয়ে গেলেন। কোথায় গেলেন? কেন গেলেন? সকলেই উদ্বিগ্ন চিন্তিত।

জবাব একটা আছে। জাজপুরেই ছিল নিমাইয়ের পৈতৃক ভিটা। রাজা কপিলেন্দ্র দেবের উপাধি ছিল ভ্রমর। তাঁর ভয়ে নিমাইয়ের কয়েক পুরুষ আগে, তাঁরা জাজপুর ছেড়ে শ্রীহট্টের অধিবাসী হয়েছিলেন। নিমাই সেই পূর্বপুরুষদের ভিটার অন্বেষণে গিয়েছিলেন। বাঙালীরা অনেকেই বিশ্বাস করতে দ্বিধা করেন, নিমাই প্রকৃতপক্ষে ছিলেন ওড়িয়া। যদি এ কথাটা মানতে না চান, অন্ততঃ তাঁর পূর্বপুরুষরা যে ওড়িয়া ছিলেন, সে বিষয়ে মতানৈক্য থাকা উচিত না। সেই ভিটার অন্বেষণ করতে গিয়ে, নিমাই, পরম বৈষ্ণব কমললোচনের গৃহে একদিন বাস করেছিলেন। ভালো কথা। কিন্তু ভক্তদের কাছে সে-কথা নিমাই গোপন করলেন কেন? এ রহস্যটা কেউ কখনও ভেদ করতে পারেনি। আমিও এর বেশি কিছু জানতে পারলাম না। কারণ, স্বচক্ষে কিছুই দেখা হলো না। রহস্য রহস্যই থেকে গেল।

নিমাই জগন্নাথদেবের মন্দিরে গেলেন। গিয়ে প্রাণ অশান্ত হয়ে উঠলো। ইচ্ছা হলো, তখনই জগন্নাথকে কোলে করবেন। এই পরিকল্পনা করেই, লাফ দিলেন। আর পড়ে গিয়ে অচৈতন্য হয়ে পড়লেন। তখনই একটা কেলেঙ্কারি ঘটতে যাচ্ছিল। পাণ্ডা ব্রাহ্মণরা সেই অবস্থায় নিমাইকে মারতে উদ্যত হল। কিন্তু বাসুদেব সার্বভৌম তখন জগন্নাথ দর্শনে গিয়েছেন। তিনি তাড়াতাড়ি নিমাইকে রক্ষা করলেন। ভালো করে তাকিয়ে দেখলেন নবীন সন্ন্যাসীটিকে। দেখে, নিজের লোকদের বললেন, "এই পুরুষ-রতনটিকে আমার গৃহে নিয়ে চল।"

সকলে ধরাধরি করে, নিমাইকে সার্বভৌমের বাড়িতে নিয়ে এলো। নিত্যানন্দ একটু দেরিতে মন্দিরে এসে হাজির। সব কথা শুনে, সবাইকে নিয়ে তখনই গেলেন সার্বভৌমের বাড়ি। সার্বভৌম একজনকে সঙ্গে দিয়ে বললেন, "আপনারা জগন্নাথ দর্শনে যান। আমরা ছেলে চন্দনেশ্বর যাচ্ছে আপনাদের সঙ্গে। জগন্নাথ দর্শনে কেউ উন্মত্তের মত আচরণ করবেন না। দর্শন করে, সমুদ্র স্নান করে ফিরে আসুন।"

সবাই ফিরে আসার পরে, নিমাইয়ের জ্ঞান ফিরে এলো। সার্বভৌম মহাশয়

সবাইকে নানারকম মহাপ্রসাদ দিলেন। নিজে পরিবেশন করলেন। নিমাই বললেন, "তোমরা পীঠাপানা ছানাবড়া নিজেরা খাও। আমার সামান্য লাফড়া (পাঁচমেশালি তরকারী) অন্ন চাই।"

কথাটা বারে বারে বলেও ভুলে যাই, এখন থেকে নিমাইকে আমি চৈতন্যদেব নামে সম্বোধন করবো। কিন্তু সেই যে শিশুবেলা থেকে তাঁকে দেখে এসেছি, ইতিমধ্যে তিনি অনেক লীলা করেছেন, অবতার হয়েছেন, তবু আমার চোখে যে সে-ই মানুষটিই রয়ে গিয়েছেন। যে-মানুষ লক্ষ্মীর সর্পদংশনের মৃত্যুসংবাদ শুনে প্রথমেই বলেছিলেন, "সংসার অনিত্য মা, সকলই নিয়তির হাতে।" সেই নিয়তিই তাঁকে আজও চালিয়ে নিয়ে চলেছে।

আমি দেখেছি চৈতন্যের জীবনীকারঅনেকেই। কিন্তু গোবিন্দর কড়চার কথা কেউ বিশেষ বলেন না। অথচ গোবিন্দ সর্বদাই ছায়ার মত চৈতন্যদেবের সঙ্গে ছিল। বৃন্দাবনদাস তো পরিষ্কারই লিখেছেন, চৈতন্যদেবের সঙ্গে, "নিত্যানন্দ গদাধর মুকুন্দ সংহতি/গোবিন্দ পশ্চাতে, আগে কেশব ভারতী।" এই গোবিন্দ কাটোয়ার একজন কর্মকার। সে সেই যে সন্ন্যাসের সময় থেকে চৈতন্যের সঙ্গ নিয়েছে, আর ত্যাগ করেনি। চৈতন্যমঙ্গলে বাখান আছে: "আগম নিগম গীতা গোবিন্দের কন্ধে/করঙ্গ কৌপীন কটি-সূত্র তাহে বান্ধে।" এর কি অর্থ? গোবিন্দ চৈতন্যর আগম নিগম গীতা করঙ্গ কৌপীন বহন করেছিল। সূত্র বেঁধে দিয়েছিল কোমরে? অসম্ভব না। কারণ এই গোবিন্দ চৈতন্যদেবের সঙ্গে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণেও গিয়েছে। এবং চিরকাল, আজীবন তাঁর সঙ্গে থেকেছে।

আমাকে একটা হিসাব রাখতেই হবে। চৈতন্যদেব গত হবার আগে পর্যন্ত, কোন্ কোন্ পারিষদ্‌বৃন্দ তাঁর সঙ্গে ছিলেন। এই হিসাবটা দরকার ঐতিহাসিক কারণেই। যাই হোক, গোবিন্দ নিজে কড়চায় এক জায়গায় লিখেছে, "পেছনে পেছনে আমি খড়ি লৈয়া যাই।"

এইবার আসছে বাসুদেব সার্বভৌমের সঙ্গে চৈতন্যদেবের ঐতিহাসিক বিতর্ক! বিস্ময়কর শাস্ত্র বিচার! আমি জানি, দেখছিও, সার্বভৌম মহাশয়ের সারা পুরীতে কী প্রতিষ্ঠা, যার রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁকে অশেষ শ্রদ্ধা করেন। তিনি জগৎ-বরেণ্য পণ্ডিত। চৈতন্যদেব অপেক্ষা করছিলেন, কে আগে পরস্পরের মধ্যে কথা শুরু করবেন। শেষ পর্যন্ত চৈতন্যদেবই একদিন নিভৃতে সার্বভৌমের কাছে বসে বললেন, 'আমি জগন্নাথ দর্শন করতে এসেছি, এটি প্রকৃত কথা। আমার মূল উদ্দেশ্য, আপনি এখানে আছেন, জগন্নাথ আমাকে কী বলবেন, তা

আপনিই একমাত্র জানেন।'

সার্বভৌম চৈতন্যদেবের এত অল্প বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ মোটেই পছন্দ করেননি। তিনি আগে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার মতো সুবুদ্ধি যার, সে এ বয়সে সন্ন্যাস কী কারণে নিয়েছে, আমাকে বল। জানো, সন্ন্যাসে অহংকার বাড়ে। সন্ন্যাসীরা নিজেদের ঈশ্বর মনে করে। নিজেকে বলে নারায়ণ। অথচ জীবের স্বভাবই হলো ঈশ্বর ভজন। সেটা কী করে হয়? যদি বলো শঙ্করের মতো, তা হলেও প্রমাণ হয় না কিছুই। লোকে বলে সমুদ্রের তরঙ্গ। তরঙ্গের সমুদ্র নয়। এই হলো শঙ্করের কথা। এসব না জেনে, মাথা মুড়িয়ে কী লাভ? শঙ্করাচার্যকে না বুঝে, ভক্তি ছেড়ে মাথা মুড়িয়ে লোকে দুঃখ পায়। তুমি আমাকে বল, এ পথে কেন তুমি এলে?'

সার্বভৌমের বক্তব্য, দাস্য বা ভক্তিই শঙ্করাচার্য চেয়েছেন। তার মনের কথা না বুঝে লোকে ঝোলা কাঁধে, মাথা মুড়িয়ে দুঃখ পায়। তার পরেও, 'তুমি যদি বল, মাধবেন্দ্র আদি ইত্যাদিরা শিখা সূত্র ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়েছেন। ভালো কথা। তাদের তিন কাল গিয়ে এককালে ঠেকেছিল। কিন্তু তুমি? এই ভরা যৌবনে সন্ন্যাস কেমন করে হয়? তা ছাড়া, তোমার শরীরে যে ভক্তির চিহ্ন দেখছি, তারপর তো সন্ন্যাসের কোন প্রয়োজনই দেখি না।'

চৈতন্যের মনের কথা বোঝা ভার। তিনি বললেন, 'সার্বভৌম মহাশয়, আপনি আমাকে সন্ন্যাসী বলে জানবেন না। আমি কৃষ্ণের বিরহে বিক্ষিপ্ত আছি। সেই জন্যই শিখা সূত্র ছেড়েছি। মাথা মুড়িয়ে, সন্ন্যাসে আমার জ্ঞান বাড়বে না। আপনি দয়া করুন, যেন কৃষ্ণে আমার মতি থাকে। আর আমার বড় সাধ, আপনার মুখে আমি ভাগবত শুনব।'

সার্বভৌম হেসে বললেন, 'তুমি সব বিষয়েই জান, সে খবর আমার জানা আছে। কিসে কোথায় তোমার সন্দেহ, আমাকে বল, দেখি ব্যাখ্যা করতে পারি কি না।'

চৈতন্য আত্মারাম শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনতে চাইলেন। সার্বভৌম তেরো প্রকারের ব্যাখ্যা করে চুপ করলেন। চৈতন্য কী করলেন? মিটিমিটি হেসে বললেন, 'আপনি যে-অর্থ করেন, আমি বুঝতে পারি না। এমন কিছু বলবেন না, যাতে মনে হয়, সব যেন মেঘে আচ্ছাদিত। ব্যাসের সূত্রের অর্থ সূর্যকিরণের মতো। আপনি নিজের মতো ব্যাখ্যা করছেন।'

গোলমালটা করেছেন সার্বভৌম মহাশয় নিজেই। চৈতন্যদেব যখন ভাগবত

শুনতে চাইলেন, তিনি শোনালেন শাঙ্কর-বেদান্ত। তিনি চৈতন্যকে গোড়াতেই শাঙ্কর-বেদান্তী বলে ভুল করেছেন। চৈতন্য শুনতে চেয়েছে ভাগবত। ভাগবতের ব্যাখ্যা শঙ্কর কখনও করেননি। কিন্তু সার্বভৌম না বুঝে কয়েক দিন ধরে কেবল বেদান্তই ব্যাখ্যা করে চললেন। চৈতন্যের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল। তিনি ভাগবতের মহিমা দেখাবার জন্য সহসা ভিন্ন মূর্তি ধারণ করলেন, 'আপনি আমাকে কী বোঝাচ্ছেন? সংকীর্তন করাই আমার অবতারত্ব। এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে চেয়ে দেখুন, আমি ছাড়া আর কেউ নেই।'

মুহূর্তের মধ্যেই সার্বভৌম দেখলেন, তাঁর সামনে শ্রীমূর্তি ষড়ভুজ। অবতারের উদ্দেশ্য, সাধুর উদ্ধার, দুষ্টের বিনাশ! আমরা নবদ্বীপে এখনও চৈতন্যদেবের এই শ্রীমূর্তি ষড়ভুজ দেখে থাকি। সার্বভৌম সেই মূর্তি দেখে আনন্দে উদ্বেল উত্তেজিত। তৎক্ষণাৎ সেই মূর্তির পায়ে পড়লেন, 'উদ্ধার কর হে।'

সার্বভৌম যা দেখলেন, আমরাও কি তাই দেখলাম? না দেখলে ক্ষতি নেই, সকলে সব কিছু দেখতে পান না। সার্বভৌম কিন্তু সত্যি দেখলেন, আর বুঝলেন, তাঁর ভুল কোথায় হয়েছিল। দাস্য ভক্তি নয়, উদ্ধার ও বিনাশ চাই। এই হল চৈতন্যের মূল তত্ত্ব। 'তুমি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। তুমি আমাকে উদ্ধার কর।'

চৈতন্য তৎক্ষণাৎ আবার সার্বভৌমকে প্রণাম করলেন। সার্বভৌমের হৃদয় মন সবই হরণ করে নিলেন। কিন্তু এখন চৈতন্য কী করবেন? তিনি কি সন্ন্যাস নিয়ে পুরীতে বসে থাকবেন? না, সে পাত্র তো তিনি নন। মাত্র দু মাস আগে তিনি সন্ন্যাস নিয়েছেন। উড়িষ্যায় এসেছেন। তাঁর একটি উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে। সার্বভৌমকে জয় করেছেন। এবার চল ভ্রমণে। বসে থাকার সময় কোথায়? নিজের কথা সবাইকে দেশব্যাপী শোনাতে হবে। স্ত্রী-শূদ্র-আদি মূর্খকে উদ্ধারের জন্যই তো এই সন্ন্যাস।

ইতিহাসের গতিপথে দেখছি, কী অভিনব ব্যাপার! চব্বিশ বছরের কোনো বাঙালী যুবক এমন দুঃসাহসের কাজ আগে করেনি। পরেও আর করেনি। পুরী থেকে বেরিয়ে পড়লেন তিনি। রামেশ্বর সেতুবন্ধের পথে। সেখান থেকে বোম্বাই, দ্বারকা, সোমনাথ, সব জায়গায় ঝড়ের বেগে ছুটে বেড়াতে লাগলেন। গৌড় থেকে পুরীতে এসে কেটেছে দেড় মাসের মতো সময়। তারপরেই এই যাত্রা।

চৈতন্যের মনে কি আর একটি অভিপ্রায় ছিল? নিজে ধর্ম প্রচার ছাড়াও দাদা বিশ্বরূপকে অন্বেষণ করাও কি তাঁর একটি উদ্দেশ্য ছিল? চৈতন্য নিজে সে কথা মুখ ফুটে কোথাও বলেননি। বলেছেন, তাঁর জীবনীকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে যাবার আগে, সার্বভৌম পাঁচদিন চৈতন্যকে নিজের বাড়িতে ধরে রাখলেন। তাঁর ব্রাহ্মণী উত্তম ভোজন করালেন। সার্বভৌম বললেন, 'তোমার যাবার পথে গোদাবরী নদীর ধারে বিদ্যানগর পড়বে। সেখানে একজন কায়স্থ বিষয়ী কিন্তু অতি রসিক ভক্ত রায় রামানন্দ আছেন। তাঁর সঙ্গে কথা বললে তুমি তাঁর মহিমা বুঝতে পারবে। তোমারও উচিত, তাঁর সঙ্গে দেখা করা। তোমার যাত্রার উদ্দেশ্য সার্থক হবে।'

চৈতন্য যাত্রা করলেন। কিন্তু নবদ্বীপের কারোকেই সঙ্গে নিলেন না। নিত্যানন্দ যাবার জন্য পা বাড়িয়েছিলেন? চৈতন্য অনুমতি দিলেন না। একজন ব্রাহ্মণ সঙ্গে জলপাত্র আর বহির্বাস নিয়ে যাবে, নিত্যানন্দ চেয়েছিলেন। চৈতন্য তাতেও রাজি হলেন না। তবে কি কেউ সঙ্গে গেল না? গেল, একজন। সে হল গোবিন্দ কর্মকার যে পরে কড়চা লিখবে। এই ভ্রমণের সঙ্গে আমি পাল্লা দিতে পারব না। তবে কিছু ঘটনা আমি দেখবো। সে সব না দেখলে, চৈতন্যের প্রচারটা ঠিকমতো বোঝা যাবে না। আর একটা কথা মনে রাখতে হবে। রাজা প্রতাপ-রুদ্র এ সময়ে দক্ষিণেই বিজয়নগরে যুদ্ধে ব্যস্ত। আর গোবিন্দ ভোই হোসেন শাহর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছে। অতএব, রাজার সঙ্গে চৈতন্যের দেখা হলো না।

চৈতন্যের সঙ্গে গোদাবরী তীরে, বিদ্যানগরে রামানন্দের দেখা হলো। দুজনেই যেন দুজনকে দেখে চিনতে পারলেন। চৈতন্য তাঁকে দেখেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে জড়িয়ে ধরতে গেলেন। কায়স্থ রামানন্দ বললেন, 'করেন কি? আমি শূদ্র। আমাকে ছোঁবেন না।'

ছোঁব না! চৈতন্য রামানন্দকে আলিঙ্গন করে ধরলেন। তারপরে উভয়ের মধ্যে কথা হলো। রামানন্দ তাঁর ধর্মকথা যতো বলেন, চৈতন্য জবাবে কেবলই 'আগে কহ আর' বলতে লাগলেন। রামানন্দ ক্রমে ক্রমে, তাঁর শেষ কথায় এলেন। 'ভগবান আমার কান্ত, প্রিয়তম।' এই কথা বলে, রামানন্দ থামলেন। চৈতন্য ছাড়লেন না, বললেন, 'আরো কিছু বাকি রাখলে, আমাকে দয়া করে শোনাও।'

রামানন্দ তখন রসতত্ত্বের সাধনাঙ্গের একটি বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করলেন। চৈতন্য বললেন, 'আগে কহ আর।' রামানন্দ অবাক! অতঃপরেও কারোর কিছু জিজ্ঞাসা থাকতে পারে, তাঁর জানা ছিল না। তিনি বললেন, 'ত্রিজগতে রাধা প্রেমের কোনো উপমা আর নেই।'

চৈতন্য শিহরিত হলেন! জিজ্ঞাসা করলেন, 'দয়া করে আর একটু বল, কৃষ্ণের স্বরূপ কি? রাধার স্বরূপ কি? রস কোন্ তত্ত্ব? প্রেম কোন্ তত্ত্বরূপ?'

রামানন্দ তখন তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেও, শেষ পর্যন্ত গান গেয়ে উঠলেন : "পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল/অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল।" জয়দেবের দৈহিক সম্ভোগ ছাড়িয়ে, তিনি বিলাসবিবর্তের ব্যাখ্যা করলেন। চৈতন্য শুনতে শুনতে মূর্ছা গেলেন। তার মধ্যে রামানন্দ সার কথা শোনালেন, সখীর স্বভাব সম্বন্ধে বললেন :

"সখীর স্বভাব এই অকথ্য কথন
কৃষ্ণসহ নিজ লীলায় নাহি সখীর মন।
কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায়
নিজ সুখ হইতে তাতে কোটি পুনরায়।

*　　*　　*

সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম
কামক্রীডা সাম্যে তার কহি কাম নাম।"

শুনতে শুনতে চৈতন্য রামানন্দকে আলিঙ্গন করলেন। দুজনেই জড়াজড়ি গলাগলি। আর চোখের জলে ভাসেন। চৈতন্য রামানন্দকে শ্যামগোপরূপ দেখালেন। সন্ন্যাসী আর নেই। শ্যামগোপরূপ গৌরকান্তিতে আচ্ছাদিত। রামানন্দ বললেন, 'এর কি অর্থ?'

'রাধাকৃষ্ণে তোমার প্রেম অত্যন্ত গাঢ়। প্রেমের স্বভাবই এই, সে স্থাবর জঙ্গম সমস্ত বাহ্য বস্তুতে কেবল প্রেমাস্পদকেই দেখতে পায়।'

রামানন্দের মন মানলো না। তাঁর মনে হলো, চৈতন্য চাতুরি করছেন। আসল কথা চাপা থাকছে। বললেন, 'তুমি নিজের রূপ চুরি করছো। আমাকে আসল দেখাও।'

চৈতন্য ধরা পড়ে হেসে তখন নিজের স্বরূপ দেখালেন। রামানন্দ দেখলেন, রসরাজ মহাভাব দুই একই রূপ। দেখেই রামানন্দ একাধারে অভেদাত্মক যুগলরূপ দেখে পাগলের মত ধরতে গেলেন। পারলেন না। অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। চৈতন্য তাঁকে স্পর্শ করে চেতনা আনলেন। বললেন, 'গৌর অঙ্গ আমার নয়, রাধার অঙ্গ স্পর্শ তো একজন বিনা আর কেউ করতে পারে না। তুমি যা দেখেছ, ঠিকই দেখেছ। আর আজ থেকে জানবে, গৌডীয় বৈষ্ণব ধর্মের এইটিই মূল। তুমি নিজেকে শূদ্র ভেবে সংকুচিত কেন? কি ব্রাহ্মণ, কি সন্ন্যাসী, শূদ্রাদি সবই এক। যে কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সে-ই গুরু হতে পারে। জাতের বিচার নেই।'

রামানন্দ আনন্দাশ্রুতে ভাসতে লাগলেন। আমি এতদিন পরে কী দেখলাম? গোদাবরীতীরে এই প্রথম চৈতন্য অবতার কৃষ্ণ থেকে রাধার দিকে মুখ ফেরালেন,

এখন তিনি রাধার অবতার। ভবিষ্যতে নিত্যানন্দের গৌড়ীয় ব্যাখ্যার সঙ্গে এর মিল হবে না।

চৈতন্য বিদ্যানগর থেকে গেলেন ত্রিমন্দ নগরে। সেখানে বৌদ্ধদের বাস বেশি। সেখানকার রাজা চৈতন্যকে বৌদ্ধদের সঙ্গে শাস্ত্র বিচার করতে অনুরোধ করলেন। বৌদ্ধরা চৈতন্যের কাছে পরাস্ত হলেন। তারপরে তো কেবলই জয় আর জয়। মথুরার পথে পাঠান মুসলমানদের বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত করলেন। স্ত্রী পুরুষ সমান, এই প্রচার চলল। তিনি বিভিন্ন শাখার শৈব শাক্তদের বৈষ্ণব করছেন, আবার নিজেও শিবপূজা করছেন। শক্তিকে প্রণাম করছেন। এইটিই তাঁর লক্ষ্যভেদের একমাত্র উপায়। কোন শাস্ত্রকেই ছোট করছেন না। আর নিজ শাস্ত্রকে প্রচার করছেন, বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত করছেন। এমন কি মুসলমানদের যখন বৈষ্ণব করছেন, তখন কোরানও বাদ যাচ্ছে না। কোরানের ব্যাখ্যাও করছেন। বলি ছাড়াও যে কালী-পূজা হয়, তার প্রবর্তকও শ্রীচৈতন্য।

তারপরে সেই কুখ্যাত দস্যু, পন্থভীল আর নারোজীকে দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করিয়ে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা দিলেন। বেশ্যাকে বেশ্যাবৃত্তি ত্যাগ করিয়ে তাদেরও বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করলেন। আমার মনে কেমন একটা সংশয়ের দ্বন্দ্ব চলছে। চৈতন্যদেব যে বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার চেয়েছিলেন, আজ আর তার কিছুই নেই। এখন যেন মনে হয় আসল বৈষ্ণব ধর্ম চলে গিয়ে, আবর্জনা আর জঞ্জালের স্তূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মহাকালের এই বিচারের বিতর্কে আমি যাবো না। বরং দেখি, চৈতন্য কোথায় যান, দাক্ষিণাত্য থেকে মহানদী পার হয়ে বোম্বাইয়ের আমেদাবাদে। আমেদাবাদ থেকে সোমনাথে। গুজরাটে, এবং বরোদা নগরে। ওপারে গেলেন মহাভারতের সেই প্রভাস, দ্বারকা রৈবতক পর্বতে। বিন্ধ্যগিরি থেকে আবার ফির:লন বিদ্যা-নগরে রামানন্দের কাছে। পথে দুটি পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন। 'কর্ণামৃত' আর 'ব্রহ্মসংহিতা'। রামানন্দকে পুঁথি দুটি দিয়ে বললেন, 'তুমি যে প্রেমসিদ্ধান্ত বলছিলে, এ দুই পুঁথিতে সেই রসের সন্ধী পাবে। এবার আমার ফেরার পালা, নীলাদ্রি যাবো।'

রামানন্দ বললেন, 'আমি আমার রাজার অনুমতি চেয়ে রেখেছি। তোমার সঙ্গে আমিও নীলাদ্রি যাবো। আমার সঙ্গে হাতী ঘোড়া লোক লস্কর যাবে। দশদিন আমার ব্যবস্থা করতে সময় লাগবে। তারপরেই আমি তোমার পিছু পিছু যাবো।'

চৈতন্য বললেন, 'এসো। আমি চললাম।'

তিন



চৈতন্য পুরীতে ফিরে এলেন। ১৫১০ খৃষ্টাব্দের বৈশাখ মাসে তিনি বেরিয়েছিলেন। ফিরলেন ১৫১২ খৃষ্টাব্দের মাঘ মাসে। ফিরলেন, প্রায় বিকালে। ধূলো পায়ে আগে গেলেন জগন্নাথ দর্শনে। দর্শন মাত্রেই জ্ঞানশূন্য হয়ে লুটিয়ে পড়লেন। ইতিমধ্যে সন্ন্যাসী জীবনের জন্যই মাথায় একটি জটা ধারণ করেছিলেন। সে সবই লুটিয়ে পড়লো। কৌপিনও খসে পড়লো। গোবিন্দ কর্মকারই কয়েকজনকে সঙ্গে করে, প্রভুকে নিয়ে তুললো সার্বভৌমের গৃহে। যাবার আগে যেমন পাঁচদিন সার্বভৌমের ব্রাহ্মণী খাইয়েছিলেন, ফিরে আসার পরেও তা করলেন।

ইতিমধ্যে দেখছি, নিত্যানন্দ-ভক্তরা সবাই তখনও পুরীতে রয়েছেন। সার্বভৌম একটি নূতন সংবাদ দিলেন, বললেন, 'চৈতন্য, তোমার কথা রাজা প্রতাপরুদ্রকে বলেছি।' তিনি শুনে মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে বললেন, 'কেন তোমাকে যেতে দিলাম। পায়ে ধরেও কেন রেখে দিলাম না।'

চৈতন্য বিনীত হেসে বললেন, 'রাজা রাজার মতো কথাই বলেছেন। তিনি নিশ্চয়ই অন্তরে প্রেমিক।'

সার্বভৌম রাজার সঙ্গে কথা বললেন, 'চৈতন্যকে কোথায় রাখা যায়?'

রাজা বললেন, 'তাঁকে কাশী মিশ্রের বাড়িতে স্থান নিতে অনুরোধ করুন।'

অতএব চৈতন্য রাজার কথায় কাশী মিশ্রের বাড়িতে উঠলেন। সেখানে এসে জুটলেন সব ভক্তরা। সকলেই তাঁর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের বিষয় জানতে চাইলেন। চৈতন্য সব কথাই বললেন। সবাই অবাক হয়ে শুনলো। শুনলো এমন কথাও, বাঘ পর্যন্ত তাঁকে আক্রমণ করেনি। জঙ্গলের পথে, কেবল একবার দেখেই, নিজের পথে ফিরে গিয়েছে। আক্রমণ করেনি। আরও নানা কথা, বিশেষ করে চৈতন্য কীভাবে বিভিন্ন মতের লোককে উদ্ধার করেছেন, ধর্মের প্রচার করেছেন। কিন্তু কারোকেই অলৌকিক কিছু দেখাননি। লোকে সেইজন্যই আরও বেশি আকর্ষণ বোধ করেছেন। বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকদের সঙ্গে তাঁর কথা বলারও কোনো

অসুবিধা হয়নি। তবে তিনি যেমন বেশ্যা উদ্ধার করেছেন, তেমনি দাক্ষিণাত্যের মন্দিরে দেবদাসী-প্রথার বিরুদ্ধে কথা বলেছেন।

এ কথাটি মনে রাখবার মতো। কারণ পুরীতে চৈতন্য যখন এসব কথা বলছেন, তখন জগন্নাথের মন্দিরে দেবদাসী প্রথা বর্তমান। এর বিরুদ্ধে হঠাৎ তাঁর মুখে কিছু শোনা না গেলেও, এটি যে সমর্থনযোগ্য নয়, এটা স্পষ্টই বোঝা যায়। চৈতন্য আরও একটি বিষয় বুঝলেন, ভক্তরা দাক্ষিণাত্য জয়কে তেমন মূল্যবান কিছু মনে করলেন না। ভবিষ্যতের পক্ষে এটাই হলো এক রকমের ব্যর্থতা। যদি সবাই দাক্ষিণাত্য জয়ের বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করতে পারতো, তবে অনেকেই সে পথে যাত্রা করতো। সে তো দূরের কথা, তেমন আমল না দেওয়াতে, ভবিষ্যতের ইতিহাসে বৈষ্ণব ধর্মে শ্রীচৈতন্যের অবদানের মূল্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা নিজেরাই কোনো দিন বুঝতে পারেননি। তাঁরা চেয়েছিলেন, শ্রীচৈতন্য অলৌকিক কিছু ঘটিয়ে আসবেন।

এটা কি আমাদের পূর্ব-সম্মোহিত মানসিকতারই ফল না? এটি সাধারণ মানুষ চরিত্রের একটি বিষম দুর্বলতা। তারা চায়, হয় অলৌকিক কিছু দেখাও, অন্যথায় বিপ্লব ঘটাও। অথচ, হ্যাঁ, শ্রীচৈতন্য যা করেছেন, তা বৈপ্লবিক। কারণ চব্বিশ বছরে একজন নবীন সন্ন্যাসী ১৫১০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৫১২ খৃষ্টাব্দের মাঘ মাস পর্যন্ত দাক্ষিণাত্যে যা করেছেন, তা বৈপ্লবিক কাজ, নিঃসন্দেহে। কিন্তু সেই বিপ্লবের মশালটি জ্বালিয়ে রাখার জন্য, তাঁর পরে আর কেউ ছিলেন না। যেজন্য একে ভবিষ্যতে লুপ্ত ইতিহাস হয়েই থাকতে হয়েছে।

যাই হোক, এবার ভিন্ন প্রসঙ্গ। নীলাচলে ফিরে শ্রীচৈতন্য প্রায় দু বছর অতিবাহিত করলেন। এর মধ্যে তিনি বারে বারেই গৌড়ে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। রামানন্দ আর সার্বভৌম যেতে দেননি। কিন্তু এখনও দেখছি, রাজা প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের দেখা হলো না, হলে আমার চোখ এড়িয়ে যেতো না। কিন্তু চৈতন্যদেব কখন কোথায় যাচ্ছেন, কি করছেন, মাদলাপঞ্জিতে তা লেখা না থাকলেও, রাজা প্রতাপরুদ্র প্রতিটি সংবাদ রাখেন, একথা আমি জানি। রাজার উপায় নেই, তিনি সাধারণ ভক্তের মতো আচরণ করেন না। তাতে তাঁর যতো ক্ষতি হবে, অধিক ক্ষতি হবে চৈতন্যদেবের। একথা তিনি জানতেন।

১৫১৪ খৃষ্টাব্দের রথযাত্রা এলো। ইতিমধ্যে অবশ্য খবর গিয়েছে নবদ্বীপে, চৈতন্য দাক্ষিণাত্য থেকে ফিরে এসেছেন। শচীদেবীর একটি গভীর প্রত্যাশা ছিল বিশ্বরূপের কোনো খবর পাবেন। পাননি। চৈতন্য নিজেও পাননি। না পাবার কারণ আর কিছু না। বিশ্বরূপ মারা গিয়েছিলেন দাক্ষিণাত্যেরই এক মন্দিরে।

চৈতন্ত গিয়েছেন তারপরে।

অন্ত দিকে, হোসেন শাহর দুই দবীর খাস—সচিব বলতে যা বোঝায়, সনাতন আর রূপ চৈতন্তকে গোপনে চিঠি পাঠিয়ে কাকুতি-মিনতি করছেন,চাকরি ছেড়ে তাঁরা প্রভুর সেবা করবেন। চৈতন্ত সেই থেকেই ভাবছেন, একবার বৃন্দাবনে যাবার নাম করে গৌড়ে যাবার পথে, দুজনের সঙ্গে দেখা করবেন।

১৫১৪ খৃষ্টাব্দে রথযাত্রা শেষ করে, নবদ্বীপের ভক্তরা ফিরে গিয়েছেন। চৈতন্ত বিজয়া দশমীর দিন, সেপ্টেম্বর বা অক্টোবরে, নীলাচল ত্যাগ করলেন। সন্ন্যাসের পর এটি পঞ্চম বর্ষের ঘটনা। প্রতাপরুদ্রের কানে খবরটা পৌছুনো মাত্রই, তিনি আজ্ঞাপত্র পাঠালেন, "যে-পথ দিয়ে প্রভু যাবেন, গ্রামে গ্রামে নতুন আবাস তৈরি কর। লোকজন সঙ্গে যাও। খাবার আর অন্তান্ত সামগ্রী সঙ্গে থাকবে প্রচুর। সময় সব সময় যেন প্রহরা থাকে। সীমান্ত প্রদেশের শাসন-কর্তা মহাপাত্র হরিচন্দন, মন্দরাজকে বিশেষ সংবাদ প্রেরণ করলেন, প্রভুর প্রতি দৃষ্টি রাখতে। কোন প্রকার অন্তথা যেন না ঘটে। ঘাটে ঘাটে নৌকা রাখো। তোরণ স্তম্ভ তৈরি কর পথে পথে। কটকের ওপরে চৌদার গ্রামে বিশেষ নতুন বাসস্থান তৈরি হোক।" রামানন্দকে অনুরোধ করে বললেন, 'রামানন্দ, আপনি প্রভুর রওনা হবার সময় কাছে থাকবেন।' এইসব নির্দেশ দিয়ে, রাজ-গৃহের মহিষীদের হস্তীর ওপর চড়িয়ে পাঠালেন দর্শন করবার জন্ত। চিত্রোৎপলা নদীর ঘাটে সব মহিষী রমণীরা প্রভুকে দর্শন করলেন।

বাংলা দেশ হলে আজকের দিনটিতে বিসর্জনের বাজনা শোনা যেতো। আজ বিজয়া দশমী। কিন্তু উড়িষ্যাতে সেইরকম দুর্গা পূজার প্রচলন ছিল না। কিন্তু একটা বিষয় বোঝা গেল না। রাজা প্রতাপরুদ্রও কি হস্তী-পৃষ্ঠে গেলেন? বোধ হয় না।

এবার আমি একটি লোককে নিরীক্ষণ করছি। এ সেই গোবিন্দ ভোই বিদ্যাধর। লোকটি ভুরু কুঁচকে রুষ্ট মুখে চৈতন্তের এই আদর-আপ্যায়ন দেখছে। মুখে একটি কথাও বলছে না। কিন্তু তার মুখ কঠিন শক্ত হয়ে উঠছে। কেন, রাজার এত শ্রদ্ধা ভক্তি কিসের এই বাঙালী সন্ন্যাসীটার ওপর? তার মনে ক্রূরতা জাগলো। বিশ্বাসঘাতক লোকটিকে রাজা প্রতাপরুদ্র ধরে রেখেছেন। কারণ জানেন, লোকটি তাঁর ক্ষতি করতে পারে। সেজন্ত কিছুই বলেন না। কিন্তু লোকটি যে শ্রীচৈতন্তের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে উঠছে, সে খবর তিনি জানলেন না।

রাজা প্রতাপরুদ্র কি জানেন না, যে-লোক একবার বিশ্বাসঘাতকতা করে শত্রুর সঙ্গে হাত মেলাতে পারে, সে ভবিষ্যতে সবই করতে পারে? জানতেন। জানতেন গোবিন্দ বিদ্যাধর ভোই নিজের হাত রক্তাক্তও করতে পারে। তবু তাঁর উপায় ছিল না, গোবিন্দ বিদ্যাধরকে সরাবেন। কারণ গোবিন্দ বিদ্যাধর রাজ্যের সমস্ত ধর্মীয় সংঘগুলোকে নিজের হাতে রেখেছিল। যে-কোনো মুহূর্তেই রাজার বিরুদ্ধে তাদের ক্ষেপিয়ে তোলার ক্ষমতা ছিল লোকটার। গোবিন্দ বিদ্যাধরকে হত্যা করারও উপায় ছিল না। কারণ সে নিজেই অনেক গুপ্তঘাতক আর গুপ্তচর সারা দেশে ও রাজপ্রাসাদে ছড়িয়ে রেখেছিল। এ হেন লোক শ্রীচৈতন্যকে সহ্য করতে পারছিল না, রাজার শ্রদ্ধা-ভক্তি-আপ্যায়ন রাজকীয় সম্বর্ধনা, কিছুই সহ্য করতে পারছিল না। শ্রীচৈতন্যের প্রতি সে বৈরী মনোভাব আর ঈর্ষা পোষণ করতে লাগলো। আর এটা ঘটলো সকলের চোখের অলক্ষ্যে। কিন্তু আমার চোখে আঙুল দিয়ে ইতিহাস দেখিয়ে দিল। কারণ ইতিহাসের গতি বড় নির্মম, আর বিস্ময়কর আঁকাবাঁকা। ক্রূর কঠিন নির্দয়।

এখন দেখা যাক, চৈতন্যদেব কোন্ পথে গৌড়ে ফিরছেন। রায় রামানন্দ দেখছি, বালেশ্বরের চোদ্দ ক্রোশ দক্ষিণে ভদ্রক পর্যন্ত এলেন। চৈতন্য বললেন, 'এবার ফিরে যাও।'

রামানন্দ বললেন, 'না। উড়িষ্যার সীমান্ত পর্যন্ত তোমাকে আমি পৌছবো। এখান থেকে তিন ক্রোশ ঘুরে রেমুনা। রেমুনায় মন্ত্রেশ্বরে যবন-অধিকারে যে-নদী আছে, তাকে আমরা দুষ্টনদ বলি। কারণ যে যবনের অধীনে ঐ নদী আর ভূমি আছে, সে অতি ভয়ংকর হিন্দু-বিদ্বেষী। তোমাকে সেখানে ছেড়েই বা আসব কি করে? সেই নদী পেরিয়ে তোমাকে পিছলদায় পৌছুতে হবে।'

চৈতন্য হাসলেন। বললেন, 'চলো, দেখা যাক, কী হয়।'

মন্ত্রেশ্বরে পৌছে, চৈতন্য সেই যবন অধিকারীকে সংকীর্তন শোনালেন। বললেন, 'এতেই সকলের মুক্তি। খোদা খৃষ্ট কৃষ্ণ কোনো তফাত নেই।'

যবনের হঠাৎ পরিবর্তন হলো। সে চৈতন্যের পায়ে পড়লো। বললো, 'মনে বড় অশান্তি, তাই দুষ্টামি করি। তুমি প্রভু শান্তি দিলে। আমি এখন তোমার অধীন।'

রামানন্দ দুই চোখে জল নিয়ে সে দৃশ্য দেখলেন। যবন শিষ্য ডাকাতের ভয়ে, দশ নৌকো লোকেভরে চৈতন্যকে পিছলদায় পৌছে দিল। পিছলদা থেকে, নৌকায় করে গেলেন পানিহাটী। গঙ্গার ওপর দিয়ে কুমারহাট, ফুলিয়া, শান্তিপুরে। সেখান

থেকে মালদহের রামকেলী গ্রামে কানাইয়ের নাটশালায় গিয়ে পৌছালেন। কিন্তু জায়গাটি খুব সুবিধার না। গৌড়ের রাজধানীর কাছেই। হোসেন শাহ আবার রাজধানী বদলে, আলাদা রাজধানী করেছিলেন। কারণ, বিশ্বাসঘাতক-দের হাত থেকে নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখতে চেয়েছিলেন। রামকেলীতে চৈতন্য পৌছাবার পরেই সেখানে লোকের ভিড় লেগে গেল। সংবাদটা হোসেন শাহের কানে পৌছোলো। অনেকে আমরা হোসেন শাহকে হিন্দুপ্রেমিক রূপে জেনেছি। বলেছেনও অনেকে। কথাটার মধ্যে আসল সত্য কতটা ছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে।

চৈতন্য রামকেলীতে আসার অনেক আগে থেকেই হোসেন শাহ তাঁর নাম শুনেছিলেন। মাহাত্ম্যও শুনেছিলেন, তবু কেশব খানকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বল তো কেশব খান, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কেমন মানুষ! তাঁকে এত লোক দেখতে আসে কেন? কী মাহাত্ম্য আছে তাঁর?'

কেশব খান মিথ্যা জবাব দিলেন, 'উনি নামেই গোঁসাই। আসলে একজন গরীব ভিক্ষুক সন্ন্যাসী ছাড়া কিছু নন। গাছতলায় থাকেন, দু-চারজন দেখতে আসে।'

হোসেন শাহ তেমন কাঁচা পাত্র ছিলেন না। তাঁর কাছে আসল সংবাদ ছিল। কেশব খানের ভয় অন্য কিছু না। হোসেনকে কেউ কুমন্ত্রণা দিলে, পাছে তিনি বিগড়ে যান। এইটা ভয়। ভয়টা মিথ্যাও ছিল না। কোনো কোনো মুসলমান অমাত্য চৈতন্য সম্পর্কে সুলতানকে কুমন্ত্রণা দিচ্ছিল। যে কারণে কেশব খান চৈতন্যকে বললেন, 'কী দরকার এখানে থাকবার। যবনেরা আপনার নামে লাগানি-ভাঙানি করছে। কিসের থেকে কী হয়, কিছু বলা যায় না।'

চৈতন্য হেসে বললেন, 'তা বেশ তো, রাজা ডাকেন তো যাবো। ভয় কি?'

হোসেন শাহ মন্ত্রী রূপসনাতনকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে, 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য লোক কেমন? সব শুনে আমার মনে হচ্ছে, তিনি সাধারণ লোক নন। তিনি মহাত্মা ব্যক্তি। কেবল নিজের ঈশ্বরের চিন্তা করেন।'

সনাতন বললেন, 'জনাব, তিনি আপনার চিত্তের চৈতন্যস্বরূপ। চিন্তা করলেই প্রমাণ পাবেন তিনি খোদা কৃষ্ণ সবাইকে মানেন।'

হোসেন শাহ বললেন, 'তবে তো তিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর! আমার বড় ভালো লাগছে। তোমরা ঘোষণা করে দাও, কোনো কাজি বা কোটাল যদি তাঁকে বিরক্ত করে তবে তার জান আমি খতম করবো।'

কিন্তু এত জায়গা থাকতে, চৈতন্য রামকেলী গ্রামে এলেন কেন? জবাব পাওয়া গেল। রাত্রে দুই দবীর খাস রূপ আর সনাতন ছদ্মবেশে রামকেলীগ্রামে এলেন প্রভুর সঙ্গে দেখা করতে। দুজনেই ইতিপূর্বে চিঠিপত্র লিখতেন প্রভুকে। তাঁর সন্নিধানে থাকতে চান। এবার সাক্ষাতে সেই সব কথাই হলো। তাঁরা বললেন, 'আপনি জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করেছেন। আমাদেরও করুন। আমরা আর এ রাজ-চাকরি করতে চাই না।'

চৈতন্য বললেন, 'আমি রামকেলীতে তোমাদের দুজনের সঙ্গে মেলবার জন্যই এসেছি।' বলে দুজনের মাথায় দু হাত রাখলেন।

রূপ-সনাতন চৈতন্যের পায়ে পড়লেন। ইতিহাসের দিক থেকে, এটি একটি বিরাট ঘটনা। সৈন্য ও রাজস্ব বিভাগের দুই প্রধান মন্ত্রী, কৌপীনধারী একজন সন্ন্যাসীর পায়ে মাথা লুটিয়ে দিলেন। বৈষ্ণব ধর্মের ও ইতিহাসের নতুন বাঁক নিল। ছদ্মবেশে আসার সময় যাঁদের মনে নানা সংশয়, ফেরার সময় তাঁদের মন আলোকময়। তাঁরা বললেন, 'প্রভু! সুলতান আপনার কোন ক্ষতি করবেন না। তবু, কী দরকার আর এখানে থেকে? এখান থেকে অন্যত্র যান।'

'তাই যাবো।' চৈতন্য বললেন, 'আমি তোমাদের সঙ্গে মিলতে এসেছিলাম। সেই মিলন হয়ে গেল। এখান থেকে আমি বৃন্দাবন যাবার মনস্থ করেছি।'

কিন্তু শচীমাতা আর বিষ্ণুপ্রিয়া? তাঁরা কি একবার দেখা করবেন না? করবেন। কিন্তু শচীমাতা একলা। বিষ্ণুপ্রিয়া না। শচীমাতার সঙ্গেই একবার দেখা হল। তারপরেই গৌড় ছেড়ে আবার যাত্রা। ঝাড়খণ্ড হয়ে বৃন্দাবনের পথে যাত্রা করলেন। কেননা, চৈতন্য নিজেই বলেছেন, 'মথুরা বৃন্দাবনই তাঁর সব থেকে প্রিয় স্থান।' অথচ বৃন্দাবনে গেলেন তিনি, ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে, সেপ্টেম্বর কিংবা অক্টোবরে। আর ১৫১৬ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসেই আবার নীলাচলেই ফিরে এলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে বৃন্দাবন-লীলায় কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল। তবে, আমার তাতে কী প্রয়োজন! আমি এখনি তাঁকে নীলাচলে দেখতে চাই।

চার



বৃন্দাবন থেকে ফেরার পথে, প্রয়াগে তাঁর সঙ্গে দেখা হলো শ্রীরূপ আর তাঁর ভাই শ্রীবল্লভের সঙ্গে। এঁরা তখন বৃন্দাবন যাচ্ছেন। এখানে চৈতন্য একটি কাজ করলেন। রায় রামানন্দের কাছ থেকে যে রসতত্ত্ব তিনি শুনেছিলেন, প্রয়াগে দশ দিন ধরে, সেই রসতত্ত্বের ব্যাখ্যা করে শোনালেন শ্রীরূপকে। এটিও একটি ভবিষ্যতের ইঙ্গিত। বৃন্দাবনে যাতে সেই রসতত্ত্বের ধারা বহে, সেটাই চৈতন্যের কাম্য ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সনাতন বা রূপ কেউ ঠিক সেই রসতত্ত্ব বুঝতে পারেননি। যে কারণে তাঁরা মীরাবাঈয়ের বাড়িতে ভিক্ষা করতে যেতেন না। কারণ রমণীর কাছ থেকে ভিক্ষা গ্রহণ করা যায় না। অবশেষে মীরাবাঈ রূপ-সনাতনকে ডেকে রসতত্ত্বের ব্যাখ্যা করেছিলেন। তখন তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন, প্রভু অনেক আগেই তাঁদের সেই তত্ত্ব দান করেছেন। তখন দুজনেই মীরাবাঈয়ের কাছে নতি স্বীকার করেছিলেন। মীরাবাঈ তাঁর স্বক্ষেত্রে রাধাতত্ত্বেই কৃষ্ণভজনা করতেন। আর চৈতন্য নবদ্বীপ-লীলার পথে, কৃষ্ণ অবতারত্ব ছেড়ে রাধাতত্ত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

কিন্তু ইতিহাসের পরবর্তীকালে দেখছি, পরে রাজা রামমোহন রায় চৈতন্যের এবং বৈষ্ণবদের বিশেষ সমালোচনা করেছিলেন। অবিশ্যি রামমোহনকে দোষ দেওয়া যাবে না। শাঙ্কর-বেদান্তের মায়াবাদ নিয়ে এই সমালোচনায় রামমোহন খুব একটা ভুল করেননি। আমি দেখছি, লক্ষ্মীর সর্পদংশনে মৃত্যুর পর থেকে, সন্ন্যাস নেওয়া পর্যন্ত, সংসার যে অনিত্য ক্ষণভঙ্গুর, চৈতন্যের ভিতর দিয়ে তা প্রকাশ পাচ্ছে। তবে জীব আর ব্রহ্ম যে এক, একথা তিনি বলেননি। কিন্তু শাঙ্কর-বেদান্তের মায়াবাদ যে তিনি গ্রহণ করেছিলেন, এটা প্রত্যক্ষ। পরে এই মায়াবাদ লীলাবাদে মত পরিবর্তন হয়েছে বলেই মনে হয়।

রামমোহন কয়েকটি প্রশ্ন তুলেছেন। শঙ্করাচার্যের মোহের নিমিত্ত যদি দুষ্কৃতের কারণ হয়, সেটা বলা চৈতন্যদেবের অপরাধ হবে। চৈতন্যদেবের দীক্ষাগুরু ঈশ্বরপুরী, সন্ন্যাসগুরু কেশব ভারতী, দুজনেই শাঙ্কর মতের সন্ন্যাসী।

বিশেষতঃ ভাগবতের টীকাকার শ্রীধর স্বামীও নিজেকে শাঙ্কর সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী বলে স্বীকার করেছেন। তা হলে শ্রীচৈতন্য কেমন করে শাঙ্কর মতের বিরোধী হতে পারেন? যদি হন, তা হলে তাঁর মধ্যে স্ব-বিরোধিতা আসে, তাঁর ধর্মেরই মূলোচ্ছেদ হয়ে যায়।

রাজা রামমোহন নিজেকে শাঙ্কর-শিষ্য বলে পরিচয় দিতে গর্ব বোধ করেছেন। কিন্তু তাঁর এই মারাত্মক অভিযোগের উত্তর চৈতন্য নিজেই সার্বভৌমকে দিয়েছিলেন। 'সন্ন্যাসী করে আমি জ্ঞান লাভ করতে চাই না। কৃষ্ণের বিরহে কাতর, তাই শিখা সূত্র মাথা মুড়িয়ে বেরিয়ে এসেছি।' এ তো পরিষ্কার কথা! শাঙ্কর সম্প্রদায়ের বাইরের দিকটা তিনি গ্রহণ করেছেন, বেদান্তের দার্শনিক মতবাদ গ্রহণ করেন নি।

দার্শনিক মতবাদের কথা ছেড়ে চৈতন্যের নিজস্ব ধর্ম ও নীতি শিক্ষার কথাই বলা যাক: যেমন সনাতনকে তিনি বলেছেন, "আটটি শিক্ষা মনে রেখো। অবৈষ্ণবের সঙ্গ ত্যাগ। বহু শিষ্য কখনো করবে না। বহু গ্রন্থ পাঠ করবে। ব্যাখ্যা করবে না। ধর্মের হানি করে সম শোকাদি বশ হবে না। অন্য দেবতা শাস্ত্র ইত্যাদি নিন্দা করবে না। বিষ্ণু বা বৈষ্ণব নিন্দায় গ্রাম্য কথায় কান দেবে না। কোনো প্রাণীকেই কথায় উদ্বিগ্ন করবে না।"

শুনে মনে হয়, এ তো বৌদ্ধ ধর্মের অহিংসবাদ। নবদ্বীপ লীলায় এ অহিংসভাব দেখা যায়নি। "গাছের ডালপালা কাটলেও যেমন সে কথা বলে না, বরং যে কাটে তাকে ছায়া দেয়, ফল দেয়, বৈষ্ণবকে সেই রকম গাছ হতে হবে।" এ বড় বিষম কথা! আক্রান্ত হলেও পড়ে মার খাবে! এ তো গীতার কথাও না। চণ্ডীর কথাও না। সমাজ-জীবনে এই অহিংসা-নীতি রাষ্ট্রে পরাধীনতা আনে। রাজা রামমোহন এক জায়গায় বলেছেন, আমাদের পরাধীনতার একটি কারণ হিংসা ত্যাগ করা। কথাটা মিথ্যা না। এটা অ-হিন্দু, বৌদ্ধ আর বৈষ্ণব নীতিবাদ।

অবশ্য তারপরেও চৈতন্য প্রকাশানন্দের সঙ্গে, বেদান্ত বিচার করে, শঙ্করের অদ্বৈত মতবাদ খণ্ডন করেছেন। এখানেই তাঁর ভ্রমণও শেষ। আর নীলাচল ছেড়ে যাননি। গৌড়ে নিত্যানন্দ বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেছেন। চলেছে পতিত উদ্ধার। অন্যদিকে শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবনের সঙ্গে যোগ রেখে, দর্শনশাস্ত্র, রসতত্ত্ব, নাটক ইত্যাদি প্রণয়নের ওপর বৈষ্ণব ধর্মের সিদ্ধান্ত নিরূপণ করে চলেছেন। এ দুটি ধারাই একত্রে মিলে মহাপ্রভুর গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম নামে প্রচারিত হয়েছে। ভারতের ইতিহাসে এটি বাঙালীর অবদান—শেষ অবদান।

পাঁচ



শ্রীচৈতন্যের জীবন এখন নীলাচলেই সীমাবদ্ধ। তার আগে নিত্যানন্দকে গৌড়ে পাঠালেন, বলে দিলেন, 'শোন নিত্যানন্দ মহামতি, তুমি সত্বর নবদ্বীপে যাও। আমি নিজ মুখে প্রতিজ্ঞা করেছি, মূর্খ নীচ দরিদ্র সবাইকে প্রেমসুখে ভাসাবো! তুমি এখানে মুনিধর্ম নিয়ে বসে থাকলে চলবে না।'

নিত্যানন্দ অবিলম্বে চলে গেলেন গৌড়ে। আর নিত্যানন্দ প্রভুর প্রতিটি কথাই রেখেছিলেন। তিনি যে-ভাবে গণ-সংযোগের দ্বারা বৈষ্ণব ধর্ম পরিচালনা করেছিলেন, তা দীর্ঘকাল গৌড়বাসী মনে রেখেছে। তাঁর প্রেমতত্ত্ব প্রচারই বাংলা দেশে বৈষ্ণব ধর্মকে টিকিয়ে রেখেছে।

কিন্তু আঠারো বছর চৈতন্যদেব নীলাচলে কী করলেন? বৃন্দাবনের সঙ্গে যোগ রেখে, একটা আদর্শ ও তত্ত্ব বজায় রাখছিলেন ঠিক। বাকি কী করেছেন? এবার থেকে তাঁকে 'আপনি' সম্বোধন করবো। নিত্যানন্দ তো রাঢ়ে গৌড়ে সরাসরি শ্রীচৈতন্যের মূর্তি ঘরে ঘরে তৈরি করে, পুজো করতে বললেন। এ এক মস্ত বড় কাজ। নিত্যানন্দ যা করেছিলেন, তা আজও সারা বাংলাদেশে বলতে গেলে, ও সময়ে নিত্যানন্দের কথাই বেশি এসে পড়ে। তবু আমরা চৈতন্যদেবকেই বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখবো।

নীলাচলে মহাপ্রভু কঠোর সন্ন্যাসব্রত পালন করেছেন। ওদিকে রাঢ়ে গৌড়ে নিত্যানন্দর প্রচার আলাদা। কঠোর সন্ন্যাস ধর্মের কোনো কথা নেই। কেউ কেউ বলাবলি করতে লাগলো, 'এ তো শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করা হচ্ছে না। এ তো দেখছি অবধূত নিত্যানন্দের বৈষ্ণব ধর্মপ্রচার। বিলাসিতার লক্ষণ তাঁর আচার-ব্যবহারে।'

এ সব দেখেশুনে, এক ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব নবদ্বীপ থেকে নীলাচলে গেলেন, সব কথা শ্রীচৈতন্যকে জানাবার জন্য। তিনি গিয়ে বললেন, 'প্রভু, আমার নিবেদনটা এই যে নিত্যানন্দ অবধূতের ধর্মপ্রচার আমি মোটেই ভাল বুঝছি না। সন্ন্যাস আশ্রমের কথা তিনি সবাইকে বলছেন, আর তাঁর নিজের মুখে কর্পূর তাম্বুল সব সময়েই

আছে। সন্ন্যাসীর কোনো ধাতুদ্রব্য ব্যবহার নিষেধ, অথচ নিত্যানন্দের গায়ে সোনা-রূপোর অলঙ্কার। কাষায় কৌপীন ছেড়ে, দিব্য রেশমী বস্ত্র পরেছেন। সর্বদাই মালা চন্দনের বিলাসিতা চলছে। দণ্ড ছেড়েছেন, অথচ লোহার দণ্ড হাতে নিয়েছেন। আর সব সময়েই শূদ্রের আশ্রয়ে থাকেন। এ সব আচরণ মোটেই ভালো নয়। লোকে তাঁকে বড়লোক ধনী সাধক বলছে। অথচ তিনি আশ্রমাচার করছেন না।'

শ্রীচৈতন্য সব কথা শুনলেন, তারপর হেসে বললেন, 'নিত্যানন্দকে তুমি ভুল বুঝেছো ব্রাহ্মণ। যে মহা অধিকারী হয়, জানবে তার কোন দোষ জন্মায় না। পদ্ম পাতায় যেমন জল থাকে না, নিত্যানন্দ সেই রকম নির্মল স্বরূপ। আরও জানবে, "কৃষ্ণচন্দ্র আছেন সর্বদা তাঁহার শরীরে।' তবে, একটা সাবধানও করে দিই। সেটা হলো অনধিকারী চর্চা। সবাই যদি নিত্যানন্দ হতে যান, তবে পাপ হবে। রুদ্র বিনা কেউ বিষ পান করতে পারে না। সেটা মনে রাখা দরকার।"

তবে খবরাখবরে, শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তুমি কী ভেবে ঐরকম প্রচার ধর্ম করছো?'

নিত্যানন্দ জবাবে বললেন, 'কাঠিন্য কীর্তন কলিযুগে ধর্ম নহে।'

এ কথাটা, কঠিন সন্ন্যাসব্রতী শ্রীচৈতন্য মেনে নিলেন। অথচ সামান্য কারণে, একজনকে মৃত্যু আজ্ঞা দিলেন। নিত্যানন্দকে ক্ষমা করতে পারলেন। পারলেন না ছোট হরিদাসকে, যে অপূর্ব কীর্তন গান করতে পারে। পুরীতে তাঁর পার্ষদ শিখি মাহিতির ভগ্নির নাম মাধবী দেবী। তিনি তপস্বিনী, পরম বৈষ্ণবী। শ্রীচৈতন্যদেব মনে করেন, তিনি রাধা অবতার রূপে যেমন সাধন করেন, সেই রকম সাড়ে তিনজন আছেন। স্বরূপ গোঁসাই, রায় রামানন্দ, শিখি মাইতি—তিনজন। আর মাধবী দেবী অর্ধেক। এই সাড়ে তিনজন।

ছোট হরিদাসের অপরাধ, তিনি মাধবী দেবীর কাছে ভিক্ষে করে, চৈতন্যদেবের জন্য এক মণ শুক্ল চাউল এনেছিলেন। চৈতন্য বললেন, 'যে বৈরাগী প্রকৃতি সম্ভাষণ করে, আমি তার মুখ দেখতে চাই না। আজ থেকে সবাইকে বলে রাখছি। ছোট হরিদাসকে আমার এখানে আর আসতে দেবে না।'

ছোট হরিদাস এক বছর অপেক্ষা করেছিলেন, যদি প্রভু ক্ষমা করেন। না, প্রভু তা করলেন না। তখন ছোট হরিদাস প্রয়াগে গিয়ে, ত্রিবেণীতে ডুবে প্রাণ বিসর্জন দিলেন। কেউ কেউ বলেছেন বা লিখেছেন, ছোট হরিদাসের ঐভাবে প্রাণ বিসর্জন দেওয়ায়, প্রভুর প্রাণে লেগেছিল। কিন্তু সেটা কতদূর সত্য, কিছু বোঝা যায় না। হরিদাসের প্রাণ বিসর্জনের পরে একদিন হঠাৎ তাঁর কী মনে হয়েছিল,

বলেছিলেন, 'হরিদাস কাহা তারে আনহ এখানে।'

সামান্য অপরাধে এটা গুরু দণ্ড হয়েছিল সন্দেহ নেই। আমি জানি, শ্রীচৈতন্য তাঁর নীলাচলের অন্ত্যঃলীলায় কঠোর সন্ন্যাস-ধর্মকে আদর্শ রূপে প্রচার করতে চেয়েছিলেন। ছোট হরিদাস প্রভুর জন্য 'শুক্ল চাল' এক মণ ভিক্ষে করে আনতে গিয়েছিলেন শিখি মাহিতির বোন মাধবী দেবীর কাছ থেকে। তাও, মাধবী দেবী তখন মোটেই যুবতী ছিলেন না। বলতে গেলে একরকম বৃদ্ধা তপস্বিনী।

কিন্তু শ্রীচৈতন্য নিজে কি করলেন? এক ওড়িয়া ব্রাহ্মণকুমার মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যকে দেখতে প্রতিদিন আসতো। পিতৃহীন সেই কুমার দেখতে বেশ সুন্দর, ব্যবহার মিষ্টি। চৈতন্যদেবও তার সঙ্গে কথা বলে পরম সন্তোষ লাভ করেন। এই ব্রাহ্মণ বালকের মা বিধবা, সুন্দরী যুবতী। চৈতন্য তা জানতেন। দেখেওছেন নিশ্চয়ই। দামোদরের চোখে ব্যাপারটা মোটেই ভালো ঠেকতো না। এ আবার কী রকম ব্যাপার? যিনি ছোট হরিদাসকে সামান্য রমণীর কাছে ভিক্ষায় জন্য বিতাড়িত করেন, তিনি কেন সামান্য বালকের সঙ্গে রোজ দিন পরম সন্তোষে কথা বলেন। বিশেষ তার মা যখন বিধবা সুন্দরী যুবতী?

চৈতন্যের সংবিৎ ফিরে এলো। তাই তো! তিনি এটা কী করছেন? তিনি দামোদরকে সাধুবাদ দিলেন। বললেন, 'তুমি অতিশয় নিরক্ষর ব্যক্তি বলেই আমাকে বাক্যদণ্ড দিতে পারলে। ভয় পেলে না।'

এ যেন চৈতন্যের বিনয় বাক্যের মতো শোনালো না। দামোদর ভয় পাবেন কেন? তা হলে চৈতন্যও ভাবেন তাঁকে বাক্যদণ্ড দিতে হলে, ভয়ের কারণথাকতে পারে? শুধু তাই না। তিনি আর একটি কাজ করলেন। দামোদরকে বললেন, 'তুমি একজন সত্যিকারের রক্ষক ব্যক্তি, সেই জন্যই তুমি নবদ্বীপে আমার মায়ের কাছে যাও। তাঁকে রক্ষা কর। মাঝে মাঝে এসে আমাকে দর্শন দিও।'

এ কি রকম বিচার হল? দামোদরকে কি নির্বাসন দিলেন? দামোদর তো শ্রীচৈতন্যকে ছেড়ে কোথাও যেতে চাননি। তাঁকে উচিত রক্ষক বিবেচনায় নবদ্বীপে পাঠিয়ে দিলেন। চৈতন্যদেবের একজন জীবনী ব্যাখ্যাকার বলেছেন, সামান্য ঘটনার মধ্যে প্রভুর একটি সুন্দর দিক প্রকাশ পেয়েছে এ ঘটনার মধ্যে। সুন্দরটা কী? আমি সে-তত্ত্বেরই সন্ধান করছি। আমি মানুষ। আমি সামান্য জীব। আমি তো এর মধ্যে সুন্দর কিছু দেখতে পেলাম না। দামোদরের মনোভাবও প্রকৃত প্রকাশ পেলো না। তাঁকে নবদ্বীপে চলে যেতে হলো। এর মধ্যে রাধাতত্ত্ব অবতারের কী মহিমা প্রকাশ পেল?

অবশ্য আমি আর সেই ব্রাহ্মণ বালক বা তার সুন্দরী যুবতী বিধবা মাকে দেখতে পেলাম না। তবে এ নিয়ে যে কানাকানি শুরু হয়েছিল, তার মধ্যে মিথ্যা নেই। এর আর এক রকমের প্রমাণ পরেও আমরা চৈতন্য চরিত্রে পাবো। সে কথা পরে আসবে। তবে আমার মনটা ছোট হরিদাসের জন্য বড়ই হাহাকার করে।

অথচ যবন হরিদাস এসব থেকে মুক্ত। তাঁর পক্ষে সমুদ্রতীর ছেড়ে পুরী নগরীতে প্রবেশের অধিকার ছিল না। তিনি স্বর্গদ্বারের কাছে নিজের আস্তানায় থাকতেন। চৈতন্য তাঁকে ভোগ পাঠাতেন। প্রভুর এসব ব্যাপারে কোনো ত্রুটি ছিল না। সনাতন অর্থাৎ হোসেন শাহর সেই দবীর খাস সুলতানের চাকরি ছেড়ে অনেক দিন আগেই মথুরা বৃন্দাবনে গিয়ে বাস করছিলেন। নিজেকে তিনি শূদ্র ভাবতেন এই কারণে যে, দীর্ঘকাল যবন রাজের নোকরি করেছেন। তিনি প্রভুকে দর্শনের জন্য নীলাচলে এলেন। কিন্তু এলেন ঠাকুর অর্থাৎ যবন হরিদাসের আশ্রমে। ঠাকুর হরিদাস সনাতনকে আলিঙ্গন করলেন। সনাতনের শরীরে তখন ব্যাধি। ব্যাধিটির নাম কণ্ডরসা।

কণ্ডরসা কী ব্যাধি? কণ্ডুক যদি হয় তবে তা আলু মুলো কচু ইত্যাদির মত ডুমো ডুমো কিছু হবে, এবং তার সঙ্গে রস গড়িয়ে পড়া। চৈতন্যদেব এসেও যখন তাঁকে আলিঙ্গন করতে গেলেন সনাতন বাধা দিতে গেলেন। প্রভু মানলেন না। জোর করে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। দেহে কণ্ড-ক্লেদ। সনাতন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন এর প্রায়শ্চিত্তের জন্য তিনি জগন্নাথদেবের রথের চাকার তলায় পড়ে প্রাণ দেবেন।

অন্তর্যামী শ্রীচৈতন্য তা জানতে পেরে বললেন, 'দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পেয়ে, কোটি দেহও ছাড়া যায় না। আত্মহত্যায় কৃষ্ণ পাওয়া যায় না। ভক্তিই তোমাকে কৃষ্ণ দেবেন। তোমার দেহ তুমি আমাকে সমর্পণ করেছো, তোমার দেহ এখন আমার। তোমার শরীরে আমার বহু সাধন প্রয়োজন আছে। তুমি দেহ বিনাশ করতে পার না।'

অনেকে মনে করেন, নীলাচলে প্রভু নিশ্চিন্তে বসেছিলেন। আদৌ তা নয়। গৌড়ে নিত্যানন্দের সাধন ভজন প্রচার সম্পর্কে নিয়মিত খবর রাখতেন। এবং তিনি গৌড়ের মুসলমান রাজত্বের অবস্থার সঙ্গে, নিত্যানন্দর প্রচারের যুক্তি মেনে নিয়েছিলেন। এদিকে উড়িষ্যার প্রচারের সঙ্গে রাজা প্রতাপরুদ্রের ইতিহাস জড়িত। শ্রীরূপ সনাতনের মথুরা-বৃন্দাবনের প্রচারের সঙ্গে দিল্লি আর আগ্রার ইতিহাস জড়িত। সবই ভিন্ন ভিন্ন রূপে চলছিল। শ্রীচৈতন্য সবই পরিচালনা

করছিলেন নানাভাবে সম্মতি দিয়ে।

১৫১৬ খৃষ্টাব্দে নিত্যানন্দ যখন গৌড়ে প্রচার শুরু করেন, হোসেন শাহর রাজত্ব শেষ হতে আর মাত্র চার বছর বাকি ছিল। হোসেন শাহ আঠারোটি ছেলে রেখে মারা যান। জ্যেষ্ঠ পুত্র নসরৎ শাহ ১৫২০ খৃষ্টাব্দে সুলতান হন। শ্রীচৈতন্যের তখনও দিব্যোন্মাদ অবস্থা দেখা যায়নি। ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব ঘটে। সেই বছরই নসরৎ শাহকে একজন খোজা ভৃত্য গুপ্ত হত্যা করে। নসরৎ শাহর রাজত্বকালে নিত্যানন্দকে প্রচারের জন্য বেশ কিছু সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছিল। নির্বিঘ্নে কিছুই সম্পন্ন হয়নি। গৌড়ে নসরৎ শাহর আমলে, দিল্লীতে পাঠান-সাম্রাজ্য ধ্বংস হচ্ছিল। মুঘল-সাম্রাজ্যের সূত্রপাত চলছে। গৌড়েও তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

এ বিষয়টি এখানে উল্লেখের প্রয়োজন হলো, গৌড়ে পাঠান-মুঘল সংঘর্ষে নতুন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। নিত্যানন্দ সেই অবস্থার মধ্যে প্রচার চালাচ্ছেন।

অন্য দিকে, ১৫১০ খৃষ্টাব্দে চৈতন্যদেব যখন পুরীতে এলেন, তখন প্রতাপরুদ্র বিজয়নগরে যুদ্ধে লিপ্ত। তাঁর অনুপস্থিতিতে, গোবিন্দ ভোইয়ের ষড়যন্ত্রে হোসেন শাহ উড়িষ্যা আক্রমণ করেছেন পশ্চিম দিক থেকে। সেই পরিস্থিতিতেই চৈতন্য পুরীতে এসেছিলেন। হোসেন শাহের আক্রমণের খবর পেয়ে, প্রতাপরুদ্র প্রচণ্ড ক্রোধে, বিজয়নগর যুদ্ধ অসমাপ্ত রেখে, কটকে ফিরে এলেন। হোসেন শাহকে দাবড়ে নিয়ে চলে গেলেন একেবারে হুগলির মান্দারণে। গোবিন্দ ভোইয়ের ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে গেল। রাজা তাঁকে জিজ্ঞেস করে পাঠালেন, 'কার জয় তুমি চাও?' তখন বিশ্বাসঘাতকটি ফিরে এলো।

১৫১২ খৃষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্য দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ শেষ করে ফিরে এলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র তখন কটকে। খবর পেয়ে প্রভু-দর্শনে ছুটে এলেন। এই প্রথম দুজনের সাক্ষাৎ। এই সাক্ষাৎই উভয়ের মধ্যে একটি প্রগাঢ় প্রীতিশ্রদ্ধা ও ভক্তির ভাব সৃষ্টি করলো। ইতিমধ্যে অনেকগুলো যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটেছে। হোসেন শাহের থেকেও বেশি ঘটেছে বিজয়নগরের কৃষ্ণদেব রায়ের সঙ্গে। এবং প্রতাপরুদ্র পরাজিত হয়ে পলায়নও করেছেন। আবার যুদ্ধ করে জিতেছেন।

১৫১৬ খৃষ্টাব্দের কোনোএক সময়ে প্রতাপরুদ্র গৌড় আক্রমণের সিদ্ধান্ত করে' শ্রীচৈতন্যের মতামত জানতে চাইলেন। শ্রীচৈতন্য খবর রাখতেন, তখন আসামের বেশ কিছু অংশ জয় করে, হোসেন শাহ রীতিমতো বলবান। শ্রীচৈতন্য বললেন, 'না, তুমি গৌড়ে যেও না। বরং কৃষ্ণদেব রায় তোমাকে পরাজয়ের যে-গ্লানি দিয়ে

গেছেন, তুমি তারই প্রতিশোধ নাও। এখন গৌড়-আক্রমণ ঠিক হবে না।'

এ ঘটনা থেকে আমি আর এক ঐতিহাসিক চৈতন্যদেবকে দেখতে পাচ্ছি। দিব্যোন্মাদ-লক্ষণ দেখা দেবার আগে পর্যন্ত চৈতন্য রাজনীতিতেও অংশ নিয়েছেন। এবং তিনি মোটেই যুদ্ধবিরোধী ছিলেন না। অহিংসা-ধর্ম এসেছে তার পরে। কিন্তু কৃষ্ণদেব রায়ের সঙ্গে যুদ্ধেও প্রতাপরুদ্র পরাস্ত হলেন। দুজনের মধ্যে সন্ধি হলো। প্রতাপরুদ্রের এক কন্যার সঙ্গে কৃষ্ণদেব রায়ের বিয়ে দেওয়া হলো। এ রাজকন্যার নাম ভদ্রা। প্রতাপরুদ্রের এক রানীকে কৃষ্ণদেব রায় কোণ্ডাপল্লী দুর্গে বন্দী করে রেখেছিলেন। এবার শাশুড়িজ্ঞানে তাঁকে মুক্তি দিলেন।

এ সব ঘটনা যাকে সব থেকে বেশি বিচলিত ও ক্রুদ্ধ করছিল, সে হলো গোবিন্দ বিদ্যাধর ভোই। আর তার যতো রাগ আর ঘৃণা, সবই শ্রীচৈতন্যের ওপর গিয়ে পড়তে লাগলো। কারণ আছে। এ ঐতিহাসিক কারণটি কেউ লিখে রাখেননি। কারণ, সম্ভব ছিল না এই জন্য যে গোবিন্দ বিদ্যাধর চেয়েছিল, হোসেন শাহের সঙ্গে যদি প্রতাপরুদ্র যুদ্ধে যেতেন, তা হলে তাঁর পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। ফলে, হোসেন শাহের সঙ্গে গোবিন্দ বিদ্যাধর আর একদফা হাত মিলিয়ে উড়িষ্যার সিংহাসন লাভ করার সুযোগ পেতো। শ্রীচৈতন্য সেখানেই বাদ সাধলেন। চৈতন্য ভেবেছিলেন, কৃষ্ণদেব রায়ের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজয় ঘটলেও, হিন্দুর সঙ্গে হিন্দুর সন্ধি হবে। হোসেন শাহ রাজাকে ধ্বংস করে দিতেন, আর উড়িষ্যা গোবিন্দ বিদ্যাধরের অধীনে চিরকাল গৌড়ের করদ-রাজ্য হয়ে থাকতো। গোবিন্দ বিদ্যাধর তখন থেকেই ভাবছিল, চৈতন্যের ওপর প্রতিশোধ তোলা যায় কেমন করে!

১৫২০ খৃষ্টাব্দের পরে, বলতে গেলে প্রতাপরুদ্রকে আর যুদ্ধবিগ্রহ করতে হয়নি। সেই সময় থেকে তিনি কেবল শ্রীচৈতন্যের সঙ্গেই বেশিরভাগ সময় থাকতেন। তাঁর সঙ্গে থাকতেন ওড়িয়া বৈষ্ণব জগন্নাথ দাস, বলরাম দাস, অচ্যুতানন্দ দাস প্রমুখ। বৈষ্ণব ধর্মই ছিল তাঁদের একমাত্র আলোচনার বিষয়।

এসব দেখে শুনে গোবিন্দ বিদ্যাধর কী করলো। সে জগন্নাথদেবের মন্দিরের লোক পাণ্ডা ব্রাহ্মণদের বোঝাতে লাগলো, রাজার এ কেমন মতি গতি? তিনি জগন্নাথদেব দর্শন করতে আসেন না। তোমাদের সম্ভাষণ করেন না। কেবল ঐ বৈষ্ণবটার সঙ্গে সব সময় কাটাচ্ছেন, আর তার সেবা করছেন? ঐ বৈষ্ণব চৈতন্য কী চায়? সে তো চণ্ডাল আদি মুসলমানকেও আলিঙ্গন করে, জাত বিচার করে না। তোমরা এটা সহ্য করছো কেমন করে?

গোবিন্দ বিদ্যাধর মন্দিরের পাণ্ডাদের বুকে এভাবেই আগুন জ্বালাতে লাগলো।

অন্যদিকে, পুরীতে তখনও বেশ কিছু বৌদ্ধদের সংঘ ছিল। সে সেখানে গিয়ে বললো, 'তোমরা কি দেখছো না, রাজা তোমাদের প্রতি একবারও তাকিয়ে দেখছেন না? তোমাদের প্রতি তাঁর কোনো অনুগ্রহ নেই কেন? ঐ বৈষ্ণব চৈতন্যের মধ্যে তিনি কী পেয়েছেন? কিছুই না। যতো সব রাজ্যের আবর্জনার মন্ত্র রাজার কানে দিচ্ছে, আর রাধাতত্ত্ব রসের কথা বলছে। বিকৃতি ছাড়া ওসব কিছুই না। তোমরা ঐ বৈষ্ণবের বিরুদ্ধে প্রচার চালাও। ওকে রাজ্য-ছাড়া কর। রাজার কাছ থেকে ওকে সরাতে হবে।'

বৌদ্ধরাও জগন্নাথের মন্দিরের পাণ্ডাদের মতো মনে মনে খেপে উঠলো। তাই তো! রাজা তো তাদের প্রতি একবারও দৃকপাত করেন না। সংঘগুলির প্রতি তাঁর কোনো সুদৃষ্টি বা কৃপা নেই। কেবল সব সময় ঐ বৈষ্ণবটার সঙ্গেই আছেন।

গোবিন্দ বিদ্যাধর ঘৃণার আগুন ছড়াতে লাগলো। কিন্তু অত্যন্ত প্রচ্ছন্ন-ভাবে। রাজা যেন টের না পান। অবিশ্যি গোবিন্দ বিদ্যাধর রাজাকে যতটা অবিবেচক ভাবতো, তিনি মোটেই তা ছিলেন না। তাঁর বিশেষ অনুচরবৃন্দ সব সময়ে তাঁকে সব খবরই দিতো।

ছয়



এইবার অন্য প্রসঙ্গে আসি। চৈতন্যদেব সংবাদ পেলেন, ঠাকুর হরিদাসের ভোজ্য অভুক্ত পড়ে থাকে। চৈতন্য ভাবলেন, হরিদাস অসুস্থ হয়েছেন। তিনি দেখা করতে এসে বললেন, 'হরিদাস সুস্থ হও।'

হরিদাস বললেন, 'সুস্থ হবো কেমন করে। আমি তিন লক্ষবার প্রতিদিন জপ করতেআর পারছি না। এটা অসহ্য।'

চৈতন্য বললেন, 'স্বাভাবিক। তোমার বয়সও তো হয়েছে। নাম-কীর্তনের সংখ্যা কমাও।'

হরিদাস বললেন, 'তা পারি না। আমি বুঝতে পারছি, আমার লীলা শেষ হয়ে আসছে। আমি তোমার সামনে দেহরক্ষা করবো, এই আমার ইচ্ছা। সেই জন্যই আমি আহার ত্যাগ করেছি।'

চৈতন্য খুলে বললেন, 'আমার সুখ তোমাদের সবাইকে নিয়ে।'

পরদিন ভোরবেলা তিনি ভক্তদের সঙ্গে নিয়ে আবার এলেন। হরিদাসকে বেষ্টন করে সবাই নাম সংকীর্তন শুরু করলো। চৈতন্য রামানন্দ আর সার্বভৌমকে হরিদাসের জীবনী-কথা শোনাতে লাগলেন। ভক্তরা হরিদাসের চরণ বন্দনা করলেন। হরিদাস শ্রীচৈতন্যপ্রভুর শ্রীচরণ ধারণ করলেন, মস্তকে রাখলেন, আর বারে বারে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামোচ্চারণের মধ্যে দিয়েই প্রাণত্যাগ করলেন। এ ঘটনা ১৫২১ খৃষ্টাব্দে।

শ্রীচৈতন্য হরিদাসের শরীর নিজের কোলে নিয়ে নৃত্য করলেন। প্রেমবিহ্বল চোখে জল। এই সমাদরের পর, বিমানে চাপিয়ে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলো সমুদ্রের জলে। জলে ধুইয়ে এনে, দেহ বালুকা তলা গহ্বরে সমাহিত করা হলো। তার ওপরে একটি পিণ্ডা বাঁধানো হলো। শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যের সঙ্গে পরিচয়ের আগে, এই সাধক, গোয়ালে বসে কৃষ্ণনাম জপতে শুরু করে-ছিলেন। মুসলমান হয়ে হিন্দুর দেবতার নাম করার অপরাধে, বাইশ বাজারে চাবুকের ঘায়ে অজ্ঞান হয়েছিলেন। মৃত জ্ঞান করে, কবর না দিয়ে, গঙ্গার জলে তাঁর দেহ ফেলে দেওয়া হয়েছিল। নিমাইয়ের অনেক আগে থেকে, যবন হরিদাস একজন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ছিলেন। পরবর্তীকালে নিমাইকে ছেড়ে আর থাকেননি। আজ তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটলো।

চৈতন্যদেব হরিদাসের সৎকারের পরে, সমুদ্রস্নান করে, সিংহদ্বারের সামনে দাঁড়িয়ে নিজে ধুতির আঁচল পেতে, মহোৎসবের জন্য ভিক্ষা করলেন। এ সময় পর্যন্ত চৈতন্য সবই তাঁর অবতারত্বের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছেন। তিনি জানতেন, এসব কাজ তাঁকে করতেই হবে। এর আগে কারোর জন্য তিনি আঁচল পেতে ভিক্ষা করেননি। স্বরূপ গোঁসাই বললেন, 'আপনি অনেক করলেন। এবার আমাদের ভিক্ষা করতে দিন।'

প্রসাদ হলো বিস্তর। চৈতন্যদেব নিজে সবাইকে পরিবেশন করে খাওয়ালেন। আর বললেন, 'তোমরা যাঁরা হরিদাসের শেষ মুহূর্তে সংকীর্তন করেছো, তার সদ্গতি করেছো, তাদের সকলের কৃষ্ণপ্রাপ্তি হবে। তিনি নিজের ইচ্ছায় চলে গেলেন। আমার এমন শক্তি ছিল না, তাঁকে ধরে রাখি। তা হলে বোঝ, তিনি কতো বড় সাধক ছিলেন। একে বলে ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যু।'

এই মৃত্যু চৈতন্যের জীবনে নতুন পরিবর্তন এনে দিল। তিনি সার্বভৌমকে বলেছিলেন, 'আপনি আমাকে সন্ন্যাসী ভাববেন না। কৃষ্ণের বিরহে আমি ঘর

ছাড়া, মাথা মুড়ানো কাঁথা গায়ে কৌপিনধারী।'

রামানন্দ বলেছিলেন, 'তুমি রাধার ভাবে ভাবিত হয়ে, নিজের দেওয়া রস নিজেই আস্বাদন করবার জন্য অবতার হয়েছো।'

রামানন্দর কথাটির মর্ম উদ্ধারের জন্য আমি গভীর চিন্তায় ও জিজ্ঞাসায় নিমগ্ন হলাম। এটি সাধারণভাবে সকলের বোঝবার কথা না। রাধার ভাবে নিজেকে ভাবিত করে, নিজের দেওয়া রস নিজেই আস্বাদন করার জন্য অবতার হওয়া, এটি একটি গুহ্য প্রণালী। অর্থাৎ রাধার ভাবে ভাবিত হয়ে কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদন। এটি কি নিতান্তই মানসিক? অথবা এর সঙ্গে দেহতত্ত্বের কোনো কথা আছে?

বোধহয় আছে। যেমন মীরাবাঈকে শ্রীরূপ অবজ্ঞা করেছিলেন, রমণীর গৃহে ভিক্ষা করবেন না, পরে মীরাবাঈ তাঁকে ডেকে, রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছিলেন, তখনই জানা গিয়েছিল, কামগন্ধ না থাকলেও, দেহতত্ত্ব বাদ নেই। এ ক্ষেত্রেও সম্ভবতঃ তাই। এটা সাধারণের বোধগম্য হবার কথা না। আমিও এ নিয়ে আলোচনা করবো না। কারণ সব আলোচনায় সকলের অধিকার নেই। তবে এর মধ্যে দেহতত্ত্বের মহাভাব রয়েছে, যে জানবে, সেই বুঝবে, এই তত্ত্বের মধ্যে কী কঠিন সাধনা রয়েছে। মীরাবাঈয়ের মতো চৈতন্যের একলা রাধা ভাবে ভাবিত হয়ে, কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদন, এটি আরও কঠিন। আর এখান থেকেই শুরু শ্রীচৈতন্যের দিব্যোন্মাদ অবস্থা। অর্থাৎ খ্যাপা বাউল বলতে যা বোঝায়, সেইরকম। বাউলের মতোই, এখানে, 'আপনি সাধনকথা/না কহিবে যথাতথা।'

রায় রামানন্দ নিজে এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন কিনা, সঠিক জানা যায় না। কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যের দিব্যোন্মাদ অবস্থার কথা যেমনটি লিখেছেন, তেমনটিই আমি সকলের সামনে অবিকল তুলে দিলাম:

কৃষ্ণ মথুরা গেলে গোপীর যে দশা হইল।
কৃষ্ণ বিচ্ছেদে প্রভুর সে দশা উপজিল॥
উদ্ধব দর্শনে যৈছে রাধার বিলাপ।
ক্রমে ক্রমে হৈল প্রভুর সে উন্মাদ বিলাপ॥
রাধিকার ভাবে প্রভু সদা অভিমান।
সেই ভাবে আপনাকে হয় রাধা-জ্ঞান॥
দিব্যোন্মাদে ঐছে হয় কি ইহা বিস্ময়॥
<u>অধিরূঢ় ভাবে</u> দিব্যোন্মাদে প্রলাপ হয়॥

"অধিরূঢ় ভাবে" কথাটির নীচে দাগ আমি দিলাম। এইটি বোঝা কঠিন, অথচ

যে ভাবের ভাবী, তার দুর্বোধ্য না। শ্রীরূপ গোস্বামী মীরাবাঈয়ের কাছে শিক্ষা পেয়েছিলেন। এই অধিরূঢ় ভাবের দুই ভাবে বিভক্ত করেছেন। যথা—মাদন আর মোদন। এই মোদন বিরহ দশায় মোহন হয়। মোহন-এর ব্যাখ্যা, 'ব্রহ্মাণ্ড ক্ষোভ করে সেই তো মোহন।' কী রকম?

মোহনে পরম গতি কথনীয় নয়।
তাহে চিত্তভ্রম আশা দিব্যোন্মাদ হয়॥
উদ্‌ঘূর্ণা চিত্র জলপাদেৎ তার ভেদ হয়।
অনেক আছয়ে ভেদ কবিগণ কয়॥

ওপরের ব্যাখ্যায় দু জায়গায় দুটি কথার নীচে দাগ আমি দিয়েছি। কথনীয় নয়, এ কথার অর্থ হলো, গুপ্ত সাধন প্রণালী বলবার না। উদ্‌ঘূর্ণা চিত্র অর্থে, উর্ধ্বগতি। এর সহজ ব্যাখ্যা কঠিন। শুধু উর্ধ্বগতি বললে বোঝানো যায় না। ক্রমান্বয়ে উর্ধ্ব নিম্নগতি নিরন্তর। জলপাদেৎ তার ভেদ হয়। বেশী ব্যাখ্যা সম্ভব না। এটি এক শ্রেণীর দেহতত্ত্বের সাধনা। এ সাধনায় পুরুষ-প্রকৃতি দুজনের প্রয়োজন নেই। একজনের মধ্যেই রাধা কৃষ্ণ নাম সাধন।

যে বাউল জীবনে একবার সিদ্ধিলাভ করে, সে ক্ষ্যাপা হয়ে যায়। শ্রীচৈতন্য দিব্যোন্মাদ হলেন। কিন্তু তার মানে এই নয়, তিনি সকল বাহ্যজ্ঞান হারালেন। এ যেন অনেকটা কুমোরের চাকের মতো নিরন্তর ঘুরে চলেছে। আবার প্রয়োজনে যথা সময়ে কুমোরের হাতের স্পর্শে, মাটির বস্তুর রূপ বদলায়।

এরকম দিব্যোন্মাদ অবস্থাতেই, শ্রীচৈতন্য একদিন পুরীর মন্দিরে গিয়েছেন, জগন্নাথ দর্শনে। হাজার হাজার লোক। দর্শন হয় না। এমন সময়ে একটি ওড়িয়া স্ত্রীলোক চৈতন্যের ঘাড়ের ওপর পা দিয়ে উঠে জগন্নাথ দর্শন করতে লাগলো। গোবিন্দ ছিল সঙ্গে। সে স্ত্রীলোকটিকে ব্যস্ত হয়ে নামাতে গেল। চৈতন্য বাধা দিলেন, 'ওকে জগন্নাথ দর্শন করতে দাও। প্রাণ ভরে দর্শন করুক।' সেই স্ত্রীলোক যখন চৈতন্যের ঘাড় থেকে নামলো, চৈতন্য তার চরণ বন্দনা করলো 'হায়, তোমার মতো আর্তি কেন জগন্নাথ আমাকে দিলেন না। জগন্নাথে তোমার তনু মন এমনই আবিষ্ট, আমার কাঁধে পা দিয়েছো, তোমার জ্ঞান নেই। তুমি ভাগ্যবতী। তোমার আর্তি যেন আমি পাই।'

আবার দিব্যোন্মাদ অবস্থাতেই, জগদানন্দকে প্রতি বছর নবদ্বীপে পাঠিয়ে শচী মাতাকে আশ্বাস দেন, 'মাকে বলো, ওঁর পাদপদ্মই আমি বুকে ধারণ করে আছি, নীলাচলে আমি তোমার আজ্ঞাতেই আছি। কিন্তু তোমাকে ছেড়ে নেই।' তারপর

জগন্নাথদেবের উত্তম প্রসাদ আনিয়ে, শচীমাতাকে আলাদা করে প্রতি বৎসরই পাঠান। এটিতে কখনও ভুল হয় না। কেননা, মাকে যে বলে এসেছিলেন, 'মা, বুকে হাত দিয়ে বলি, তোমার সকল ভার আমার—আমার।"

আবার দেখা যায়, কেউ হয়তো ঘুমন্ত শীতের মধ্যে খালি গায়ে থাকলে, নিজের কাঁথাটি ওর গায়ে জড়িয়ে দেন। এসব কারণেই বোঝা যায়, দিব্যোন্মাদ অবস্থাতেও, তিনি সব বাহ্যজ্ঞান হারাননি। ১৫২২ থেকে ১৫৩৩, আমৃত্যু তাঁর এই দিব্যোন্মাদ অবস্থা বর্তমান ছিল। কিন্তু কেউ যদি মনে করেন, তাঁকে ঘিরে যে কুটিল ষড়যন্ত্র ঘটছিল, সে-বিষয়ে তিনি কিছু জানতেন না, তা হলেও তাঁকে ভুল বোঝা হবে। সবই জানতেন। প্রকাশ করতেন না! প্রকাশ করলে, তাঁর পারিষদবর্গ আর রাজা প্রতাপরুদ্র স্বয়ং ভয় পেতেন। তবে প্রতাপরুদ্র একেবারে অন্ধকারে ছিলেন না।

সাত



চৈতন্যের এই দিব্যোন্মাদ অবস্থা একদিন হঠাৎ আরম্ভ হয়নি। এটা স্পষ্ট রূপে আরম্ভ হবার আগেই জগন্নাথের মন্দিরে একটি ঘটনা ঘটেছিল। এক দেবদাসীর গান শুনে চৈতন্যদেব মগ্ন হয়ে তাকে আলিঙ্গন করতে গিয়েছিলেন। দেবদাসী তখন জয়দেবের গীতগোবিন্দর গুর্জরী রাগের সেই পদটি সুস্পষ্ট সুরে গাইছিল, 'রতিসুখ সারে গতম্ অভিসারে মদনমোহন বেশং।' তারপর, 'ধীরে সমীরে যমুনা তীরে বসতি বনে বনমালী।'... গানের এই বাণীটি শুনেই, দিব্যোন্মাদের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল। তারপরে তো, যমুনা ভ্রমে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। পার্ষদরা তাড়াতাড়ি তুলে এনেছে। রাত্রে, ঘোরের মধ্যে সিংহদ্বারে চলে গিয়েছেন। মন্দিরের দরজা বন্ধ। অর্ধবাহ্য অবস্থা। পার্ষদরা কানে কৃষ্ণ নাম শুনিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে।

এই দিব্যোন্মাদ ভাবটি সব থেকে বেশি বাড়াবাড়ি হলো, শান্তিপুর থেকে অদ্বৈত আচার্যের গূঢ় পত্র পেয়ে। পত্রটি এইরকম:

প্রভুকে কহিয় আমার কোটি নমস্কার।
এই নিবেদন তাঁর চরণে আমার॥
বাউলকে কহিও লোকে হৈল আউল।
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল॥

বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল॥

কী এসব কথার অর্থ ? এ সংবাদ পাবার পরেই দিব্যোন্মাদ অবস্থা দ্বিগুণ বেড়ে গেল। ১৫১৬ খৃষ্টাব্দ থেকে নিত্যানন্দ গৌড়ে চণ্ডাল-মুসলমান মিলনে বৈষ্ণব আন্দোলন চালাচ্ছিলেন। তার বারো বছর পরে অদ্বৈতর এই তর্জা। এটিকে তর্জাই বলা হয়েছে। যেমন তর্জা গানের মানে অনেক সময় বোঝা যায় না। মনে হয়, নিত্যানন্দর প্রচারকে উপলক্ষ করেই অদ্বৈতাচার্য এই তর্জা পাঠিয়েছিলেন, 'লোকে হইল আউল' 'হাটে না বিকায় চাউল' 'কাটে নাইক আউল'। এ যেন নিত্যানন্দের প্রচারের বিরুদ্ধেই কটাক্ষ।

কিন্তু তা কেমন করেই বা হতে পারে ? অদ্বৈতই তো শ্রীচৈতন্যকে বলেছেন, 'যদি ভক্তি বিলাইবা/স্ত্রী শূদ্র মূর্খ আদি তাদেরে সে দিবা/চণ্ডাল নাচুক তোর নাম গুণ গাইয়া।' নিমাই বলেছিল, 'সত্য যে তোমার অঙ্গীকার।'

তা হলে এ তর্জার মানে কী ?

আছে, অর্থ আছে। একটি প্রচলিত অর্থ এই যে, অদ্বৈতাচার্য মহাপ্রভুকে বললেন, 'এখন তুমি লীলা সম্বরণ কর। কেন না, লীলার যে-প্রয়োজন তা শেষ হয়েছে। লোকে প্রেমধর্ম পেয়ে আউল বাউল, অর্থাৎ পাগল হয়ে গিয়েছে।' কিন্তু আমার সন্দেহ ঘোচে না। অদ্বৈতাচার্য কি শ্রীচৈতন্যকে তাঁর লীলা সম্বরণ করতে বলতে পারেন ? বিশ্বাস হয় না। শেষ পর্যন্ত ধারণা হয়, শ্রীপাদ নিত্যানন্দর প্রথার প্রচারই অদ্বৈত চাননি। তা ছাড়া, আর একটি কথা। মানুষের মন। অদ্বৈত আচার্য কি শ্রীপাদ নিত্যানন্দর জনপ্রিয়তায় অসূয়া বোধ করেছিলেন ? অসম্ভব নাও হতে পারে।

যাই হোক, দিব্যোন্মাদ অবস্থার বিষয়টি আবার একটু পরিষ্কার করা দরকার। দিব্যোন্মাদ মানে, শ্রীচৈতন্য পাগল হয়ে যাননি। যেমন,

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রি দিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ॥

সুতরাং স্বাভাবিক অবস্থায় যে-সকল গ্রন্থ পাঠ তিনি শুনতেন, উপভোগ করতেন, রস আস্বাদন করতেন, দিব্যোন্মাদ অবস্থাতে সেই সকল গ্রন্থেরই ভাবে তিনি মগ্ন হতেন। রস আস্বাদন করতেন।

আট



আমি চৈতন্যের সন্ধানে যে-ইতিহাসের পথ ধরে যাত্রা করেছিলাম, তার মধ্যে, ধর্মের বিস্তৃত বিবরণ দেবার কথা চিন্তা করিনি। আমাকে তিনি ডেকেছিলেন, না আমিই আমার ভিতরের প্রেরণায় তাঁর সন্ধানে গিয়েছিলাম, আজ আর মনে করতে পারি না। তবে, বৈষ্ণব ধর্মের বহুধা-বিভক্ত নানা মত ও পথের বিষয়ে আমার কোন বক্তব্য নেই। আমি সেই নিমাই মিশ্রের সন্ধানে গিয়েছিলাম, যিনি আচণ্ডাল স্ত্রী যবনাদির, সকলের মুক্তির জন্য জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। শেষ দিন পর্যন্তও তাই প্রমাণ করে গিয়েছেন।

শেষের সেই দিনটিতে যাবার আগে, কৃষ্ণদাস কবিরাজের একটি উদ্ধৃতি না দিয়ে পারছি না। তিনি একস্থানে বলেছেন, "সহজীয়া বৈষ্ণবরা দাবী করতেন, সার্বভৌম-কন্যা ষষ্ঠীর সঙ্গে চৈতন্যের সহজলীলা চলতো। সেইজন্য ষষ্ঠীর বর খারাপ কথা বলতো, এবং স্বয়ং ষষ্ঠীর মাতা বলতেন, জামাই না থেকে বরং আমার ষষ্ঠী রাঁড় হউক।"

কৃষ্ণদাস কবিরাজের এ কথায়, ঐতিহাসিক তত্ত্ব কতটা আছে, জানি না। তা হলে ছোট হরিদাসের প্রয়াগে গিয়ে আত্মহত্যা বড়ই নিদারুণ। চৈতন্যদেব তাঁকে এত বড় শাস্তি দিলেন? অথচ তিনি নিজেই ষষ্ঠীর সঙ্গে সহজিয়া রস স্বাদ করেছেন, এ আমি মেনে নিতে পারছি না।

এ সব শুদ্ধ বা সহজিয়া তত্ত্ব নিয়ে যাঁরা চৈতন্যচরিত্র বিশ্লেষণ করতে চান, করুন। আমি যাই সেই মুক্তিদাতার শেষ দিনটিতে। ইতিহাসের অতি নির্মম ঘোর কুটিল সেই দিন। যেদিন শ্রীচৈতন্য অন্তর্ধান করলেন। গোবিন্দ বিদ্যাধর ভোই অনেক দিন থেকেই, এই দিনটির অপেক্ষায় ছিল।

অবশ্য এটি একটি রহস্যজনক ঘটনা নিঃসন্দেহে। অপ্রকট হবার পরেও প্রভু লীলা করছেন। লীলার আর শেষ নেই। 'অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গোরারায়/ কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়।' সুতরাং লীলার শেষ বর্ণনা করা প্রাচীনদের মতে অন্যায়। কিন্তু ক্ষমা করবেন। প্রভুর লীলা যেমন সত্য ছিল, তাঁর অন্তর্ধানের গুপ্ত কাহিনীও তেমনি সত্য। সত্যকে জানা উচিত। তাতে ধর্মের ক্ষতি হয় না। প্রভুর প্রতি অশোভন আচরণ হয় না।

আমরা যদি জীবনীকারদের বই দেখি, বৃন্দাবনদাস আর কবিরাজ গোস্বামীর কথাই সর্বাপেক্ষা বিশ্বাস্য বলে মনে করবো। কারণ বৃন্দাবনদাস তাঁর মা নারায়ণী এবং নিত্যানন্দর মুখ থেকে সব শুনে লিখেছিলেন। এখানে মিথ্যার কোনো চিহ্ন নেই। কবিরাজী গোস্বামী বৃন্দাবনে শ্রীরূপ ও সনাতনের মুখ থেকে সব কথা শুনে লিখেছেন। তাঁর কথাও মিথ্যা হবার না। অথচ দুজনের কেউই শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের বর্ণনা দেননি। কেন?

এঁরা ছাড় জয়ানন্দ লিখেছেন. 'আষাঢ় বঞ্চিত রথ বিজয় নাচিতে / ইটাল বাজিল বাম পায়ে আচম্বিতে / সেই লক্ষ টোটায় শয়ন অবশেষে।' তারপরেই গরুড়ধ্বজ রথে চড়ে শ্রীচৈতন্যদেব চলে গেলেন। এটা কি কোনো যুক্তি?

এই দিনটি কবে? ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুন। কিন্তু পায়ে ইট বেঁধে যদি তিরোধান করেই থাকেন, তবে তাঁর সমাধি কোথায় গেল? যবন হরিদাসেরও সমাধি আছে পুরীতে। কিন্তু চৈতন্যদেবের নেই। এ কি অসম্ভব আশ্চর্যের কথা! শুধু তাঁর নয়, তাঁর যে সব নবদ্বীপের পারিষদবর্গ ছিল, তাঁরাই বা কোথায় গেলেন? কিছু তো জানা যাচ্ছে না। তাঁরাও যদি তিরোহিত হয়ে থাকেন, তবে তাঁদের সমাধিই বা কোথায়?

সন্দেহ এখানে এসে দানা বাঁধছে।

এদিকে আবার কবি লোচন একটি গল্প ফেঁদেছেন: 'আষাঢ় মাসের তিথি সপ্তমী দিবসে। / তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে। / জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে। / গুঞ্জাবাড়িতে ছিল যে পাণ্ডা ব্রাহ্মণ। / কি কি বলি সত্বর সে আইল তখন। / বিপ্র দেখি ভক্ত কহে শুনহ পড়িছা / ঘুচাই কপাট প্রভু দেখিতে বড় ইচ্ছা / ভক্ত আর্তি দেখি পড়িছা কহয়ে তখন। / গুঞ্জাবাড়ির মধ্যে প্রভুর হইল অদর্শন।'

গুণ্ডিচা বাড়িতে সমাধি কই? থাকলে তো আমরা দেখতে পেতাম। এমন তো না, যে শ্রীচৈতন্য গুণ্ডিচা বাড়িতে তিরোহিত হলে, সেখানে তাঁর সমাধি দেওয়া যাবে না? একজন আধুনিক পণ্ডিত অনুমান করেছেন, পায়ে ইঁট বেঁধে, সেপটিক হয়ে, জ্বরে ভুগে শ্রীচৈতন্য গদাধর পণ্ডিতের আশ্রমে দেহরক্ষা করেন।

কোথায় গুণ্ডিচা বাড়ি। আর কোথায় গদাধরের আশ্রম। দুটো আলাদা আলাদা জায়গা। বেশ, গদাধর পণ্ডিতের আশ্রমেই যদি প্রভু দেহরক্ষা করে থাকেন, সেখানেই বা তাঁর সমাধি নেই কেন?

ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, রাজা প্রতাপরুদ্র জীবনে রাজকর্মে অমনোযোগী হয়ে, মহাপ্রভুর সঙ্গে কেবল ধর্মচর্চা করাতে, রাজ্য ধ্বংস

হয়েছিল। ১৫২০ খৃষ্টাব্দ থেকে রাজা যুদ্ধবিগ্রহ ত্যাগ করে, প্রভুর কৃপাপ্রার্থী হয়ে ধর্মে মন দিয়েছিলেন। এতে রাজ-অমাত্যরা অসন্তুষ্ট হয়েছিল। এদিকে জগন্নাথ-দেবের পাণ্ডারা দেখলেন, রাজা প্রতাপরুদ্র জগন্নাথদেব অপেক্ষা মহাপ্রভুকেই অধিক সম্মান দিচ্ছেন, অধিকতর আকৃষ্ট হয়েছেন। সুতরাং মহাপ্রভুকে গোপনে হত্যা করলেই রাজ্য রক্ষা পায়, আর জগন্নাথদেবের প্রতি রাজার ভক্তি ফিরে আসবে।' গুপ্ত হত্যার কারণ সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক।

কিন্তু সেটাও তো অনুমান মাত্র। আসল ঘটনা কী ঘটেছিল? আমি সেই ভয়ানক অন্ধকারের ইতিহাসকে আলোয় দেখতে চাই।

জগন্নাথে লীন হওয়া কেউ বিশ্বাস করেন না। তার কারণ তাহলে মৃতদেহ পাওয়া উচিত। কিন্তু কেউ তা পায়নি। তাই এই আকস্মিক অন্তর্ধানে গুপ্ত হত্যার কথাই বারে বারে মনে আসে। অথচ গোবিন্দ বিদ্যাধর ভোইর কথা কেউ তুললেন না। ওড়িয়া ঐতিহাসিকরাও এ বিষয়ে নীরব।

জগন্নাথে লীন হওয়া, রাজা প্রতাপরুদ্রকে প্রবোধ দেওয়া ছাড়া, হত্যাকারী-দের আর কোনো রাস্তা ছিল না। প্রতাপরুদ্রের জীবিতকালেই শ্রীচৈতন্য দেহ-রক্ষা করেছেন। রাজার শোক অসহ্য হওয়াতে, বিরহ দূর করবার জন্য চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক লেখা হয়। ঐ নাটকে মহাপ্রভুর ভূমিকায় সুদক্ষ সুন্দর অভি-নেতাকে দেখে, রাজার জীবন্ত মহাপ্রভু বলে ভ্রম হয়েছিল। প্রতাপরুদ্র মারা যান ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে। শ্রীচৈতন্যের সাত বছর পরেও তিনি জীবিত ছিলেন।

কিন্তু জীবিতাবস্থায় কোথায় ছিলেন? পুরীতে? না। তিনি পুরী ত্যাগ করে কটকের প্রাসাদে চলে গিয়েছিলেন। কারণ তিনি তাঁর অনুচরবৃন্দ দিয়ে শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধানের বিষয় বিস্তর সন্ধান করিয়েছিলেন। আর তিনি নিজেও বুঝেছিলেন, তাঁর নিজের জীবনও বিপন্ন হতে পারে। হতে পারে না, হয়েছিল। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে পুরীতে পাঠিয়ে, সিংহাসনে অভিষিক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু মাত্র চার মাসের মধ্যেই কি তাঁকে হত্যা করা হয়নি? উড়িষ্যার ইতিহাসে কি তার সাক্ষী নেই? প্রতাপরুদ্রের পুত্রের হত্যাকারী কে? এমন কেউ, যে উড়িষ্যার রাজ-সিংহাসনে আরোহণ করতে চায়।

সে কে? গোবিন্দ বিদ্যাধর ভোই। তবে কি সে-ই মহাপুরুষকে হত্যা করিয়েছিল? শুধু মহাপুরুষকে না তাঁর প্রিয় নবদ্বীপের পার্ষদদেরও?

আমি ইতিহাসের পথে যাত্রা করেও, অসহায়! অতএব আমি আমার শেষ

কথাটি এবার প্রশ্নের আকারে রেখে যাবো।

আষাঢ় মাসের সপ্তমী তিথিতে বেলা তৃতীয় প্রহরে রবিবারে কি জগন্নাথদেবের মন্দিরের সকল প্রবেশের দরজা বন্ধ ছিল? এবং রাত্রির নবম প্রহর পর্যন্ত বন্ধ ছিল? এই দীর্ঘ সময়, এরকম অদ্ভুত অভূতপূর্ব ঘটনা কি ঘটেছিল? সেই সময়ে মহাপ্রভু কি তাঁর পার্ষদদের নিয়ে মন্দিরের মধ্যে ছিলেন? অথবা তাঁদের জোর করে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল?

কোথায় গেলেন শ্রীচৈতন্য? তাঁর পার্ষদদের মধ্যে কারোর মৃতদেহ কি ক্ষত বিক্ষত অবস্থায় রাস্তার ধারে পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল?

উড়িষ্যার ঐতিহাসিকরা এবার কাজে হাত দিন। মনে রাখবেন, শ্রীচৈতন্য বাঙালী মায়ের গর্ভে জন্মালেও পৈতৃক পরিচয়ে তিনি ওড়িয়া ছিলেন।

এইবার একবার শচীমাতার কাছে চলুন। হা মা গো! তুমি এখনও জীবিত। তোমার কি ভাগ্য! স্বামী গেছেন। বিশ্বরূপ সন্ন্যাস নিয়ে গৃহত্যাগ করেছেন। সর্বাপেক্ষা প্রিয় নিমাই, দুষ্টু নিমাই, প্রেমিক নিমাই, অধ্যাপক নিমাই, তোমার চোখের মণি নিমাই ইতিহাস সৃষ্টি করে গেল, কিন্তু কি দারুণ ইতিহাস!

মাগো, তুমিই একমাত্র হৃদয়ে অনুভব করেছো, কে বা কারা, তোমার নিমাইকে চিরকালের তরে কোথায় রেখে দিয়েছে। কিন্তু সেখান থেকে খুঁজে আজ আর আমরা তাকে পাবো না।

নিমাই! তুমি শ্রীচৈতন্য হও, আর যেই হও, আমার চোখে তুমি মহাপ্রেমিক। লক্ষ্মীর মৃত্যুই তোমাকে পথের দিশা দিয়েছিল। কিন্তু কাদের হাতে তোমার রক্ত লেগে রইল? আমরা কি সেই সব রক্তাক্ত হাতে এখনও পূজার ডালি সাজিয়ে দিই?

মা, তোমার সেই গানটাই করো, 'বৈরাগী না হইও নিমাই সন্ন্যাসী না হইও। ছানা চিনি দিব তোরে, প্রাণ ভরে খেও।'

মা, এমনি করেই সব মহাপুরুষকে প্রাণ দিতে হয়েছে। তোমার, আমাদের নিমাইকে দিতে হলো। ওঁ শান্তি! শান্তি! শান্তি!

শান্তি? নিমাই! তোমাকে হারিয়ে কোন্ শান্তির আরাধনা করবো? বরং আজ তোমাকে নতুন করে আহ্বান জানাই। ফিরে এসো, হে নিমাই। এই জগৎ উদ্ধারিতে ফিরে এসো নবরূপে। পাপ ও অবিচারের ভারে অসহনীয় পৃথিবী আজ তোমার প্রতীক্ষায় ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।